উৎসর্গ ঃ

স্বনামধন্য সাংবাদিক ও "স্বদেশ"-পত্রিকার একনিষ্ঠ সম্পাদক—

শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক

অগ্রজপ্রতিমেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

জনপদবধূ ॥ দ্বিতীয় অন্তর ॥ সীমান্তশিবির ॥ দেবকন্যা ॥ সিন্দুরে টিপ ॥ সাক্ষী বালুচর ॥ শান্তির স্বাক্ষর ॥ তোমার পতাকা ॥ পটমঞ্জরী ॥ কর্ণাটরাগ ॥ এই তীর্থ ॥ ঢেউ ওঠে পড়ে ॥ সাগরিকা ॥ কামিনী-কাঞ্চন ॥ অভিমানী আন্দামান ॥ গল্প সংগ্রহ ॥ কৃষ্ণপক্ষের আলো ॥ ছায়াসঙ্গিনী ॥ এ-জন্মের ইতিহাস ॥ শ্বেত কপোত ॥ নীলসিন্ধু ॥ সীমাস্বর্গ ॥ আনন্দ-ভৈরবী ॥ তীরভুমি ॥ নগরনন্দিনীর রূপকথা॥ নিধুবাবুর টপ্পা ॥ জলকন্যার মন ॥ পত্র লেখার উপাখ্যান ॥ সূর্যের সন্তান ॥ অপরিচিতের নাম ॥ বিদিশার নিশা ॥ কতো আলোর সঙ্গ ॥ নতুন নাম নতুন ঘর ॥ মধ্যদিনের গান ॥ আপন মানুষ ॥ স্বপ্নসঞ্চার ॥ নয়ানজুলি ॥ নীলাঞ্জন ছায়া ॥ নগ্নদ্বীপ ॥ এক আশ্চর্য মেয়ে ॥ একটি রঙ-করা মুখ ॥ পথ ॥ তারুণ্যের কাল ॥ স্বাতীনক্ষত্রের জল ॥ নাট্যদেউলের বিনোদিনী ॥

প্রভৃতি

নিবেদন

'শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে নিঃসন্দেহে বিস্তৃত করেছেন। তাঁর কৌতূহল পরিচিত পরিবেশ এবং মানুষকে ত্যাগ করে বহু সময়েই ভিন্ন পথে গেছে। সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রই তাতে আনন্দিত। কারণ তাঁর অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ হয়েছে।'

আনন্দবাজার পত্রিকার এই মন্তব্য লেখকের সমগ্র সাহিত্য সম্পর্কেই সুপ্রযুক্ত। 'বন্দরে বন্দরে' তাঁর রম্যোপন্যাস ঃ ভ্রমণকাহিনীও বটে, কথা-কাহিনীও বটে। বিপুল অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে সম্বল করে তিনি লিখেছেন এই বহুলাংশে 'নাম-না-জানা' বন্দরগুলির বিচিত্র কথা, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ ; লেখকের ভাষায়, "যে-যে বন্দর নিয়ে লিখেছি, তারা তার প্রতীক।" একদিকে আলেকজান্দ্রিয়া, অন্যদিকে 'তাহিতি', এই বিস্তৃত ভূখণ্ডই মূলতঃ তাঁর বিচরণভূমি। কর্মোপলক্ষ্যেই তিনি সমুদ্র-ভ্রমণ করেছেন, এবং কীভাবে করেছেন, তা এই গ্রন্থেই যথাস্থানে বিধৃত।

সমুদ্র, দ্বীপ-দ্বীপান্তর, জাহাজী-জীবন নিয়ে মৌলিক বাংলা কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। (সম্ভবত সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও) ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত "দেশ" পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক পবিত্র সরকার লিখেছেন "এমন কী যাঁরা এক সময় খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং সমালোচকদের সম্ভ্রম জোর করে কেড়ে নেন, যেমন করেছিলেন কিছু অবিস্মরণীয় ছোট গল্পের লেখক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আজকের কজন পাঠক তাঁর গল্পের পরিচয় রাখেন ?" তিনি লেখক সম্বন্ধে আরও লিখেছেন, "ইন্দুর থেকেই তাঁর নাবিক-জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং জাহাজের স্টোকহোল্ড, বয়লারের স্মোক-টিউব ইত্যাদি তথা চলে আসে।" কিন্তু এরও আগে নাবিক-জীবন নিয়ে শচীন্দ্রনাথ লেখা শুরু করে দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ের প্রথম গল্প তাঁর 'ক্যাপ্টেন কের্নোডর গল্প', বেরিয়েছিল 'পূর্বাশা'য় (ভাদ্র ১৩৫৭ ঃ ১৯৫০) ; যদিও ওঁর বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শুরু 'দেশ'-এ প্রকাশিত (৩০ ফাল্গুন ১৩৫৯ ঃ ১৯৫২) 'আন্দামান'-নিয়ে লেখা ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম গল্প 'জাগুয়ার'কে কেন্দ্র ক'রে।

সম্প্রতি দৈনিক বসুমতী (৫ জানুয়ারী ১৯৫৬) লেখকের পরিচিতি দান-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "সাহিত্যজগতে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুপরিচিত নাম। তাঁর জনপদবধূ, অভিমানী আন্দামান, সীমান্তশিবির বা সিন্ধুর টিপ তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। একদা জাহাজী মানুষ হিসাবে শচীন্দ্রনাথ প্রায় সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছেন। জীবনের দ্বিতীয়ার্ধ

কাটিয়েছেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসাবে। আর সেই সঙ্গে চলেছে তাঁর নিরলস সাহিত্যসাধনা। বেশ কিছুদিন আগে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে বসবাস করছেন। সাহিত্যই এখন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী।"

শচীন্দ্রনাথের বয়স এখন প্রায় ছেঁষট্টি। (জন্ম : কলকাতা : ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২০) : এখনো সৃষ্টিশীল, এখনো বৈচিত্র্যসন্ধানী, এখনো জনজীবন সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ, এবং এক বিষয় নিয়ে দুবার লিখতে যে তাঁর প্রচণ্ড অনীহা, পাঠক হিসাবে এ-সাক্ষ্য দিতে আমরা প্রস্তুত।

প্রকাশকের পক্ষে
শ্যামলরঞ্জন ভট্টাচার্য
(সম্পাদক : শ্রেষ্ঠ গল্প সম্ভার)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

লেখকের পক্ষে নিজের বইয়ের ভূমিকা লেখা কখনো কখনো বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। কী লিখবো? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছে এই বই। তাঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

তবে, পুরস্কার পাবার আগেই এ বই বিশেষ আদৃত হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট সুধী তাঁদের ভালোলাগার কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ সুকুমার সেন। তিনি একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন,—'আপনার 'বন্দরে বন্দরে' বইটি আমার ভালো লেগেছে। আপনার অসাধারণ কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাছাই সঞ্চয়গুলি গেঁথে গেঁথে আপনি চমৎকার সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আপনার বইটির সমাদর অবশ্যম্ভাবী।'

এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পুরস্কার পাবার পর বহু সম্বর্ধনা-সভায় আমাকে যাঁরা সম্বর্ধিত করেছিলেন, তাঁদের প্রতিও রইলো আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। প্রকাশককেও ধন্যবাদ তাঁদের যত্ন ও আগ্রহের জন্য।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

কলকাতার কর্মচঞ্চল প্রাণকেন্দ্রে এই যে অতিকায় অট্টালিকাটি দাঁড়িয়ে আছে, একে বাইরে থেকে যতই চাকচিক্যময় দেখাক না কেন, এর ভিতরে প্রথম যখন প্রবেশ করেছিলাম, তখন যা অনুভব করেছিলাম, তা ভালো লাগা নয়, অদ্ভুত এক আতঙ্ক।

আমার বয়স তখন পনেরোর বেশি নয়, স্কুলের ছাত্র। যাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম, তিনি আমার দাদা। সহোদর না হলেও সহোদরপ্রতিম। পেশায় অধ্যাপক, নেশায় গ্রন্থকীট। কী ব্যাপারে যে তাঁর এই অট্টালিকার মধ্যে অনুপ্রবেশ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, তা আমার মনে নেই। তবে কাজ যা-ই থাক, সেই সঙ্গে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলো দেখানোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কম ছিল না।

অট্টালিকার সামনের দিকে, সংলগ্ন ফুটপাথ দিয়ে চলতে চলতে প্রথমেই চোখ তুলে ছাদের দিকে তাকাতে বললেন।

--কী দেখছিস্ ?

ছাদের কিনারে কয়েকটি মূর্তি। আমাদের দেব-দেবীর মূর্তির মতো বসানো নয়, দাঁড় করানো—পূব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছাড়া-ছাড়া ভাবে। তাদের নিচে ইংরেজিতে কতগুলি অক্ষর খোদাই করা—যার অর্থ, সমৃদ্ধি, শান্তি, ন্যায়বিচার ইত্যাদি।

তখন ছিল ব্রিটিশ আমল, অঞ্চলটির চেহারা ঠিক আজকের মতো ছিল না। সামনে দিয়ে যানবাহনের যাতায়াতও ছিল কম, বাসগুলো তখন আজকের মতো এ-বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে না ঘুরে আরও উত্তরে গিয়ে ডাইনে বা বাঁয়ে মোড় নিতো।

আমার দাদাটি ঘুরতে ঘুরতে অট্টালিকার সামনেকার ফুটপাথের ওপর স্থাপিত একটি ছোট গম্বুজের কাছে এসে দাঁড়ালেন। চতুষ্কোণ নিরেট একটি গাঁথনি,

তার ওপরে একটা সরু গম্বুজ উঠে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কার যেন সমাধিসৌধ। এ রকম সৌধ অন্যত্র দেখেছি বলেই কথাটা আমার মনে হয়েছিল।

দাদা বললেন,—কার স্মৃতিস্তম্ভ জানিস?

—না।

—আশ্চর্য! আমিও এদিকে এতো এসেছি কখনো নজর করে নাম-লেখা ফলকটা দেখিনি। কর্মমুখর এই বাড়িটার সামনে কেন যে এটা এমনভাবে রাখা আছে—

বললাম,—কে ইনি?

তিনি বললেন,—কোলস্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট।

—সে আবার কে? নাম শুনিনি তো কখনো?

তির্যক দৃষ্টিতে দাদা আমার দিকে তাকালেন, তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, তা শুনবি কেন? শুধু ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, এদের নাম মুখস্থ করেই জীবন কাটিয়ে দে! তুই তো তুই, আমার কলেজের কোনো ছাত্রও এঁর নাম করতে পারবে না।

বলতে বলতে একটু থেমে পকেট থেকে রুমাল বার করে ধূলিধূসর ঐ নাম-লেখা ফলকটা একটু মুছে দিলেন, তারপরে বলতে লাগলেন,—এদেশে গরু-মোষদের ওপর মানুষ কতো অত্যাচার করে দেখেছিস ত? বিরাট বোঝা নিয়ে গাড়ি টানতে টানতে ওদের মুখে ফেনা উঠে যায়, কাঁধ কেটে গিয়ে ঘা হয়ে যায়। মূক প্রাণী, কথা বলতে পারে না, ব্যথাও জানাতে পারে না, তার ওপর গাড়োয়ান লাগাচ্ছে সপাসপ চাবুক। এদৃশ্য দেখিস নি? খুব দেখেছিস, কিন্তু মনে কোনো দাগ কাটেনি। অথচ সাত সাগরের পার থেকে এসে ঐ মহাপ্রাণ সাহেবটি মানুষের এই নিষ্ঠুরতা দেখে আর স্থির থাকতে পারেন নি, নিজের একক চেষ্টায় গড়ে তুলেছিলেন "পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি" বা 'ক্যালকাটা সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস,'—এক কথায় 'সি-এস-পি সি-এ।'

সেই বয়সে কতটুকু বুঝেছিলাম জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ঐ নাম-ফলকটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম! অদূরে রাস্তার পশ্চিম মোড়ে তখন 'হলওয়েল মনুমেণ্ট'টি ছিল, ওখানে গাড়িগুলি যাচ্ছিল দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে, আজকের মতো এতো ঘনঘন নয়, মাঝে মাঝে ওয়েলার-ঘোড়ায়-টানা ছিমছাম চকচকে গাড়িও চলছিল দুটি-একটি। কিন্তু দাদার চোখ সেদিকে ছিল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—চল—বাইরেটা তো দেখলি, এবার ভিতরটা দেখবি চল্।

বলে আর দাঁড়ালেন না, আমাকে প্রায় টানতে টানতেই ভিতরে নিয়ে চললেন। দোতলায় উঠেছিলাম, না তেতলায়, তা মনে নেই। খুব বড়ো একটা হলঘরে ছোট ছোট টেবিল সাজিয়ে কাজ করছে অনেক লোক, টেবিলের ওপর ফাইলপত্র স্তূপাকার করা। একটি লোক খুব জোরে ঢেঁকুর তুলে টেবিলে রাখা কাচের

গেলাস থেকে ঢকঢক করে জল খেলো। অন্যদিকে একটি লোক, তার মুখ দেখেই মনে হয়, সে সারা পৃথিবীর ওপর যেন ক্ষেপে আছে, পাশে দাঁড়ানো আর একটি লোককে খুব বকছিল। বারান্দার কাছে উর্দি-পরা বেয়ারা কার ওপর যেন রাগ করে হিসহিস-করা চাপা গলায় বলছিল, শালার্ বেটা শালা! বাগে পাই তো বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেই!

• দাদা চলতে চলতে এক জায়গায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সুইং-দরজা ঠেলে একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। আমি একা একা দাঁড়িয়ে আছি হতভম্বের মতো। কাগজপত্রের স্তূপের মধ্য থেকে একটি লোক মুখ তুলে অযথা বিষ দৃষ্টিতে আমার দিকে সাপের মতো তাকিয়ে আছে। অস্বস্তি বোধ ক'রে অন্যদিকে মুখ ফেরালাম। এক টেবিলের একটি মোটা মিশকালো লোক অন্য এক টাক-মাথা কৃশ লোককে ফিসফিস করে কী বলছে আর গা কাঁপিয়ে হি-হি করা চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে। ওদের থেকে একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম—একটি বুড়ো লোক, মাথার চুল প্রায় সব সাদা, তার পাশের অল্পবয়সী লোকটিকে বলছে,—মাল একখানি। শালা রোজ রাতে কোন কোন শালীদের বাড়ির মধ্যে সুড়ুৎ করে সেঁধিয়ে যায়, তা আমি দেখতে পাই না বলতে চাও?

বাক্যটির সঠিক তাৎপর্য সেই বয়সে আমি বুঝি নি, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। তাছাড়া অতবড়ো মানুষ যে, সে ঐরকম অল্পবয়সীর সঙ্গে ওরকম অন্তরঙ্গ আলাপ করছে, এ-ও আমার চোখে সেদিন বিসদৃশ ঠেকেছিল। বুড়ো লোকটি আমার বাবার বয়সী হবে, আর অল্প বয়সী মানুষটি বড়ো জোর আমার ঐ দাদার বয়সী। সে-ও ফিক ফিক করে হাসছিল। বলছিল,—তোমার নজরও বলিহারি মাইরি, ঠিক ফোকাস করেছো?

বুড়ো লোকটি আর কোন কথা না বলে একটা ডিবের ঢাকনা ঠকাস করে খুলে একটা পানের খিলি মুখে পুরলো। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম! বারান্দার কোণে একটি লোক পানের পিচ ফেললো পচাৎ করে।

সত্যি কথা বলতে কী, সব দেখেশুনে আমি যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়-ভয় করা অনুভূতি। দাদা যদি কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট আর মুখ-ফ্যানাওঠা ভারবাহী মূক পশুদের কথা না বলতো, তাহলে বোধ হয় ততটা প্রতিক্রিয়া হতো না। দাদার সেই ঘর থেকে বেরুতে লাগলো প্রায় আধ ঘণ্টা। এই সময়টা আমার এমন খারাপ লাগছিল যে বলার নয়। তিনি সুইং দরজা ঠেলে বেরুতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কাছে এসে বললেন,—চল্, আমার কাজ হয়ে গেছে। এবার আর দেরি নয়, সোজা বাড়ি।

ঐ অতিকায় বাড়িটার ভিতরকার বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দাদা বলছিলেন, সারি সারি কতো অফিস দেখেছিস? বড়ো হ, পাসটাস করে বেরো,

তখন হয়ত তোকে এ-বাড়িতেই এসে ঢুকতে হবে। কার ভাগ্যে কী আছে বলা যায় ?

উত্তর দেইনি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠেছিলাম। যতক্ষণ না এই বাড়ি ছেড়ে আমরা ট্রামে উঠলাম, ততক্ষণ আমি কোনো কথা বলতে পারি নি।

—কী রে অমন চুপ করে গেলি কেন ?

—উঁ ?

—কেমন লাগলো ? অফিস ত কখনো দেখিস নি, তাই তোকে দেখাতে এনেছিলাম। কেমন সব টেবিল পেতে সারি সারি বসে আছে কাগজ পত্রের স্তূপ নিয়ে। তাই না ?

—হুঁ।

দাদা আমার সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' 'হাঁ' ধরনের উত্তর ততটা লক্ষ্য করেননি। কিছুক্ষণ কথা বলার পর নিজের চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার তরুণ মনে সেদিন যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার জের সহজে মেটেনি। দাদার ভাষায় 'পাসটাস' করে বেরুনোর পর যখন কাজকর্মে ঢুকে পড়ার প্রশ্ন এলো, তখন মনে মনে ভয় ছিল, এই অট্টালিকার জীবন যেন আমাকে কখনো গ্রাস না করে !

'যাদৃশী ভাবনা যস্য'—কথাটির বোধহয় কিছু তাৎপর্য আছে। আমি ঐ অট্টালিকা-জীবনের বিপরীত বিন্দুতে ছোট্‌বার চেষ্টা করায় ভিন্নতর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, আর তা কলকাতায় নয়, বাইরে। প্রথম কর্মজীবনে কিছুকাল কারখানায়, তারপরে জাহাজে, কিন্তু পরে প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো ঐ অট্টালিকার জীবনই শেষ পর্যন্ত আমাকে গ্রাস করে নিয়েছিল। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস। যেতে আসতে ট্রাম-বাসের জানালা দিয়ে যেটুকু বাইরের জগৎ দেখা যায়, সেটুকু ছাড়া বহির্জগতের আর সবই আমার কাছে অবরুদ্ধ ছিল। সারাদিন অফিসে খেটে বাসায় আসবার পর ক্লান্তিতে দেহটা এমন ভেঙে পড়তো যে, আর কোথাও যাবার বা কিছু করবার তেমন উৎসাহ থাকতো না। ছুটি-ছাটার দিনও শরীর-মন কেমন যেন আলস্যে ভরে থাকতো, ঘর থেকে দু-পা বেরিয়ে সিনেমা থিয়েটার পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা হতো না। কেমন করে যে ধীরে ধীরে পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিত, সমস্যা-কণ্টকিত, গৃহগত এক সাধারণ সংসারী জীবে একদিন পরিণত হয়ে গেলাম, তা নিজেও জানি না। অফিসের কোটরে কাগজপত্রের স্তূপের সামনে বসে আমিও সবার মতো কাঁচের গেলাসে ঢকঢক করে জল খেয়েছি, অপরের নিন্দা প্রসঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা করিনি। অফিসের পর ট্রাম-বাসে ওঠবার জন্য যেটুকু পথ হাঁটতে হয়, সেটুকু পার হতে গিয়ে দেখতাম, যেখানে সেই তরুণ-বয়সে -দেখা 'হলওয়েল মনুমেণ্ট'টি ছিল, সেখান থেকে মোড় ঘুরে পুবের দিকে

দৈত্যের মতো অনবরত ছুটে আসছে অতিকায় বাসগুলো, একেবারে ঠেসে লোক বোঝাই করা।

কোল্স্‌ওয়ার্দি গ্যাণ্টের স্মরণ-স্তম্ভটি এখনো আছে তেমনিভাবে পথের পাশে দাঁড়িয়ে, মলিন, বিবর্ণ, আষ্টেপৃষ্ঠে নানাবিধ পোস্টার-ইস্তাহার আঁটা। এমন কি তাঁর নামফলকটির ওপরেও "দলে দলে যোগ দিন"-এর পোস্টার সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নামটুকু পর্যন্ত পড়বার উপায় নেই।

কিন্তু এই যে আমার মাপা, জড়ভাবগ্রস্ত জীবন, এখানেও মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, আর তা না উঠলে আমার এ-কাহিনী রচনা করবার কোনো প্রয়োজন হতো না।

বলা বাহুল্য, এ-ঝড়ের প্রকৃতি আলাদা। এ এক দুঃস্বপ্নের মতো, তার আতঙ্কটুকু, যে স্বপ্ন দেখে, একা তাকেই বহন করতে হয়।

দৈনন্দিন জীবনে সবার প্রতি সব কর্তব্য সমাধা করার পর যখন বিছানায় এসে এলিয়ে পড়ি, তখন এক-একদিন আমার সেই ফেলে আসা মুক্ত দিনগুলি হঠাৎ উঁকি দিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অন্তহীন সমুদ্রের ঢেউ, সাগর-পাখীর ডানা,—আর নারিকেল মেখলা-বেষ্টিত সবুজ-সবুজ অজানা দ্বীপের ইসারা।

কিন্তু প্রখর দিনের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সবকিছু মিলিয়ে যায় ছায়ার মতো। ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যখন দারুণ গ্রীষ্মের পিচগলা পথের ওপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাই, তখন কি নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, এই আমিই একদিন সেই উদার সামুদ্রিক জীবনের শরিক ছিলাম? না, সে-"আমি" এ-"আমি" নয়। এই বিধ্বস্ত দেহ, ক্ষতবিক্ষত অন্তর নিয়ে যে মানুষটি প্রতিদিন সময়ের দাম দিয়ে চলেছে,—তার সঙ্গে সেই বহুদিন আগেকার যাযাবর তরুণটির কোন সম্পর্কই নেই।

অথচ, এই মানিয়ে চলা, প্রতিবাদ করতে না পারা, গতিহীন, পরাজিত মানুষটির জীবনেই হঠাৎ সে এসে একদিন দেখা দিলো। দেখা দিল শুধু নয়, দরজায় যেন প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো। আমার সমগ্র সত্তাটিকে ধ'রে প্রবল নাড়া দিলো।

সে রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণ আগে 'বলো হরি—হরি-বোল' আওয়াজ তুলে একদল শবযাত্রী চলে যাবার পর আবার যখন সবকিছু শান্ত হয়ে গেছে, আমিও আমার একক শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েছি,—এমন সময় হঠাৎ মনে হলো, প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। হু-হু করা বাতাস, জানালার পাল্লা-গুলো ধপাস ধপাস ক'রে আছড়ে পড়ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজায় প্রবল করাঘাত। উঠে জানালার পাল্লা সামলে দরজা খুলতে খুলতে ভাবছিলাম, এমন ঝড় মাথায় নিয়ে এতো রাত্রে কে আবার এলো দেখা করতে? কিন্তু দরজা খুলে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি, দাঁড়িয়ে আছে,—সে।

॥ ২ ॥

সাদা সার্ট আর কালো প্যাণ্ট-পরা তরুণবয়সী একটি ছেলে, মাথায় ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, উজ্জ্বল দুটি চোখে অপরিসীম প্রীতি যেন ঝরে পড়ছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

আশ্চর্য, ঝড়ের কথা আমি ভুলে গেলাম। একটু আগে আচমকা যে একটা প্রবল বাতাসের ঢেউ বয়ে গেল, মুহূর্তে তা বিস্মৃত হলাম। ওর হাতদুটি ধরে তাড়াতাড়ি ঘরে এনে বসিয়ে দিলাম আমার বিছানার সামনের দিককার সোফাটায়। জানালা দিলাম খুলে, দরজায় দিলাম খিল।

—একা ?

বললাম,—আর সবাই অন্য ঘরে ঘুমুচ্ছে।

তার আর প্রশ্ন নেই। মুখে শুধু হাসির রেখা। বললে,—চিনতে পারছেন ?

—পারছি। চেহারা ত একটুও বদলায় নি ?

সে আবার হাসলো, পায়ের জুতো খুলে ভালো করে সোফায় এলিয়ে বসলো। বাইরে ঝড়ের সেই আচমকা প্রকোপটা তখন অনেক কমে গেছে, জোরে জোরে বাতাস বইছে, তার বেশি কিছু নয়। সে কোনো উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

—এতো রাত্রে ?

সে একটু হেসে বললো,—বিরক্ত হননি তো ?

উত্তর দিতে গিয়ে আমার গলা বোধহয় কেঁপে গিয়েছিল,—বিরক্ত ? যেন এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়া তৃপ্তি সর্বাঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছে।

এবার তার ঠোঁটের হাসি আরও বিস্তৃত হলো, বললে,—দিনক্ষণ না মেনে হঠাৎ এসে পড়েছি। কেন যে এসে পড়লাম জানি না।

—বাড়ির সবাইকে ডাকি ?

খপ করে সে আমার হাত চেপে ধরলো, বললো,—না।

তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকালো, বললো,—মনে পড়ছে সব কথা ?

আমি সম্মোহিতের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, কিছু বলতে পারলাম না।

সে উঠে জোরালো আলোটার সুইচ নিভিয়ে দিয়ে স্তিমিত, স্নিগ্ধ নীলাভ আলোর বালবটা জ্বালিয়ে দিলো। তারপরে আরও কাছে এসে বসে পড়লো। বললো,—এরকম গল্প করে কতো রাত কাটিয়ে দিয়েছি, আপনার মনে পড়ছে না ?

—তা পড়ছে।

—তবে ?

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার সে একটু হাসলো, আমার হাতটা ধরে নিজের হাতে নিয়ে বলে উঠলো,—না, আর 'আপনি' নয়, 'তুমি'। 'তুমি'র সম্পর্কই ত ছিল আমাদের। তাই না?

আমি সবিস্ময়ে ওর তারুণ্যভরা মুখখানির দিকে তাকিয়েছিলাম! বাইরে চলেছে বাতাসের এলোমেলো খেলা। জানালার বাইরে যেটুকু আকাশ দেখা যায়, তাতে মেঘের আস্তরণের মধ্য দিয়ে পাণ্ডুর একটা আবছা জ্যোৎস্নার আভাও যেন অনুভব করা যাচ্ছে।

সে আমার পাশে বালিশে হেলান দিয়ে বসে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো.—সেই আমাদের প্রথম সমুদ্র-যাত্রা, মনে নেই? কলকাতার লোক, অথচ যাত্রা শুরু করেছিলাম বিশাখাপত্তন বন্দর থেকে।

হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। কার কথা ও বলছে? কে করেছিল সমুদ্র-যাত্রা?

সে বোধহয় ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে ডুব দিচ্ছিল। এক আশ্চর্য সম্মোহন-করা গলায় সে বলতে লাগলো,—জাহাজ গিয়েছিল সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়। মনে পড়ছে না মেলবোর্ণ বন্দরের কথা? জাহাজ ছিল মাত্র দুদিন। আর মেলবোর্ণে তখন চলছিল দারুণ ক্রিকেট খেলা।, তাই সিডনি বন্দরে না গিয়ে জাহাজকে যখন যেতে হলো মেলবোর্ণে, তখন ক্যাপ্টেন থেকে চীফ অফিসার পর্যন্ত সবাই একেবারে আহ্লাদে আটখানা! ট্যাসম্যান-সাগর দিয়ে ঢুকে ট্যাসম্যানিয়া দ্বীপকে বাঁয়ে রেখে আমরা যখন মেলবোর্ণ বন্দরে গিয়ে ঢুকলাম, তখন সেলার্স-হোমের মারফৎ টিকিট যোগাড় করে কে আগে ভুবনবিখ্যাত মেলবোর্ণ-স্টেডিয়ামে প্রবেশ করবে, তাই নিয়ে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। মনে নেই তোমার? আমি চোখ বুজলেই সে দৃশ্য দেখতে পাই। আমরা ক'জন টিকিট পাওয়া ত দূরের কথা, জাহাজের ডিউটি থেকেই ছাড়া পাইনি। তবু আমরা দুজনে জেটিতে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় গেট থেকে বাইরে বেরিয়ে রেস্তোরাঁর খোঁজে একটা ক্ষুদে অন্ধ গলিতে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম মনে আছে? তালি মারা প্যাণ্ট আর ছেঁড়া জামা-পরা ছোট একটি ছেলে ভাঙা ব্যাট নিয়ে বল খেলছিল, আর তার মা তাকে বল গড়িয়ে গড়িয়ে দিচ্ছিল। ছেলেটি ভালো হাঁটতে পারে না, পায়ে কোনো দোষ ছিল, তাই দিয়ে সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বলটাকে তাড়া করে সজোরে মারবার চেষ্টা করছিল। আর তার তরুণী মা ছুটে ছুটে বল কুড়িয়ে এনে তার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। মনে পড়ে এরপর কী হয়েছিল? তুমি মেয়েটিকে কী যেন বলতে গিয়েছিলে, সে-কথা শোনবার আগেই ঝংকার দিয়ে সে বলেছিল,—এখন আমাকে ডিস্টার্ব করো না, অন্য মেয়ের কাছে যাও। দেখছো না ছেলেকে বল খেলাচ্ছি? আমরা গরিব। খুবই গরিব! কিন্তু কে বলতে পারে আমার ছেলে একদিন বড়ো হয়ে মেলবোর্ণ স্টেডিয়ামে বড়ো ম্যাচ খেলবে না ব্র্যাডম্যানের মতো?

এ পর্যন্ত বলেই সে থেমে গেল। এরপর কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। অবশেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি বলে উঠলাম,—হ্যাঁ, মনে পড়ে বই কি সেই খোঁড়া ছেলেটিকে। একখানা ভাঙা ব্যাট নিয়ে সজোরে বল পেটানোয় তার কী উৎসাহ!

উত্তরে সে বললে,—সেই সঙ্গে এ কথাও নিশ্চয় মনে পড়ে, এই মেলবোর্ণ বন্দর থেকেই আরও দূরে এক অজানা দেশের দিকে আমাদের জাহাজ রওনা হয়েছিল। সব ছাড়িয়ে আমার মনে পড়ছে সেই আশ্চর্য যাত্রা, আশ্চর্য দেশ, আর আশ্চর্য মানুষগুলির কথা!

আমি হুইল-হাউসে থার্ড অফিসারের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, প্রায় কাছাকাছি বয়সের মানুষ ছিলাম আমরা। আমি সেই মানুষটির বাহু আঁকড়ে ধরেছিলাম, রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম—কোথায় যাচ্ছি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে একটু হেসেছিল সে,—বলো তো কোথায়?

—সেটা কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না! সেইজন্যই তো ছুটে এসেছি তোমার কাছে!

তার মুখখানা একটু গম্ভীর হলো, বললে—মুরিয়া দ্বীপ।

—সে আবার কোথায়?

তেমনি গম্ভীরভাবেই বললে—কোথায় সে তো দু-তিন দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে।

—আমি কখনো নাম শুনি নি। তুমি এর আগে গেছো?

—না।

বললাম,—ঐ অজানা দ্বীপে কেন যাচ্ছি?

থার্ড অফিসার তেমনি গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলে,—মালবাহী জাহাজে কাজ করতে এসে এসব তোমার মনে কী করে জাগছে? কখন কী অর্ডার আসে তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? মুরিয়াতে যেতে হবে, ওখান থেকে 'কোপরা' তুলতে হবে, ব্যস।

—কোপ্‌রা? সে আবার কী?

তার থমথমে মুখের ভাব একটুও বদলায় নি, বললে—সবুর করো, দ্বীপে পেঁছিবার পর নিজেই দেখতে পাবে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে প্রশ্ন করেছিলাম—ঐ দ্বীপে যাচ্ছি বলে তুমি তেমন খুশি নও বলে মনে হচ্ছে?

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—কেমন করে খুশি হবো বলো দেখি? ঐ দ্বীপে যাচ্ছি, অথচ তার কয়েক মাইলের মধ্যেই পৃথিবীবিখ্যাত একটি দ্বীপ রয়েছে, যে দ্বীপ আমিও কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি সে নাকি নাবিকদের স্বর্গ।

—সেখানে আমরা যাবো না?

—না। অর্ডার নেই।

ওর বিমর্ষ মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বললাম—কী নাম বলো তো সে দ্বীপের? পৃথিবী বিখ্যাত যখন বলছো, তখন নাম বললে চিনতেও হয়ত পারি।

সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললো,—শুনতে চাও তার নাম? তাহিতি।

আমার সারা শরীর শিউরে উঠলো, অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করে বলে উঠলাম—তাহিতি!

সে বললো,—হ্যাঁ, পল গগ্যাঁর সঙ্গে যে নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে! স্মরণীয় হয়ে আছে বহু লেখকের লেখায়। চার্লস ডারউইন গিয়েছিলেন ওখানে তরুণ বয়সে। গিয়েছিলেন পিয়ের লোতি আর স্টিভেনসন।

আমি অবাক হয়ে থার্ড অফিসারের চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। থার্ড অফিসার ঘর ছেড়ে জাহাজের বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলতে লাগলো, যে জাহাজে উঠেছে জাহাজী হয়ে, সে-ই স্বপ্ন দেখবে জীবনে অন্তত একবারও তাহিতি দ্বীপে যাবার। তাহিতি-তাহিতি! তিন অক্ষরের কী যে মধুর নাম! নামের মধ্যেই যেন জড়িয়ে রয়েছে অগাধ স্বপ্ন!

প্রশ্ন করলাম,—যাবো না আমরা তাহিতি?

আবার দীর্ঘশ্বাস। থার্ড অফিসার বললো—তাহিতির পাশের দ্বীপে যাচ্ছি। সামান্য কয়েক মাইলের তফাৎ। হয়ত তটভূমিতে দেখাও যাবে, স্বর্ণঝরা বালুবেলায় নারকেল বীথির ছায়ার নিচে, তাহিতি সুন্দরীরা চাঁপা ফুলের মালা গলায় দুলিয়ে আর মাথার কেশকলাপে জড়িয়ে গীটারের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৃদুমৃদু পদক্ষেপে নাচছে!

বলতে বলতে তার চোখ দুটি বুজে এলো। বললে,—আমি যাবোই, কেউ রুখতে পারবে না আমাকে! লুকিয়ে-চুরিয়ে একটা নৌকা ভাড়া করে—কতদূরই বা? কী বলছো! এতদূর এসে শেষ পর্যন্ত তাহিতি দেখতে পাবো না? নিশ্চয়ই দেখবো!

মৃদুকণ্ঠে বললাম—অতো দুঃসাহসী হওয়া কি ঠিক? যদি তোমাকে ফেলে জাহাজ চলে যায়?

সে প্রায় চিৎকার করে উঠলো, যায় ত যাক। আমি থেকে যাবো ঐ দ্বীপে পল গঁগ্যার মতো।

বলতে বলতে আবার সে উধাও সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালো 'রেলিং'-এর ওপর দুটি হাত রেখে। তারপরে নিজের মনেই বার কয়েক উচ্চারণ করলো—তাহিতি-তাহিতি!

গীটারের তারের শেষ ঝংকারটির মতো তার উচ্চারিত শব্দ যেন নিঃসীম সমুদ্রের বুকে ধীরে মিলিয়ে গেল। সমুদ্র এখানে আগাগোড়া নীল নয়, কিছুটা

অগ্রসর হবার পর মনে হলো, নীল-নীল জলের মধ্যে কে যেন হঠাৎ এক বোতল ঘোর কালো রঙ ঢেলে দিয়েছে। সেই ভয়-ভয় করা কালো রঙের বিস্তৃতিকে বেষ্টন করে আমরা আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম নিঃশব্দে। নিঃশব্দে বলছি এইজন্য যে, সেই সময় আমরা কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। ডেকে কয়েকজন খালাসী মিলে জটলা করছিল, তারাও হঠাৎ চুপ করে গেছে। বুকের হৃৎপিণ্ডের মতো জাহাজের ইঞ্জিনে একটা ধ্বক্‌ধ্বক্‌ অনুরণন চলছিল শুধু, আর সমুদ্রের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল মানুষের সজোরে নিঃশ্বাস টানা আর নিঃশ্বাস ফেলার চাপা শব্দের মতো।

*　　*　　*　　*

—মনে আছে তোমার সব কথা? ফিস্‌ফিস্‌ করে খুব অন্তরঙ্গ সুরে মুখের কাছে মুখ এনে সে বললে,—সারা জাহাজ জুড়ে এক উত্তেজনার ঢেউ, সবারই মন ছুটে চলেছে 'তাহিতি'র অভিমুখে।

আমি ওর চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম, তাকাতে তাকাতে এই প্রবীণ দেহটির অন্তরালে যে প্রাণ-প্রদীপটি জ্বলছে, তাকে ঘিরে যেন মুগ্ধ পতঙ্গের গুঞ্জন শুরু হলো, তাহিতি-তাহিতি! আমি আর সাঁতরাতে পারছি না, স্মৃতির সমুদ্রে ক্লান্ত সত্তাটিকে বহন করে কতদূর আর সাঁতার দিতে পারি! এই দিশাহারা 'আমি'কে যেন অতি সন্তর্পণে কোনো তীরভূমিতে উত্তরিত করতে চাইছিল সে। তরুণীর কানে কানে তরুণ প্রেমিকের গুঞ্জরণের মত সে বলতে লাগলো, বুড়ো ইঞ্জিনিয়ায়ের কথা মনে আছে তোমার ঐ জাহাজের? সে সারা পৃথিবী টহল দিয়ে বেরিয়েছে বহুবার। সে আমাদের কথাবার্তা শুনে বলেছিল, মেলবোর্ণ থেকে উত্তর-পূর্বে কোণাকুণি যদি সরলরেখা টেনে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া যায়, তা হলে পেঁছিবো একেবারে ভ্যাঙ্কুভারে। 'ভ্যাঙ্কুভার' হচ্ছে কানাডায়। আর যদি হাওয়াই দ্বীপে পেঁছে কোণাকুণি না চলে আমরা কুড়ি ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা ধরে বরাবর চলে যেতে থাকি, তা হলে মেক্সিকোয় গিয়ে পেঁছিবো।

ইঞ্জিনিয়ারের এ বর্ণনায় অবাক হবার কিছু ছিলো না। তখনকার অভিজ্ঞ নাবিকেরা তাদের জানা কোনো জায়গার অবস্থিতির কথা বোঝাতে গিয়ে কথায়-কথায় অক্ষরেখা-দ্রাঘিমারেখা নির্ভুল বলে দিতে পারতো। কিন্তু থাক্‌ ও প্রসঙ্গ! ইঞ্জিনিয়ারের বর্ণনায় অসহিষ্ণু হয়ে সেদিন তাকে আমি বলেছিলাম, চুলোয় যাক হাওয়াই আর মেক্সিকো! আপনি তাহিতির কথা বলুন?

বুড়োর মুখে হাসি দেখা দিলো। তার সামনের একটি দাঁত ছিল সোনা দিয়ে বাঁধানো, তার ওপর আলো পড়ে সোনাটা চিক্‌চিক্‌ করতে লাগলো,—তাহিতি! তাহিতি একটা স্বপ্নরাজ্য! ওখানকার 'ভাহিন'দের কথা বলে শেষ করা যায় না। আমি বার তিনেক গেছি, আর প্রত্যেক বারেই 'তাহিতি'কে নতুন বলে ঠেকেছে। 'তাহিতি' কখনো পুরোনো হয় না।

ব্যস, বুড়ো চুপ। সে যেন হঠাৎ তার স্মৃতির অতলে ডুব দিলো।

—তাহিন কারা?

বুড়ো যেন মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো, বললে,—তাহিতি-সুন্দরীদের কথা শোনো নি? শোনো নি তাদের নাচের কথা? পিঠ ভর্তি রেশমী নরম চুল এলিয়ে মাথায় মুকুটের মতো কাঠ-চাঁপাফুলের মালা জড়িয়ে নেয় তারা। গলাতেও কখনো কখনো দোলে ঐ চাঁপাফুলের মালা, বুকে বক্ষ-বন্ধনী ছাড়া আর কিছু নেই। কোমরে—

বলতে বলতে বুড়ো একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপরে আবার বলতে শুরু করলো, না-না—কোমর কেন, নাভিরও অনেক নিচ থেকে শুরু হয় তাদের মেখলার অংশ। মেখলাগুলিও কাপড়ের নয়, কতগুলি তন্তু বা ফাইবারের সমষ্টি। সোনালী রঙের, খড়ের মতো দেখায়, কিন্তু খড় নয়, অনেকটা পাটের মতো। ভাবো তো একবার! গীটারের সুরে সুরে তারা যখন চাঁদের আলোয় বালুবেলার ওপর মৃদুছন্দে দেহহিল্লোলে নাচে, তখন কী অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়!

আমাদের আসরে সেদিন থার্ড অফিসার মাসুদও ছিল। সে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—ইস্! আমরা অত্তো কাছে গিয়েও তাহিতি দেখতে পাবো না? তাই কি হয় নাকি?

*   *   *   *

তোমার মনে আছে, জাহাজ যত এগিয়ে চলেছে, ততই আমাদের অস্থিরতা বাড়ছিল? জাহাজে ছোট একটা লাইব্রেরি ছিল, সেখানে গিয়ে তন্নতন্ন করে মমের 'মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স' বইখানা খুঁজলাম, পেলাম না। কী যে আফশোষ হচ্ছিল তখন, তা বলার নয়। পল গঁগ্যার তাহিতি-জীবন নিয়ে লেখা বইখানা কেন আগে পড়িনি! ওতে নিশ্চয়ই আছে তাহিতির বর্ণনা! ধিক্কারে অনু-শোচনায় যেন মরে যাচ্ছিলাম! বইখানার খবর দিয়েছিল মাসুদ। তাকে গিয়ে ধরলাম,—আছে তোমার কাছে 'মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স?'

সে প্রায় মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো বলা যায়। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—কী করে জানবো যে আমরা তাহিতির দিকে যাচ্ছি, নইলে কি বাড়িতে ওটা ফেলে আসি? এখন 'তাহিতি' যাচ্ছি একটা লাইনও মনে পড়ছে না বইখানার! স্মরণশক্তিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে।

বিফল মনোরথ হয়ে লাইব্রেরিতে এসে আবার খোঁজাখুঁজি। স্টিভেনসন কিম্বা অন্য কোনো লেখকের লেখাও যদি পেতাম। নেই, স্টিভেনসন নেই, পিয়ের লোতি নেই, কিচ্ছু নেই! যতো সব গোয়েন্দা আর খুনোখুনির গল্পে লাইব্রেরি ভর্তি। সারাদিন বইয়ের পর বই ঘেঁটেও আমরা 'তাহিতি' সম্পর্কিত কোনো 'তথ্য'ই আবিষ্কার করতে পারলাম না।

আমরা ততদিনে ট্যাসম্যান সাগর পেরিয়ে 'সাউথ-সী' ছাড়িয়ে গভীর সমুদ্রে

পড়েছি। সমুদ্রের রং কালো, আর সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তেও কালো মেঘের ছটা দেখা গেল। জাহাজের নেভিগেশন চার্ট অনুযায়ী আমরা তখন দক্ষিণ ট্রপিক রেখা ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কালো মেঘ দেখে জাহাজের ছোট বড়ো সবার মুখই শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে, ঝড়টা অন্য দিক দিয়ে বয়ে গেল, যদিও তারই ধাক্কায় সমুদ্র উঠেছে ক্ষেপে, জাহাজটা মোচার খোলার মতো একবার এ-কাত আর একবার ও-কাত হতে থাকলো। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কেবিনের জিনিসপত্র সব হুড়মুড় ক'রে পড়ে গিয়েছিল বলে মেঝের ওপরই সেগুলি সরিয়ে রেখে বিছানার গদি মেঝেয় টেনে এনে তারই ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। চীফ স্টুয়ার্ড এসে কী সব ওষুধ পত্তর খাওয়াতে লাগলো, তবু অসুখ পুরোপুরি সারলো না। যা মুখে তুলি, তাই বমি হয়ে যায়।

পরদিন সকালে, জাহাজও একটু স্থির হয়েছে, আমিও মোটামুটি 'স্থির' আছি, এমনি সময় মাসুদ এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ঢুকে পড়েছি, আমরা পলিনেশিয়ায় ঢুকে পড়েছি!

মানে!

ও আমার গদীর ওপরে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বললে, প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলটাকে পলিনেশিয়া বলে। অজস্র দ্বীপ ছড়িয়ে আছে এ-দিক, ও-দিক! ও-গুলিরই ভৌগোলিক নাম,—পলিনেশিয়া।

—তাহিতি কতদূর?

সে বললে,—নেভিগেশন চার্ট দেখছিলাম। আমরা এখন দক্ষিণ ট্রপিক রেখা ছেড়ে আরও উজিয়ে কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা ধরবার চেষ্টা করছি। ওটা ধরে ক্রমাগত পুবমুখো যেতে হবে। চলো না দেখবে?

আমার হাত ধরে কোনক্রমে উঠিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। একটু যেতেই আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আমাকে দু-হাতে জাপটে ধরে মাসুদ ওপরে নিয়ে গেল, তারপরে আরও একটি তলা উঠতে হবে। এসব তোমার মনে নেই?

আমি উত্তর দিতে পারিনি। দুটি চোখ দিয়ে ওরই মুখের দিকে একান্ত তৃষ্ণায় তাকিয়ে আছি। সে বলতে লাগলো,- হুইল হাউসে পৌঁছে আমরা চার্ট দেখলাম, খুব বড়ো একটা কাগজে ম্যাপের মতো আঁকা, তাতে জায়গায় জায়গায় পিন্ আটকানো। পিনের মাথাগুলো বোতামের মতো। কোনোটা লাল, কোনোটা নীল, কোনোটা সবুজ। এসব দিয়ে কীভাবে ওরা দিক্ নির্ণয় করে, আমার জানা নেই। একটা লাল পিন্ দিয়ে বোঝালো, আমরা এইখানে রয়েছি। ডানদিকে দ্যাখো, কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখাকে যেখানে ১৫০ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখা এসে ছুঁয়ে গেছে, তার কিছু উত্তরে ঐ দ্রাঘিমারেখা ধরে চললেই ডানদিকে এই দ্যাখো 'মুরিয়া'-দ্বীপ, এখানেও একটা লাল মাথা পিন্ বসানো রয়েছে। আমরা এখানেই যাবো।

—তাহিতি?

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—মুরিয়ার পূর্বদিকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাহিতি।

—যাবে না ?

সে বললে,—ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়েছিলাম। স্টোনফেস—পাথরের মুখ। এক কথায় বললে, নো অর্ডার অ্যাজ ইয়েট।

—তাহলে ?

সে আমার হাত ধরে বললে,—চলো, রেডিও অফিসার দোসীর ঘরে যাই। কোনো খবর যদি আসে তো, রেডিওর মাধ্যমেই আসবে।

—মনে আছে তোমার ?—সে বলতে লাগলো,—সেই থেকে আমাদের কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল রেডিও অফিসারের কাছে ধর্ণা দেওয়া। যদি খবর আসে,—তাহিতিতে যাও! তাহিতি—তাহিতি! তিনটি অক্ষরের এই নাম যেন আমাদের পাগল করে দিয়েছিল!

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত হতে লাগলো, চোখ দুটি স্বপ্নিল হয়ে উঠলো,—নিঃসীম সমুদ্রের দিকে তাকাই, দিগন্তরেখায় কালো বিন্দুর মতো কিছু একটি চোখে পড়ে, আর আমরা রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ি,—ল্যান্ড! মাটি!

ক্রমে ক্রমে নারিকেল-বীথির সারি চোখে পড়লো। চোখে পড়লো হলুদ-হলুদ বেলা-বালুকার রঙ। ঐ কি তবে তাহিতি? কিন্তু জাহাজ কিছুদূর এগিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলো, আবার উধাও সমুদ্র,—কোথাও নীল, কোথাও কালো।

ও বলতে লাগলো,—এমনি ক'রে ক'রে একদিন, বেলা তখন বারোটা হবে, আমরা গিয়ে মুরিয়া দ্বীপে নোঙর ফেললাম। তোমার মনে আছে সব কথা? তটরেখার বেশ কিছু দূরে গিয়ে জাহাজ দাঁড়ালো। একটা কাঠের জেটি তটরেখা থেকে সমুদ্রের মধ্যে প্রায় সিকি মাইলের মতো ঢুকে আছে, তারই পাশে গিয়ে জাহাজ ভেড়ালো পাইলট। শুনলাম, ছোট্ট দ্বীপ। মাইল দশ-পনেরোর মতো লম্বা, চওড়ায় মাত্র মাইল পাঁচ-ছয়। মাঝখানটা কূর্মপৃষ্ঠের মতো। তার পাদদেশে, চারপাশ ঘিরে ওদের গ্রাম গ'ড়ে উঠেছে। যেখানে ভিড়েছিলাম, তার নাম একটা অবশ্যই আছে, কিন্তু এতদিনে ভুলে গেছি, ডাইরিতেও নোট করা নেই।

—কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো কী?—ও বলতে লাগলো,—পিঠের ওপর বড়ো বড়ো বস্তা নিয়ে গুদাম থেকে মজুরেরা মাল এনে রাখতে লাগলো জেটির কিনারে সার দিয়ে। এদৃশ্য আমাদের কাছে এত পুরোনো যে, ওতে আর মন টানে না। শুধু এটুকু শুনলাম, বস্তার ভিতরে আছে নারকেলের টুকরো, যাকে বলা হয় 'কোপরা'।

অনেকে ভোরে উঠে তীরে নেমে বালুবেলা দিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে এলো। কিছুটা ভিতরে একটা ছোট্ট শহর আছে, কেউ-বা সেখানেও এক চক্কর ঘুরে

এলো। আমাদের সে ইচ্ছা হয়নি। আমি আর মাসুদ নেভিগেশন-রুমে রয়ে গেলাম। লাল মাথা পিনটি সেই যে 'মুরিয়া'র ওপর অনড় হয়ে ব'সে আছে, তার আর কোনো গতি হয়নি। সেখান থেকে আমরা গেলাম দোসীর কাছে। দোসী কানে হেডফোন লাগিয়ে তার কাজ করে যাচ্ছিল, আমাদের দিকে এক সময় মুখ ফিরিয়ে বললে,—একটা অর্ডার আসছে হে! আমাদের 'ফা' বলে একটা জায়গায় যেতে হবে।

—সেটা কোথায় ?

—তা জানি না।

মাসুদ ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললে,—তাহলে 'তাহিতি' আমরা যাচ্ছি না ?

—তাইতো মনে হচ্ছে।

মাসুদ অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবলো, তারপরে উঠে দাঁড়ালো। আমাকে নিয়ে সোজা চলে এলো হুইল হাউসে, নেভিগেশন চার্টের সামনে! 'মুরিয়া'য় সেই লালমাথা পিনটি লাগানো রয়েছে, আর তার কাছাকাছি উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে একটি বিন্দুর পাশে লেখা রয়েছে 'পাপিতে'। বানানে 'পাপিতে', কিন্তু পরে জেনেছিলাম ওর স্থানীয় উচ্চারণ 'পাপাইতে'। এর পাশে ব্র্যাকেটে ছিল 'তাহিতি'। মাসুদ একটি স্কেল নিয়ে কী যেন মাপজোখ করলো, তারপরে বলে উঠলো, ইস মাত্র দশ মাইল দূরে!

কথাটা শুনে আমি বাইরে এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম, দিগন্তরেখার দিকে আমার দৃষ্টি, দশ বারো মাইল হলে নিশ্চয়ই তটরেখা চোখে পড়বে।

মাসুদ পাশে এসে দাঁড়ালো, বললে,—তাহিতি দেখবার চেষ্টা করছো ? কী করে দেখবে ? আমরা যে 'বে'-র মধ্যে ঢুকে রয়েছি। 'বে'-থেকে বেরিয়ে উত্তর-পূর্বে যেতে হবে, না হলে 'তাহিতি' দেখবে কেমন করে ? দিস্ ল্যান্ড ইজ দি বেরিয়ার! দাঁড়াও, আমি একটা ওয়েআউট বার করছি।

বলে আমাকে নিয়ে হাজির হলো একেবারে ক্যাপ্টেনের ঘরে। ক্যাপ্টেন বয়সে বৃদ্ধ যদি না-ও হন, নাবিকী ভাষায় তিনি 'বৃদ্ধ' বা ওল্ডম্যান। আমাদের বাঙালী সারেঙ বা খালাসীরা তাঁর আরও চমৎকার নামকরণ করেছে, 'বাড়িওয়ালা'। অবশ্য এসব তো তুমি জানোই।

এইখানে একটু থেমে আমার দিকে সে একটু তাকালো। পরক্ষণেই দৃষ্টি সরিয়ে জানালার দিকে মুখ ফেরালো, বলতে লাগলো,—ওল্ডম্যানের মুখখানি পাথর দিয়ে গড়া। টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে তিনিও কী যেন দেখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, কী চাও ?

মাসুদ সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে,—স্যার, হোয়ার ইজ 'ফা' ?

উত্তর এলো,—সেটা আমিও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি। ... বি নিয়ারার টু আস্।

—নো চান্স অব সেইলিং টু তাহিতি ?
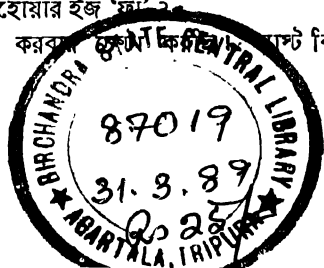
পাথরের মুখ উত্তর দিলেন,—ইয়ু মিন পাপাইতে? ক্যাপিট্যাল অব তাহিতি? নোপ্‌। নট দিস্‌ টাইম।

পরাজিত সৈনিকের মতো আমরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।

মাসুদ সেই থেকে যে 'গুম মেরে' গেল, তার মুখে আর 'রা' নেই। আমরা সেই মুহূর্তে যে যার কাজে চলে গিয়েছিলাম। কাজ করতে করতেও ভাবছিলাম মাসুদের কথা। ওর যা মনের অবস্থা, সত্যি সত্যিই না সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দেয়। অবশ্য সাঁতার জানা থাকলেও দশ মাইল সমুদ্র পার হওয়া সোজা কথা নয়। অজানা সমুদ্রে সে চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা মাত্র। এক, যদি লাইফ বোট নামিয়ে নিতে পারে। কিন্তু 'ওল্ডম্যান' যেরকম লোক, তাতে সে আদৌ রাজী হবে বলে মনে হয় না।

যাইহোক, মাসুদকে যথাসম্ভব চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করলাম। এক-সময় ও চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ঘরের দিকে গেল, কিন্তু ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরেই। তাহিতির 'ভাহিন'দের গল্প বোধ হয় তেমন আর জমলো না। জমলে কি আর কি তখুনি উঠে আসতো?

সারা জাহাজে কেমন যেন একটা নৈরাশ্যের ভাব। ঘড়াং ঘড়াং করে ডোরিকের শব্দ হচ্ছে, মাস্তুলের মতো লম্বা একটি দাঁড় ডোরিক নামক যন্ত্রের শাসনে ক্রেনের মতো কোপরার বস্তা চার নম্বর ফলকার গহ্বরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ডিউটির লোকেরা যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে, কিন্তু সে কাজে যেন প্রাণ নেই।

বেলা তিনটে নাগাদ ডোরিকের শব্দ থামলো। চীফ অফিসারের নির্দেশে ফলকা,—অর্থাৎ জাহাজের গহ্বর, যাতে মাল বোঝাই করা হয়, সেগুলি বন্ধ করতে লাগলো নাবিকরা। ক্যাপ্টেনের কামরার মাথায় খাটানো দড়িতে ঝুলতে লাগলো একটি বিশেষ ধরনের ফ্ল্যাগ, যার অর্থ, পাইলট ওয়াণ্টেড। যেন বলতে চায়, জাহাজ বন্দর ছেড়ে রওনা দেবার জন্য তৈরি, এখন পাইলট এলেই হয়।

জাহাজের সিঁড়ি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটু পরে জেটির বিপরীত দিকে জাহাজের গা বেয়ে ফেলে-দেওয়া দড়ির মই বেয়ে পাইলট উঠে এলো। মইয়ের নিচে এসে ভিড়েছিল ছোট্ট একটি মোটর বোট, তার গায়ে বড়ো করে লেখা 'পাইলট'।

পাইলট উঠে আসতেই কয়েকজন নাবিক তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—আর উই নট গোইং পাপাইতে?

—নোপ্‌।

—হাউ ফার ইজ 'ফা'?

—জাস্ট নাইন মাইল্‌স্‌ ফ্রম দি হারবার পয়েণ্ট।

পাইলট তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে গেল। জাহাজের জেটি ছেড়ে যেতে বড়ো জোর আর আধ ঘণ্টা লেগেছিল। পিছন পিছন পাইলট

বোটটি আসছিল না, রেডিও-অফিসারের কাছে শুনলাম, সেটি পরে আসবে, কারণ এই পাইলটই আমাদের নিয়ে যাবে 'ফা' তে।

খানিকক্ষণ বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। বোধ হয় মাসুদের অবস্থাও হয়েছিল আমাদের মতো।

ঘণ্টাখানেক মাত্র কেটে গিয়েছিল। তারপরে মনে হলো, জাহাজের গতি স্থির হয়ে আসছে, নোঙর ফেলার শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি নাবিকদের 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' হাঁক। আমি কেবিন ছেড়ে বাইরে এলাম।

উধাও সমুদ্র ছেড়ে কখন আমরা একটি খাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছিলাম কে জানে! কাঠের লম্বা জেটি খানিকটা জলের দিকে সরে এসেছে। জাহাজ জেটিতে ভিড়তে লাগলো, আমরা অবাক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জেটি যেখানে তটভূমি ছুঁয়েছে, যেখানে গোটা তিনেক লাল রঙের স্টেশন-ওয়াগন ধরনের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আশেপাশে বিরাট বিরাট গুদামের শেড, কংক্রীটের রাস্তা, দোকানপাট, কিছু হ্যালফ্যাশানের ঘর-বাড়ি, কিন্তু সবই বাঁদিক ঘেঁসে। আমি যা দেখে অবাক হয়েছিলাম, তা ছিল ডান দিকে। ডান দিকটা একটা প্রকাণ্ড ঝিলের মতো, মেয়েদের হাতের বালার মতো ঝিলটিকে তটভূমি গোলাকারে ঘিরে রেখেছে। তার একেবারে এক প্রান্তে একটি খড়ের চালা, কয়েকটি গাছপালা,—তাছাড়া, একদিকে নারিকেল গাছ ছিল বটে, অন্য দিকটা ধু-ধু বালুর মতো দিগন্তে মিশেছে, সেখানে আবার কিছু গাছপালার আভাস, এবং আমাদের দিকে—নিঃসীম সমুদ্র। সমুদ্রে ঢেউ উঠছে, নামছে, ভেঙে পড়ছে, কিন্তু ঝিলের জল একেবারে নিস্তরঙ্গ—একটি বিশাল আয়নার মতো পড়ে আছে, তাতে পড়েছে শুভ্র মেঘদলের ছায়া। কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। তখন বেলা মাত্র চারটে, দিগন্তরেখার ঠিক উপরে, একটি উজ্জ্বল তারা ফুটে রয়েছে। আমি সম্মোহিতের মতো রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দিনের আলোয় অমন জ্বলজ্বলে 'তারা' দেখা, এ আমার পক্ষে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। পরে শুনেছিলাম, পলিনেশিয়ার মহাসমুদ্রে এ নাকি আদৌ বিস্ময়কর কিছু নয়।

জাহাজের কোথায় কী হচ্ছিল জানি না, আমি রেলিং ছেড়ে একবিন্দুও নড়তে পারলাম না। ধীরে ধীরে দিনের আলো স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলো, ঐ তারাটা একটু একটু করে ওপরে উঠলো, তাকে আরও বড়ো আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আমি ঝিলের জলে ঐ তারারই প্রতিবিম্ব দেখছিলাম। বাঁ-দিকে ঐ নারিকেল-বীথি, ডানদিকে ঝিলের প্রান্তে একটি কুটির আর তারপরেই উধাও মাঠ—সব মিলিয়ে যেন কোনো শিল্পীর আঁকা অবিস্মরণীয় ছবি।

কিন্তু এরপরে আরও বিস্ময় যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, তা আমি জানতাম না। দিনের আলো তখনো মিলিয়ে যায় নি, বড়ো উজ্জ্বল তারাটি দিগন্ত ছাড়িয়ে আকাশের খানিকটা ওপরে চলে এসেছে, এমন সময় ঠিক দিগন্তরেখায় একটি আলোর বিন্দু জ্বলে উঠলো। তার আগে ওখানে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়লো একটা আলোর বিভা, তারপরে দেখতে দেখতে ফুটে উঠলো

আধখানি ধনুকের মতো চাঁদ। ঠিক সূর্যোদয়ের মতো, কিন্তু উদয় লগ্নের রবির মতো আরক্তিম নয়। চাঁদকে উদয় মুহূর্তে দেখাচ্ছিল ঝলমল-করা স্বর্ণপিণ্ডের মতো এবং আমার চোখের সামনেই সে উঠে পড়লো গোলাকার সোনার একখানা থালার মতো! আগে দেখা আকাশের ঐ তারাটিকে এবারে চিনলাম, যাকে আমরা সন্ধ্যাতারা বলি—আসলে ভেনাস—শুক্রগ্রহ।

দিগন্তরেখাটি ছুঁয়ে চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে, বেশ বড়ো একটি থালার মতো সমুদ্র থেকে উঠে পড়বার পরে আর তাকে স্বর্ণথালি বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যথাযথ একেবারে সুকান্তর কবিতার মতো 'যেন ঝলসানো রুটি!'

তখনো দিনের আলো নেভেনি। লোকজন ঘুরছে ফিরছে, কাজ করছে, জেটির ওপরে বস্তা পিঠে করে মাল এনে ফেলছে। কোথাও কোনো আলো জ্বলেনি, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তের কাছে, অল্প দূরে স্নিগ্ধ আলোয় উজ্জ্বল শুক্রগ্রহ।

দিনের আকাশে চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা, এ বর্ণনা আমি পরে যখন হাতড়ে হাতড়ে পলিনেশিয়া সম্পর্কিত বইগুলি পড়েছিলাম, তখন কোথাও পাইনি। মম, স্টিভেনসন, পিয়েরলোতি থেকে শুরু করে আরও কতো লেখকের বই, কোথাও এ বর্ণনা নেই। সবাই তাহিতি দ্বীপের সুন্দরীদের বর্ণনায় মুখর, কিন্তু এই আশ্চর্য প্রাকৃতিক শোভার কথা কেউ লেখেন নি কেন? এই জায়গাটার নাম—'ফা',-এই 'ফা'তেই হয়ত এই চিত্র দেখা যায়, আর ওরা কেউ হয়ত অখ্যাত এই 'ফা'তে আসেন নি, সবাই ছুটেছিলেন 'তাহিতি'র দিকে।

* * *

—তুমিই বলো, অভিভূত না হয়ে পারা যায়?—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগলো,—ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হলো, জেটির আলো জ্বলে উঠলো, চাঁদের আলো এবার আমাদের দেশের মতোই স্নিগ্ধ। ফুটফুটে রুপালী জ্যোৎস্না ঝিল, মাঠ-ঘাট, সমুদ্র, সব একাকার করে দিয়েছে। ঝিলের আয়নায় আর একটি চাঁদ আর শুক্রগ্রহকে দেখা যাচ্ছে। নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ জলে তাদের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব—এ দৃশ্যই কি কম মনোহর?

আত্মহারা হয়ে চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ কাঁধের ওপর কার হাতের স্পর্শ। তাকিয়ে দেখি ঝকঝকে স্যুটপড়া মাসুদ আর তার পিছনে দোসী, বললে, রেডি হয়ে নাও, চলো আমাদের সঙ্গে।

—কোথায়?

বললে,—শহরে যাচ্ছি। শীগগির নাও, দেরি করো না। শহর এখান থেকে মাত্র চার-পাঁচ মাইল।

ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। বললাম,—তোমরা যাও, আমি যাবো না।

—সে কী!

বললাম, আমি ঐ ঝিলের ধারে বেড়াবো। আর কোথাও যাবো না।

দোসী বললে,—তুমি কি পাগল হয়েছ? ঝিলে বেড়িয়ে কী করবে একা একা?

—তা হোক।

মাসুদ বললো,—মাত্র আজ রাত্রিটা! কাল ভোরে জাহাজ ছেড়ে দেবে। পরে আর তাহলে তোমার দেখা হবে না। যাও, কেবিনে যাও, চট করে পোশাক বদলে ফিটফাট হয়ে এসো।

আমি কিন্তু অনড়, অচল।

আশ্চর্য ঐ ঝিল! জল একটুও কাঁপছে না। ঝিলের দর্পণে চাঁদ আর তারা ঠিক আকাশের চাঁদ—তারার মতোই স্থির হয়ে ফুটে রয়েছে, স্থির ও শান্ত, দীঘির মতো! সেইদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে ওদের বললাম,—আমাকে মাপ করো। এই দৃশ্য ছেড়ে কোথাও আমি যাবো না।

—মাথা খারাপ তোমার! বলে একটু রাগ করেই নিচে নেমে গেলো ওরা। ওদের পরে একে একে জাহাজের বহুলোকই ফিটফাট পোশাকে নেমে গেলো দেখলাম। জেটির অপর প্রান্তে গাড়ির হর্ন ঘনঘন বাজতে লাগলো। যারা যাবার তারা সবাই চলে যাবার পর, আমি ধীরে ধীরে জেটিতে পা ফেললাম। তারপরে জেটি পার হয়ে তটভূমিতে। তখনও যে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তা আগে লক্ষ্য করি নি। সেখান থেকে ড্রাইভার হাঁকলো,—কাম মঁসিয়ে, তু তাউন।

—নো থ্যাঙ্কস,—বলে আমি ওদের বিপরীত দিকে রওনা হলাম। সারিসারি দোকান। তারাও আহ্বান জানাতে লাগলো। কেউ বললে, 'কাম মঁসিয়ে,' কেউ আবার যে কী ভাষায় কথা বললে, তার একবর্ণও বুঝলাম না।

—নো থ্যাঙ্কস,—বলতে বলতে সবাইকে এড়িয়ে আমি লোকালয় পার হয়ে একেবারে ঝিলের কিনারে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক সামনেই ধবধবে সাদা রঙ করা ছোট্ট একটা নৌকো একটা খোঁটায় বাঁধা রয়েছে, সঙ্গে দাঁড় পর্যন্ত লাগানো, যেন নেমে নৌকোর মাঝে বসে পড়লেই হয়। চাঁদের বুকের ওপর দিয়ে ওপারে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করলে মন্দ কী! ওপারে, জাহাজ থেকে দেখা সেই কুটির, নারকেল গাছ ও আরো কিছু গাছপালা।

কুটিরের ভিতরে একটি আলোর বিন্দু জেগে উঠেছে। সেই বিন্দুকে বুকে করে কুটিরও ঝিলের আয়নায় নিজের মুখ দেখছে!

ডানদিকে তাকালাম। জেটিতে দাঁড়ানো জাহাজটাকে একটা সরলরেখার প্রান্তে বাচ্চাদের আঁকিবুকি-কাটা ছবির মতো দেখাচ্ছে। ওখানে উধাও সমুদ্র। ঝিল আর সমুদ্রের মাঝখানে কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো বালিয়াড়ি। আর আমার বাঁ-দিকে কিছুদূর পর্যন্ত বালিয়াড়ির লাগোয়া সারি সারি নারিকেল-বীথি। ওপারে কুটির আর ধূ-ধূ মাঠ। মাঝখানে ডিম্বাকৃতি নিস্তরঙ্গ ঝিলের জল।

যে পথটা দিয়ে এগিয়ে এসেছিলাম, সেটা মনে হয় বেঁকে বাঁ-পাড় ধরেই ঐ মাঠের মধ্যে বিলীন হয়েছে। আমি হাঁটতে লাগলাম এই পথ ধরেই।

নারিকেল-বীথিকে বাঁয়ে রেখে চওড়া বেলে রাস্তাটা ধরে মাইল খানেক হাঁটবার পর ঝিল পার হলাম। রাস্তাটা এবার সোজা চলে গেছে মাঠের মধ্য দিয়ে অনেক দূরে, সেখানে বিন্দু বিন্দু দেখা যায় আলোর রেখা, আর দেখা যায় গাছপালার আভাস। ওখানে গ্রাম আছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু অজানা দেশে একা অতদূর যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না, তাই সরু পায়ে-চলা-পথ ধরে সেই একক কুটিরের দিকেই অগ্রসর হতে লাগলাম। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়, পথ চলতে কোনো অসুবিধাই অনুভব করিনি।

কুটিরের কাছাকাছি হতে না হতেই কুকুর ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরুষ-কণ্ঠ কুকুরটাকে শান্ত করতে লাগলো। আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি লোক এগিয়ে এলো। কোমরে ছাপা কাপড়ের লুঙ্গি, গায়ে পাতলা কোনো হালকা রঙের হাওয়াইয়ান সার্ট। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, তরুণ বয়সী মানুষটি এগিয়ে এসে কী ভাষায় যে কথা বললো, তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। তবে বলার ভঙ্গিতে কোন রাগ-বিরাগ ছিল না, এটুকু বলতে পারি। আমি তার কথা বুঝতে পারি নি লক্ষ্য করে সে হাত দিয়ে দূরবর্তী জেটিসংলগ্ন আমাদের জাহাজটিকে দেখালো, অর্থাৎ যেন বলতে চাইলো, তুমি কি ঐ জাহাজ থেকে আসছো? মাথা নেড়ে জানালাম,—হ্যাঁ।

—ইন্দিয়ান?

—হ্যাঁ।

লোকটি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। তারপর পরম সমাদরে কুটিরের দিকে নিয়ে গেল, সঙ্গে-ছুটে-আসা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছিল দেখে সেটাকে থামাতে লাগলো। তার আপ্যায়নের ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতা ছিল যে, আমি যে কুটিরের ভিতরে ঢুকতে চাইনি, মাঠের দিকে সামান্য একটু এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম মাত্র, সেকথা আর তাকে বলতে পারলাম না।

কুটিরের সামনে ছোট্ট বাগান। তার একটি গাছ আমাদের ভয়ানক চেনা। ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, ডালে ডালে ফুলের স্তবক, কিছু নিচেও ছড়িয়ে আছে। যাকে আমরা 'কাঠচাঁপা' বলি, সেই ফুল। আমি নিচু হয়ে তুলতে যেতেই সে তাড়াতাড়ি উবু হয়ে একমুঠো তাজা ফুল কুড়িয়ে আমার হাত দিলো। লোকটির গায়ের রঙ কালো নয়। চোখদুটো একটু ছোট ছোট হলেও নাক থ্যাবড়া নয়। মাথার চুল বড়ো নয়, কোঁকড়া-কোঁকড়া। আমার হাতে ফুল তুলে দেবার সময় তার মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কুকুরটা আমার গা শুঁকে নিয়ে আর ডাকাডাকি করল না। ছোট্ট একটা সাদা কুকুর। গায়ে কালো কিম্বা খয়েরী ছোপ, চাঁদের আলো স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হলেও, কালো কিম্বা খয়েরীর তফাৎ ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

কুটিরের কাছাকাছি হবার পর দেখলাম, দাওয়ার ওপর একরাশ ফুল নিয়ে

মালা গাঁথছিল একটি তরুণী। তার কাছে কোনো বাতি ছিল না, চাঁদের ফুটফুটে আলোতেই তার মালা গাঁথা চলছিল। আমাদের আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো। ওর বুকে সংক্ষিপ্ত কাঁচুলি, কোমরে ছাপা কাপড়ের লুঙ্গি, মাথার খোলা চুলের একদিকে ঐ চাঁপা ফুলেরই একটি গুচ্ছ গুঁজে রাখা। আমার সঙ্গের তরুণটি তাকে যেন কী বললে। তার উত্তরে 'আ-ওয়ে' 'আ-ওয়ে' ধরনের শব্দ উচ্চারণ করে সে মাথা নাড়লো, তারপরে হাসি-হাসি মুখেই আমার দিকে এগিয়ে এসে দুটি হাতে অঞ্জলি পেতে দাঁড়ালো। আমি তার হাতে ফুলগুলি তুলে দেওয়া মাত্র সে খুশি হয়ে মাথা নিচু করে অনেকটা পশ্চিমী 'বাও' করবার মতো ভঙ্গি করে ফুলগুলি দাওয়ার ফুলের রাশির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো, তারপর ছুটে চলে গেল ঘরের ভিতরে। ঘর বোধহয় ঐ একখানিই, ভিতরে বাতি জ্বলছে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে তার আভাস পাওয়া যায়।

তরুণটিরও খুশি-খুশি মুখ। মেয়েটি পরক্ষণেই মোড়া হাতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। তরুণটি সেই মোড়া নিয়ে দাওয়ার কাছ ঘেঁষে সেটা পেতে দিলো। তরুণটি ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললো, মেয়েটির মালা গাঁথা বোধ হয় তখনো শেষ হয়নি। কুকুরটি আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো, আর তরুণটি আমার হাত ধরে কী যেন অনুনয়ের সুরে বললো। তারপরে মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে কী-কী যেন নির্দেশ দিলো, মেয়েটি আবার বারকয়েক বললো, আ-ওয়ে—আঁ-ওয়ে।

তারপরে দেখলাম তরুণটি চলে যাচ্ছে। আমি খাঁটি বাংলায় তাকে পিছন থেকে 'এই' বলে ডেকে উঠেছিলাম। সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমি পকেট থেকে সিগারেটের একটি নতুন প্যাকেট বার করে তার হাতে দিলাম। সেটা পেয়ে সে যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলো। আবার কাছে এসে মেয়েটির সঙ্গে কথা বললো, দেশলাই আনালো, সিগারেট ধরালো, শেষ পর্যন্ত চলে গেল। কুকুরটি পিছন পিছন গিয়ে তাকে যেন খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এলো।

আমার পকেটে কিছুই থাকার কথা নয়, কেননা প্রস্তুত হয়ে বেরোইনি। কখন যে নতুন প্যাকেটের সিগারেট পুরোনোটির সঙ্গে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম মনে নেই। মানুষটি সিগারেট পেয়ে অমন শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠবে জানলে আরও কয়েক প্যাকেট সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম। জাহাজে সিগারেটের অভাব কী?

তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েটির মালা গাঁথা দেখছিলাম। সে এক-একবার চোখ তুলে তাকাচ্ছিল, আর চোখে চোখ পড়তেই অল্প অল্প হাসছিল, এ-ও বড়ো অদ্ভুত। আমি বিদেশী, সম্পূর্ণ অজানা মানুষ। আমাকে দেখে সংকোচে সে একটুও অভিভূত হচ্ছিল না বা দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঘরের ভিতর ছুটে যাচ্ছিল না, পুরুষটি সম্ভবত ওর স্বামী, আমাকে নির্দ্বিধায় স্ত্রীর কাছে রেখে নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখছিলাম দাওয়ার অন্য

দিকে একটি বেতের দোলনা ঝুলছে, মধ্যে নিশ্চয়ই একটি শিশু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে।

অল্পকালের মধ্যেই মেয়েটির মালা গাঁথা শেষ হলো। সে আমার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে ভিতরে চলে গেল। যাবার সময় দোলনা ধরে সামান্য একটু নাড়া দিয়ে গেল। তার নাড়া পেয়ে দোলনাটা আবার মৃদুমৃদু দুলতে লাগলো। কুকুরটা ততক্ষণে ফিরে এসে আমার কাছে বসেছিল। ঝিলের ওপর দিয়ে স্নিগ্ধ বাতাস এসে লাগছে ফুলগাছগুলির পাতায় পাতায়।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো মেয়েটি। তার হাতে একটা কাঁচের গেলাস। আমার দিকে এগিয়ে দিলো। ডাবের জলের সঙ্গে মিষ্টি মেশানো। অথবা ডাবেরই বোধহয় ঐ স্বাদ। আমি চুমুকে চুমুকে ওটা শেষ করতেই সে গেলাস উঠিয়ে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সে এবার ফিরে এসে বসলো আমার কাছ ঘেঁষে দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে। আমার পায়ের পাশেই ওর দুখানি সুগঠিত পদপল্লব। অল্প অল্প পা নাড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে সেই রকম হাসিমুখেই কী যেন বললে, তার মধ্যে একটা শব্দ ছিল 'মুজিক'।

আমার চোখে-মুখে কী ভাব সে ফুটে উঠতে দেখেছিল জানি না, আবার উঠে চলে গেল ঘরের ভিতরে। আবার দোলনায় দিলো সামান্য একটু দোল। তারপরে নিয়ে এলো ছোট্ট একটি গীটারের মতো যন্ত্র। সেটি নিয়ে এসে আমার কাছে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে গীটারে ঝংকার তুললো, মৃদু ঝংকার আর তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে—'আ-লা-লা' ধরনের সুরেলা সুরলহরী! সেই নিস্তব্ধ ঝিলের ধারে নির্জন কুটিরে অবারিত জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় উধাও মাঠের দিকে তাকিয়ে তার ঐ মৃদু সুরেলা কণ্ঠসঙ্গীত! সে যে কী অপার্থিব আনন্দ-লীলার সৃষ্টি করলো তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই।

কতক্ষণ যে তার সুরের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙলো দূরাগত একটি ভ্রমরগুঞ্জনের মতো শব্দ কানে যেতে। তাকিয়ে দেখি মাঠের দিক থেকে দুটি তীক্ষ্ম আলোর ছটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে, তার সঙ্গে ভ্রমর-গুঞ্জন আরও স্পষ্ট হয়ে কানে বাজছে। গীটার থামিয়ে ও-ও সেই দিকে তাকালো, তারপরে চট করে উঠে দাঁড়ালো, ঘরে গিয়ে গীটারটা রেখে এলো। ইতিমধ্যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে সামনের দিকে ছুটে গেছে। আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ওটা কী। একটি মোটর গাড়ি। সেটা অদূরে পথের মোড়ে এসে থামলো। স্টেশন-ওয়াগন ধরনের গাড়ি। গৃহকর্ত্রী ততক্ষণে দাওয়ার একটি খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ঐ দিকে তাকিয়ে রয়েছে উৎসুক দৃষ্টি মেলে।

গাড়ির আলো নিভলো। আর তারপরে দরজা খুলে কয়েকটি তরুণী এদিকে ছুটে এলো। খোলা চুলের রাশি পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত লুটিয়েছে, মাথায় কাঠচাঁপা ফুলের মালা মুকুটের মতো পরা, বক্ষে স্বল্পবাসবন্ধনীর ওপর

দিয়ে ঝুলে পড়েছে চাঁপাফুলের মালা, কোমরে নাভিদেশের নিচে ঘাঘরার মতো কী যেন ঝুলছে। খড়ের মতো কিম্বা পাটের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ সেই সুতো ঝুলছে। জনা ছয়েক তরুণী মেয়ে। কুটিরের দিকে ছুটে আসতে আসতে আমাকে দেখেই বুঝি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে এলো তারা, তাদের একজনের মুখ থেকে চাপা কণ্ঠস্বর নির্গত হলো —লুইজি।

খুঁটি ধরে দাঁড়ানো কুটিরের কর্ত্রী বললে, আ-ওয়ে!

নিস্পন্দ দেহে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হলো, তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। দু'পক্ষের মধ্যে দুর্বোধ্য বাক্যবিনিময়। এক সময় আমার সঙ্গিনী অল্প হেসে সেই ফুলের মালা মাথায় ও গলায় পরলো, তারপরে ছুটে দাওয়া থেকে নেমে, ঐ মালা খুলে তাদের হাতে বিলিয়ে দিলো। তারা ওর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো, যেন ওদের সঙ্গে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। তাদের মুখে বার বার 'লুইজি-লুইজি' শুনে সন্দেহ হচ্ছিল, 'লুইজি'ই হবে বোধহয় আমার সঙ্গিনীর নাম।

অবশেষে, বিফল মনোরথে তারা চলে গেল। গাড়ির দরজা বন্ধ হলো, হেড লাইট জ্বালিয়ে যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে তারা, যে পথে আমি এসেছিলাম, সেই ঝিলের ধারঘেঁষা পথ ধরে উধাও হয়ে গেল। সে এলো আমার কাছে, দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলাম,—লুইজি?

সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো, অল্প একটু হেসে নিজের বুকে হাত রেখে বললে,—মি লুইজি।

বুঝলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়, তারই নাম লুইজি। লুইজি খানিকক্ষণ বসে পা নাচালো, বার কয়েক আমার দিকে তাকালো, একবার ফিক করে হাসলো, তারপরে উঠে আবার নিয়ে এলো গীটার।

এবার তার কণ্ঠস্বর নয়, শুধুই গীটারের ঝংকার! শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কে যেন কিসের আকুতিতে ভেঙে প'ড়ে কোনো সাড়া বা সান্ত্বনা না পেয়ে গুমরে গুমরে উঠেছে! চাঁদ তখন মাথার ওপরে। বোধ হয় এক যুগ ধরে একভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে ভেনাস,—শুক্রগ্রহ। হঠাৎ সে গীটারটা রেখে উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনলো, তারপরে ছুটে গেল দোলনার কাছে। তার শিশুটি বোধহয় জেগে উঠেছিল। দোলনার মধ্যে হাত ডুবিয়ে সে যেন একটা ডল পুতুলকে দুহাতে তুলে নিলো বুকের কাছে। তেমনি করে বসলো আমার পাশে, এবার পা মুড়ে। তারপরে আমার দিকে তাকালো, ফুটফুটে সুন্দর শিশুটিকে দেখতে দেখতে চোখ আর ফেরাতে পারছিলাম না। সে সেটা লক্ষ্য করে একটু হাসলো, তারপরে একটু গর্বের সঙ্গেই বললো,—মি বেবী।

অর্থাৎ 'আমার খোকা।'...আর আশ্চর্য, আমার সামনেই সে বিন্দুমাত্র

সংকোচ না করে কাঁচুলি খুলে ফেললো। তার স্তনযুগলের একটিতে মুখ ডুবিয়ে শিশুটি শান্ত হলো। লুইজি মাথাটি কাত করে শিশুর মুখের দিকে আগ্রহ ভরে তাকিয়ে রইলো। অসীম স্নেহে মাঝে মাঝে তার খোকার মাথার চুল ঠিকমতো সাজিয়ে দিতে লাগলো। পরম মমতায় ভরা একখানি কোমল মাতৃ-মুখ।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ভঙ্গিতে বোঝাতে চাইলাম,—আমি আসি।

তার সেই অভ্যস্ত মৃদু হাসিটুকু মুখে ফুটে রয়েছে। কী মনে করে একখানা হাত সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। সেই নরম, আতপ্ত হাতখানিতে একটু চাপ দিয়ে আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার প্রিয় কুকুরটি রাস্তার মোড় পর্যন্ত আমাকে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলো। লুইজির দৃষ্টি আমার প্রস্থান-পথের দিকে যে বহুক্ষণ আবদ্ধ ছিল, এ যেন আমি বারবার মুখ ফিরিয়ে না তাকালেও বুঝতে পারছিলাম।

নারিকেল-বীথির ছায়াঘেরা সেই পথ দিয়েই জাহাজে ফিরেছিলাম। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন জাহাজ আবার অকূলে ভেসে পড়েছে।

একটু পরেই দোসী আর মাসুদ এলো গল্প করতে। তাদের খুশি-খুশি মুখ দেখেই বুঝলাম, রাত্রিটা তাদের খুব ভালোই কেটেছে শহরে। শহরে মেয়েরা মশাল জ্বালিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল। হোটেলে নৃত্যসঙ্গিনীও পেয়েছিল তারা। তারপরে একটু রাত হলে সমুদ্রতীরে বসে নাকি দেখেছিল তাহিতি-সুন্দরীদের ভুবন বিখ্যাত নৃত্যলীলা।

চমকে বললাম,—তাহিতি-সুন্দরী মানে? তাহিতি এখানে কোথায়?

দোসী হাসলো, বললে,—কোন দ্বীপে গিয়েছিলে? কোন দ্বীপ ছেড়ে এলাম আমরা? ঐটেই তাহিতি দ্বীপ।

মাসুদ বললে,—তাহিতিতে 'পাপাইতে' নামের প্রধান বন্দর বা শহরেই জাহাজ গিয়ে ভেড়ে, কিন্তু আমাদের ভাগ্য একটু অন্যরকম, 'বার্থ' খালি ছিল না বলে 'পাপাইতে' ছেড়ে 'ফা'তে গিয়ে আমাদের উঠতে হয়েছিল। অবশ্য 'ফা' থেকে 'পাপাইতে' আর কতদূর পথ? মাত্র পাঁচ মাইল। তোমাকে অত করে বললাম, তুমি কিছুতেই গেলে না। অত প্রকৃতি-প্রেমিক হলে কি আর মানুষ দেখা যায়? কী যে তুমি 'মিস্' করলে, তা তুমি নিজেই জানো না!

দোসী বললে,—দারুণ শহর ঐ পাপাইতে! জাহাজগুলো খাঁড়ি দিয়ে একেবারে শহরের হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে যায়। জেটির পাশেই শহরের জাঁকজমক, হোটেল, ইত্যাদি! সারা রাত ধরে যেন উৎসব চলে। 'প্যারী'ও এর কাছে হার মেনে যায়।

বললাম,—মাথায় আর গলায় চাঁপাফুলের মালা-জড়ানো 'ভাহিন'-সুন্দরীদের জগদ্বিখ্যাত নাচ কোথায় দেখলে?

—বালুবেলায়,—মাসুদ বললে,—তারা গাঁ থেকে আসে। সত্যিই তারা সুন্দরী। একটি মেয়ে, যাকে আমি বেছে নিয়েছিলাম, সে সুন্দর গীটার বাজাচ্ছিল।

আমি চুপ করে রইলাম। মোটর-ছুটিয়ে আসা সেই ছয়জন সুন্দরীর কথা মনে পড়তে লাগলো, যারা লুইজিকে সঙ্গে নেবার জন্য হাত ধরে টানাটানি করছিল। হঠাৎ অতিথি না গিয়ে পড়লে সে-ও ঐরকম পোষাক পরে, মাথায়-বুকে চাঁপার মালা দুলিয়ে ওদের সঙ্গে আসতো। আমি যদি মাসুদদের সঙ্গে 'পাপাইতে',—অর্থাৎ যে শহরে তাহিতির জনসংখ্যার অর্ধেক বাস করে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতাম, তাহলে হয়ত ঐ লুইজিকেই পেতাম অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী রূপে। কিন্তু 'লুইজিকে' সত্যি সত্যিই দেখতে পেতাম কী? সেই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রিতে নিস্তরঙ্গ ঝিলের ধারে, একক কুটিরে, ফুটফুটে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে-থাকা যে অপরূপ মূর্তিটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, ঠিক তাকেই দেখতে পেতাম কী?

কেবিনের গোলাকার ফোকর দিয়ে বাইরে তাকালাম: সমুদ্রের বুকে নারিকেল-বীথি নিয়ে তাহিতি দ্বীপ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে একটি বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে।

দোসী আর মাসুদ তখন হো-হো করে হাসছিল, বলছিল, পুওরম্যান, তাহিতি গিয়েও তুমি তাহিতি দেখতে পেলে না। দারুণ 'মিস্' করেছো তুমি।

আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। তাহিতি সেদিনও দেখিনি, পরেও দেখিনি, কিন্তু তাহিতি আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

॥ ৩ ॥

লক্ষ্য করছিলাম, তাহিতি ছাড়ার পর জাহাজ জুড়ে খুশির ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। দোসী বা মাসুদ চলাফেরা করছে, কাজকর্ম করছে, আর মুখে শিস দিয়ে সুর তুলছে। অন্যদের কথা ছেড়ে দেই, এদের দুজনের সঙ্গে আমার সব সময় ওঠা-বসা বলে ওদের দিকেই আমার চোখ পড়েছিল বেশি। প্রথমে মনে করেছিলাম এ বুঝি তাহিতির সুখস্মৃতির জের, কিন্তু পরে দেখলাম, তা ঠিক নয়। জাহাজ যে পূব থেকে পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে, অর্থাৎ নিজেদের দেশ বা বাড়ির দিকে, এইতেই তাদের মনে জেগেছে উল্লাসের ঢেউ! অথচ, জাহাজ এখন কোথায়, আর দেশই বা কোথায়!

সারাদিন জাহাজ চলছে পশ্চিমে মুখ করে একটি সরলরেখা টেনে, সমুদ্র জুড়ে ছোট ছোট ভেঙে পড়া ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় ফেনায়িত বুদবুদগুলির ওপর রোদ পড়ে যেন হীরের টুকরোর মতো ঝলমল করছে। ক্যাপ্টেন আমাকে অনেকগুলো কাগজপত্র টাইপ করতে দিয়েছিলেন, স্টুয়ার্ডের দেওয়া দৈনন্দিন কাজ ছাড়াও এগুলো করছি, কিন্তু কাজে মন বসছে না, ইচ্ছা করছে 'রেলিং'-এর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের রূপ দেখি। আবহাওয়াও এখন মনোরম, না-গরম, না-ঠাণ্ডা, জাহাজেও আসবার সময়কার মতো মারাত্মক দোলানি

নেই,—'রেলিং'-এ এসে দেখি আমার মতো অবস্থা প্রায় সবারই। এমন কি ক্যাপ্টেনও কেবিন ছেড়ে বাইরে এসে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়েছেন।

আমরা যত পশ্চিমের দিকে যাচ্ছি, সূর্যও তত পশ্চিমে হেলে পড়ছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের সেই ভেঙে-পড়া অবয়ব আর চোখে পড়ছে না। আ-ভাঙা পুরো ঢেউগুলো এখন ঝাঁক বেঁধে দিগন্ত জুড়ে যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে! আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। সে বললে, সমুদ্রে ঢেউ আর আকাশে রঙ আছে বলে দেখতে ভালো লাগছে, নইলে এর কোনো আকর্ষণ থাকতো কী?

—তা ঠিক।

এখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা। তারপরেই খাওয়ার ঘণ্টা। খাওয়ার টেবিল আমাদের নির্দিষ্ট ছিল। তিন বন্ধুতে টেবিল ঘিরে বসলাম। মাসুদ দোসীকে জিজ্ঞাসা করলো—কী হে, নেক্সট পোর্ট কী? কোথায় ভিড়ছে জাহাজ?

দোসী বললে,—এখনো অর্ডার হয় নি। ক্যাপ্টেন বলেছেন আমরা সোজা পশ্চিমমুখে চলতে থাকবো। যতক্ষণ না কোথাও থেকে কোনো খবর আসে, ততক্ষণ থামবো না।

মাসুদ বললে,—কাল সকাল থেকে নজর রাখতে হবে। যদি সামোয়া দ্বীপে যাওয়া হয় ত, দারুণ হবে!

—সামোয়া দ্বীপে?—জিজ্ঞাসা করলাম,—সে আবার কোথায়?

মাসুদ বললে,—চার্টরুমে গিয়ে ম্যাপ দেখলেই বুঝতে পারবে। বেশি দূরে নয়। কালই হয়ত কাছ দিয়ে চলে যাবো, আর নয়ত সোজা সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের টুটুইলা দ্বীপের বিখ্যাত প্যাগো প্যাগো বন্দরে গিয়ে হাজির হবো। সমুদ্রের বুক থেকে পাহাড় উঠেছে, তারই কোলে ঐ বন্দর, পাহাড়গুলো ঝক-ঝক করা উজ্জ্বল সবুজ বনানীতে ঢেকে আছে!

—তুমি গিয়েছিলে?

মাসুদ উত্তর দিলো,—কই আর গেলাম! এই ত প্রথম আমার এদিকে আসা। বইতে পড়েছি রবার্ট লুই স্টিভেনসন আর সামোয়ার কাহিনী।

আর কোনো কথা হলো না। খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ করে মাসুদ চলে গেল চার্টরুমে তার কাজে। আর দোসীও গেল রেডিও-রুমে, কখন কী অর্ডার আসে কে জানে! জাহাজের খোল বা ফলকাগুলিতে আরও জিনিস নেবার জায়গা আছে, সেগুলি ভর্তি করতে হবে তো! ক্যাপ্টেনের নজর সেইদিকে!

কাজ অবশ্য আমারও ছিল। সে-সব সেরে যখন বাইরে এলাম, রাত তখন দশটার কম নয়! উঁকি মেরে দেখলাম, রেলিং-এ কেউ নেই, শুধু পাহারাদারি করবার জন্য কোয়ার্টার মাস্টারকে দেখা যাচ্ছে। লোকটা খুব বই পড়ে। ঢাকনা-দেওয়া ছোট্ট একটা বাতি জ্বালিয়ে তারই আলোয় ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে বই পড়ছে। বই যারা বেশি পড়ে, তাদের সঙ্গে সহজেই আমার খাতির

জমে যায়। কিন্তু এর কাছাকাছি যেতে আমার মন চায়নি, এ পড়ে শুধু আগাথা ক্রিস্টি অথবা অন্য সব খুনোখুনির বই।

বাইরে তাকালাম, সমুদ্র শান্ত, কিন্তু নির্জীব নয়। ছোটবেলায় আমার এক ছোট দিদিমাকে খুব অদ্ভুত কথা বলতে শুনতাম। একবার কোথায় যেন তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তারই বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন,—ওঃ! কী জ্যোৎস্না! যেন রুপোগুলো ফিনকি দিয়ে গ'লে গ'লে পড়ছে! সে রাত্রে ঐ ছোট দিদিমার কথামতো ফিনকি দিয়ে গলা রুপোর জ্যোৎস্না কাকে বলে, তা যেন আমি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম।

আজকের কথা বলছি না, যুদ্ধের কাল সবে শেষ হয়েছে, সবে স্বাধীন হয়েছে ভারত। আমাদের নিজস্ব বাণিজ্য-জাহাজ তখনো তৈরি হয়নি বলে ভাড়া করা জাহাজ নিয়ে ব্যবসা-পত্তর চালাতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এটিও ছিল তেমনি এক ভাড়া করা, যাকে বলে 'চাটার্ড' জাহাজ। এর মিড শিপ বা ঠিক মাঝখানে ছিল লোকজনদের থাকবার জন্য তেতলা বাড়ি। 'তেতলা'য় 'ব্রীজ', অর্থাৎ বারান্দা বিশেষ, যেখানে দাঁড়িয়ে বা ঘুরে ফিরে ক্যাপ্টেন নির্দেশাদি দিয়ে থাকেন। এছাড়া রয়েছে ক্যাপ্টেনের ঘর, রেডিও রুম, ইত্যাদি। আর তেতলার ওপরে ক্যাপ্টেনের ঘরের মাথায় ছিল রেলিং-ঘেরা ছোট্ট ছাদ, জাহাজী ভাষায় বলা হতো 'ডাঙ্কি ডেক।'

জাহাজের ডেক, বারান্দা সবই নির্জন। ভালো করে সমুদ্র দেখবো বলে আমি রেলিং-দেওয়া লোহার সিঁড়ি দিয়ে ঐ ডাঙ্কি ডেকে উঠলাম সন্তর্পণে। চমকে দেখি, স্বয়ং ক্যাপ্টেন ওখানে দাঁড়িয়ে। বয়সে প্রৌঢ় হলেও বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, অভিজ্ঞ নাবিক, ইংরেজ, কিন্তু 'ওয়েলস'-এর লোক। আমাকে দেখে বলে উঠলেন,—হ্যালো!

আমি সম্ভাষণের পালা সেরে বললাম,—আমি ভেবেছিলাম স্যর বোধহয় শুয়ে পড়েছেন।

অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—হ্যাঁ, শুয়ে শুয়ে একটু আধটু বই পড়ি, পড়তে পড়তে ঘুমোই। কিন্তু আজ আর তা হলো না। এসব জায়গা দিয়ে যাচ্ছি আর পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠছে। যুদ্ধের সময় নৌ-বিভাগে যোগ দিয়েছিলাম যে! এদিকে যে সব তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমারও যে না হয়েছিল এমন নয়।

বলতে বলতে জাহাজের ডান দিকে অর্থাৎ স্টারবোর্ড সাইড-এর রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। আমাকে ডাকলেন পাশে। স্বভাবে ক্যাপ্টেন সাহেবটি খুবই স্বল্পভাষী মানুষ, কিন্তু সেদিনে ফিনকি দিয়ে উপচে-পড়া জ্যোৎস্না বোধহয় তাঁরও মনের আগল খুলে দিয়েছিল। আমি জাহাজের স্থায়ী কর্মচারী নই; কেরাণীটি অসুস্থ হয়ে ওয়াল্‌টেয়ারের হাসপাতালে শয্যা নিলে এই ক্যাপ্টেন আর স্থানীয় এজেন্ট মহাশয়ের চেষ্টায় আমি জাহাজের ঠিকাদার কোম্পানীর

ম্যানেজার-রূপে অন্য লোক না দিয়ে নিজেই বদলি হিসাবে নিজেকে কেরানী-পদে সখ করে নিয়োজিত করেছিলাম। আর তা-ও এই একটি মাত্র যাতায়াত বা জার্নি শেষ করবার জন্য। জাহাজও বিশাখাপত্তন পেঁছিবে, আমিও জাহাজ থেকে নেমে আবার আমার অফিসে গিয়ে বসবো। এইসব কারণে জাহাজে আমার খাতির ছিল একটু অন্যরকম, ক্যাপ্টেনও ব্যবহার করতো বন্ধুর মতো। বললেন,—আমার নাম কী? কী নামে ডাকো তোমরা? ক্যাপ্টেন গিলবার্ট তো? এই আমারই নামে নাম এক দ্বীপপুঞ্জ আছে কিছু দূরের এক অঞ্চলে। সামোয়ার আরও উত্তর-পশ্চিমে।

—গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ?

ক্যাপ্টেন খুশি হয়ে বললেন,—ঠিক বলেছো। এই গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে 'তারাওয়া' বলে এক 'অ্যাটল' বা গোলাকার হ্রদ-সমৃদ্ধ প্রবালদ্বীপ আছে, সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল জাপানের সঙ্গে। কিন্তু এই অদ্ভুত জ্যোৎস্না রাত্রে যুদ্ধের বিভীষিকার কথা থাক, ঐ দ্বীপপুঞ্জে আরও একটি অ্যাটল আছে, তার নাম 'আবেমামা।' এর সৌন্দর্যের জন্য একে 'চাঁদের অ্যাটল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'অ্যাটল' মানেই তার মধ্যে থাকবে লেগুন বা উপহ্রদ। ঐ 'আবেমামা'র উপহ্রদের কোনো তুলনাই হয় না।

—আমরা কি ওখানে যাবো?

ক্যাপ্টেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—না বোধহয়।

—সামোয়া?

ক্যাপ্টেনের উত্তর,—বলা যায় না, যেতেও পারি। সামোয়ার খবর কোথা থেকে পেলে? ষ্টিভেনশনের লেখায়? এই ষ্টিভেনশন ছিলেন যক্ষ্মারোগী। সেই মারাত্মক অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি সেকালে এই সামোয়া দ্বীপ-টিপে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভাবতে অবাক লাগে না? তবে শোনো। ঐ 'আবেমামা'-তেও তিনি এসেছিলেন, সে হচ্ছে ১৮৮৯ সালের কথা। ওখানকার রাজার নাম ছিল 'টেম বিনোকা।' তাঁরই অতিথি হয়ে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছিলেন ওখানে।

ক্যাপ্টেন থামলেন। আমি বলে উঠলাম,—খুব ভালো লাগছে শুনতে। আরও কিছু বলুন?

ক্যাপ্টেন বললেন,—আর কিছু মনে নেই। কতো ঘুরছি, কতো পড়ছি, সব কি মনে রাখা যায়? এ-ও মনে পড়তো না, এখান দিয়ে যাচ্ছি বলে মনে পড়লো। বললাম,—'বিনোকা'র কথায় কাছাকাছি শব্দের একটা নাম মনে এলো, বিকিনি। এই বিকিনি দ্বীপ কোথায়?

ক্যাপ্টেন আমার দিকে তাকালেন, বললেন,—বিকিনি দ্বীপ অর্থাৎ যেখানে প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটানোর পরীক্ষা করা হয়েছিল? সে এখান থেকে অনেক-অনেক উত্তরে জাপানের দিকে যেতে—ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জেরও আগে—মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে। 'ইকোয়েডোর' (বিষুবরেখা)-এর দশ ডিগ্রি উত্তর

অক্ষরেখার ওপর যেখানে ১৬০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা ভেদ করেছে, ম্যাপে তার কাছাকাছি খুঁজলে বিকিনিকে পেয়ে যাবে। কিন্তু আর নয় হে, কোথা থেকে হালকা মেঘ এসে চাঁদ ঢেকে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বাড়ছে, সমুদ্র অশান্ত হচ্ছে, জাহাজও দুলছে! চলো, নিচে নামি।

পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ দোসী আর মাসুদ জাহাজের স্টারবোর্ড রেলিং-এ এসে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে মনোযোগ দিয়ে দিগন্তরেখা দেখতে লাগলো।

—কী দেখছো?

ওরা ঠোঁট উল্টে বললে,—কী আর দেখবো? সামোয়া।

বললাম—আমরা কি যাচ্ছি সামোয়ায়?

দোসী বললে,—না। যাচ্ছি আরও পশ্চিমে, বাড়ির দিকে।

মাসুদ চোখ থেকে দূরবীণ নামালো, হতাশার ভঙ্গি করে বললে,—না হে, সামোয়ার একটা বিন্দুও দেখা যাচ্ছে না।

এই সময় জাহাজের ঘণ্টি বেজে উঠতেই সবাই চকিত হয়ে তাকালো। আমরা তিনজনেই সিঁড়ি বেয়ে ব্রীজে গেলাম, সেখানে ক্যাপ্টেন তাঁর জমকালো পোষাকটা পরে দূরবীণ হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, পাশে চীফ অফিসার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, আর চীফ স্টুয়ার্ড। দূরবীণটা চীফ অফিসারের হাতে দিয়ে মুখের কাছে একটা চোঙা তুলে ধরলেন, সবাই যাতে শুনতে পায় সেই রকম ঘোষণা করার সুরে বলতে লাগলেন—জাহাজ এখুনি বিখ্যাত কারমাডাক ও টোঙ্গা খাতের ওপর দিয়ে যাবে। আপনারা জানেন, যদিও এখান থেকে অনেক উত্তরে জাপান ও ফিলিপাইনের দিকে যেতে পথে পড়ে পৃথিবীর সব থেকে গভীর জায়গা 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ' ৫৯৪০ ফ্যাদম বা পৌণে সাত মাইল গভীর, তবুও এখানকার এই খাতও কম যায় না, গভীরতায় ৫১৫৫ ফ্যাদম। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়, এই টোঙ্গা খাতের ওপর দিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক 'ডেট্-লাইন'। এই লাইন পার হলেই আমাদের তারিখ একদিন পিছিয়ে যাবে। আজ ১৫ তারিখ, যেই ঐ লাইন পার হবো অমনি এটা হয়ে যাবে ১৪ তারিখ। পূবে গেলে এই তারিখ বাড়তো, পশ্চিমে যাচ্ছি বলে কমলো। এই উপলক্ষে ছোট-খাটো উৎসব করা নিয়ম। স্টুয়ার্ড সাহেবকে বলা আছে, আপনাদের খাদ্য তালিকায় আজ একটু নতুনত্ব থাকবে, আর বলা বাহুল্য, 'পানীয়' থাকবে ফ্রি, যে যে-রকম চান হট্ অথবা কোল্ড। আমাদের জাহাজে কুক্‌কে নিয়ে চারজন ভারতীয় আছেন, তাঁরা চাইলে 'নিম্বুপানি' পর্যন্ত পাবেন, কুক্ তা অনায়াসেই তৈরি করে দিতে পারবে।

ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শেষ হলো এবং কিছুক্ষণ পরে যখন আমরা ইণ্টার-ন্যাশনাল ডেটলাইন পার হলাম, তখন আবার ঘণ্টাধ্বনি হলো, জাহাজের ভোঁ বাজলো, শুরু হলো উৎসব। ডেকে নাবিকদের নাচ শুরু হলো, শুরু হলো গান:

Fifteen men on a dead man's chest
Yo-ho ho and a bottle of rum.

আমি আর মাসুদ দোতলার ডেকে লাইফ-বোটের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের হুল্লোড় দেখছিলাম। মাসুদ বললে, স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'-এর গান গাইছে হে! এসব ওদের মুখস্থ। আমার মনে তখন একটা প্রশ্ন জেগেছিল, তাই মাসুদকে বললাম,—আচ্ছা, আসবার সময়েও তো আমরা এখানে না হোক অন্য জায়গা দিয়ে এই 'ডেট-লাইন' পার হয়েছিলাম, তখন এসব উৎসব-টুৎসব হয় নি কেন?

মাসুদ উত্তর দিলো,—তখন জাহাজ টাইফুনের ধাক্কা সামলাচ্ছে, মরণ-বাঁচন সমস্যা, সারা জাহাজের লোক আমরা মারাত্মক দোলানি খেয়ে অসুস্থ, মনে নেই? তখন উৎসব করবে কে?

—তা বটে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলে উঠলাম, আচ্ছা মাসুদ, স্টিভেনসনের সামোয়া ত আমাদের কলা দেখালো, এখন কোথায় যাচ্ছি ঠিক বলো ত?

—দেশমুখো। আবার কোথায়?

—সেও ত অনেকদূর! এখন গিয়ে থামছি কোথায়?

মাসুদ বললে,—চলো দেখি রেডিও-রুমে। দোসী গিয়ে ঢুকেছে। কোনো খবর থাকলেও থাকতে পারে। আমার মনে তখনও প্রশ্ন। বললাম,—আচ্ছা, এই খবরাখবর কী ভাবে আসে? দেয় কারা?

মাসুদ বললে,—নতুন বলেই তোমার ধোঁকা লাগছে। জাহাজ দেশ ছাড়বার আগেই মোটামুটি একটা ছক ঠিক করা থাকে। সব পোর্টেই ক্যাপ্টেন রেডিও-গ্রাম পাঠায়, যারা মাল রপ্তানী করতে চায়, তারাই 'এসো' বলে আহ্বান জানায়। আর সেই বুঝেই ক্যাপ্টেন জাহাজ ভেড়ায়। একেই সংক্ষেপে বলা হয় 'অর্ডার'। বুঝলে? এসো দেখি দোসী কি করছে।

আর দ্বিরুক্তি না করে আমরা ওপর তলায় গেলাম। দোসীর কানে হেড-ফোন লাগানো। মুখ নিচু করে কাগজে খসখস করে কী যেন লিখছিল। আমাদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো, বললে,—পরবর্তী বন্দর,—ভিতিলেভু দ্বীপ।

—সে আবার কোথায়?

গম্ভীর মুখে দোসী উত্তর দিলো—মানুষখেকো মানুষ যেখানে গিজগিজ করছে, সেই ফিজি দ্বীপপুঞ্জ। দুটি বড় দ্বীপ নিয়ে মূল ফিজি, 'ভ্যানুয়ালেভু' আর 'ভিতিলেভু'। আমরা যাবো 'ভিতি'তে।

—বন্দরের নাম কী?

—সুভা!

সে রাতটা কেটে গেল। পরদিন বেলা একটা নাগাদ আমরা 'ফিজি'তে

এলাম। আশেপাশের অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে। মাসুদের সঙ্গে চার্টরুমেই আমার সময় কাটতো বেশি। নেভিগেশন চার্টে দেখা গেল, ফিজির ঐ 'ভিতিলেভু'র একটি নদীর নাম 'রেওয়া'।

নামটা শুনে আমি একটু চমকে উঠেছিলাম। দেশ থেকে বাইরে বেরুলে এটা হয়, দেশের কোন পরিচিত নাম হঠাৎ কানে এলে এই রকমই চমক লাগে। মনে পড়লো মধ্যপ্রদেশের একটা জায়গার নাম 'রেওয়া'। কথায় বলে 'রেওয়ার বাঘ'। রেওয়ার আশেপাশের অরণ্যের 'বাঘ'-এর খুব নামডাক। মীর্জাপুর কিংবা এলাহাবাদ থেকে মোটরে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতিবিজড়িত 'মইহার' যেতে গেলে পথে পড়ে এই 'রেওয়া'। কিন্তু সেই নামটা এখানে এলো কী করে?

মাসুদ বললে,—এখানে কতো ভারতীয় বাস করে জানো? দাঁড়াও সরকারী নোটবুকে কী লেখা আছে দেখি।

নোট বার করে মাসুদ দেখালো, এখানকার জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হচ্ছে ভারতীয়, সুতরাং নদীর নাম যদি ভারতীয় ভাষায় 'রেওয়া' হয়ে থাকে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

সেই রেওয়া নদীর মোহনার পাশ কাটিয়ে 'লাংকালা বে' ছাড়িয়ে আমরা 'সুভা'র খাঁড়ির মুখে 'বেরিয়ার রীফ' বা প্রবাল বাঁধ ঘেঁষে নোঙর ফেললাম। লাইট হাউস থেকে আলোর সংকেতে আমাদের জানানো হলো, ওখানে নোঙর ফেলো, বার্থ এখন খালি নেই। হলে যথারীতি পাইলট গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসবে।

এইসব খুঁটিনাটি বর্ণনায় না গিয়ে একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, পাইলটের সাহায্যে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে জাহাজ যখন জেটিতে বাঁধা পড়লো, তখন প্রায় সন্ধ্যা। এই সময় আমার প্রচুর কাজ থাকে, আসে এজেন্টের লোক, পুলিশের লোক, কাস্টমসের লোক, ঠিকাদারের লোক। ক্যাপ্টেনের হাঁক ডাকের জন্য আমাকে তটস্থ থাকতে হয়। কাজকর্মের শেষে যখন আমি নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে।

'সুভা' শুধু বন্দর নয়, সমগ্র ফিজি দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। দোসী বলেছিল, এখানে 'ক্যানিবল' অর্থাৎ মানুষখেকো মানুষ গিজগিজ করছে। আর মাসুদ কেতাব দেখে বলেছিল, এখানকার জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে ভারতীয়। এত ভারতীয় এই সুদূর দ্বীপে এলোই বা কী করে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই, যতদূর স্মরণ করতে পারি সে হচ্ছে ১৯১৫ সালের ঘটনা। এই ফিজি দ্বীপে শ্রমিকদের নিপীড়নের খবরে তখন দেশে একটা আলোড়ন উঠেছিল। কারণ এই শ্রমিকরা সবাই ভারতীয়। গরীব মানুষ এরা, আড়কাঠির মাধ্যমে দ্বীপে গেছে রুজি-রোজগারের আশায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের দুই ইংরেজ সহযোগী সি-এফ-এনড্রুজ আর পিয়ার্সনকে ফিজি দ্বীপে যেতে প্রেরণা

দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখবেন, এই ভারতীয় খেটে-খাওয়া মানুষগুলো যেন আর নিগৃহীত ও অত্যাচারিত না হয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরুবার মতো সাজসজ্জা করে যখন প্রস্তুত হলাম, তখন আবিষ্কার করলাম, ক্যাপ্টেন, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও জন-কয়েক কর্তব্যরত কর্মী ছাড়া জাহাজে আর কেউ নেই। আমার প্রিয়বন্ধু দোসী আর মাসুদও আমাকে ফেলে চলে গেছে। এমন কি আমাদের গোয়ানিজ কুকটি পর্যন্ত নগর-সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়েছে।

কী আর করবো? একা একা জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাটিতে যখন পা দিলাম, তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি সারা বন্দর জুড়ে একটিও লোক নেই। জাহাজের ডোরিকে যেমন ঘর্ঘর শব্দ নেই, তেমনি জেটিতে মাল ওঠানোর হাঁকডাকও নেই। জাহাজ ভিড়লেই হৈ-হৈ করে মাল ওঠানো বা নামানোর কাজ শুরু হয়, কিন্তু আজ সব একেবারে নীরব! জেটির গেটের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলাম, কোনো শ্রমিক-ধর্মঘট হয়নি তো? আশেপাশে একটিও লোক নেই। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবো? গেটও বন্ধ, মধ্যেকার একটি ফোকর শুধু খোলা দেখা যায়, যা দিয়ে লোক গলে যেতে পারে। তাকিয়ে দেখলাম, পাশের অফিসের বারান্দায় ইউনিফর্মধারী একজন কাস্টমস্ অফিসার বসে কাগজ পড়ছেন। মাথার ক্যাপটা খোলা, তাতে তার মাথার কালো আর কোঁকড়া শক্ত চুলের গোছা দেখা যায়, কপালটা একেবারে ঠিক চৌকো, দাড়ি গোঁফ কামানো, রং খানিকটা কালো হলেও চেহারায় ভারতীয় বলে মনে হচ্ছিল না। আমার ভাবভঙ্গি দেখে নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন,—ইয়েস?

বুঝলাম ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন। তাই কথাবার্তা বলার অসুবিধা হলো না। এগিয়ে গিয়ে সম্ভাষণের পালা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম,—জেটির লোক নেই কেন? স্ট্রাইক?

তিনি একটু হেসে বললেন,—না, স্ট্রাইক নয়। আজ শহরে একটা ভারতীয় ফিল্ম দেখানো হচ্ছে, এখানকার মজদুর সবাই ভারতীয় তো? তাই ছুটেছে ছবি দেখতে।

—কাজ ছেড়ে?

—তা, কী করবে বলুন? ক্বচিৎ কখনো আসে ভারতীয় ছবি। ওরা দৌড়োবে না?

—কতদূরে বলুন তো?

বললেন, জাহাজ থেকে নেমেছেন, জেটিতে একটাই জাহাজ। সেজন্য ধরে নিতে পারি নিশ্চয়ই আপনি ভারতীয়?

—হ্যাঁ।

হেসে বললেন,—তাহলে ত যাবেনই! না-না দূরে নয়, হেঁটে যেতে পারবেন। মিনিট দশ বারোর বেশি নয়। পিকচার হাউস।

এগিয়ে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালাম, বললাম,—মাপ করবেন, আপনি নিজে যান নি যে?

উত্তর দিলেন,—ডিউটি। তাছাড়া আমি এখানকার লোক—মেলানেশিয়ান।

বললাম,—ঠিক আছে। অশেষ ধন্যবাদ।

বলে, গেটের ফোকর গ'লে বাইরে এলাম। গেটের সামনে আলোর প্রাচুর্য আছে, কিন্তু গাড়িটাড়ির চিহ্ন নেই, তবে দোকানপত্তর খোলা যদিও ভিড় একেবারেই নেই। আমি একজন কনেস্টবলকে ধ'রে পথের হদিশ জেনে নিলাম। তার নির্দেশমতো ডান দিকে চলছি। রাস্তাটা সোজা গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে আর একটি বড়ো রাস্তায় পড়েছে। মনে হলো এটাই বোধ হয় সুভার প্রধান পথ। কিছু লোকজন চোখে পড়লো। একটা হুডখোলা সেকেলে মোটর গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সাইকেলেও কিছু লোক চলছে। পরনে সবারই প্যান্ট আর সার্ট! একটি সাজানো-গোছানো দোকানের নাম—'ব্রাউন অ্যান্ড জোন্স্কে'। সে-দোকান ছাড়িয়ে কিছু দূর যেতেই সিনেমা হলের সামনে পড়লাম। অদম্য আগ্রহ নিয়ে লবিতে ঢুকে স্টিল ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। কিন্তু না, এখন দেখানো হচ্ছে বলে যে ছবিগুলি সাজানো আছে, তা দেখে বুঝলাম, ভারতীয় নয়, একটি ইংরেজী সিরিয়াল ছবি। তাহলে সেই ছবিঘরটি কোথায়, যেখানে ভারতীয়রা নিজেদের ছবি দেখবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে? একজনের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে আরও হাঁটতে লাগলাম। একটু পরেই পেলাম একটি মোড়। মোড় পেরিয়ে অন্য একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় ঢুকতেই মনে হলো অভীষ্ট স্থানে এসে পড়েছি। একটু এগিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই দোসী-মাসুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছবিঘরের লাগোয়া ঠিক আমাদের দেশের মতোই একটি পানের দোকান। সিগারেট থেকে লেমনেডের বোতল সবই সাজানো। ওরা আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকছিল। কাছে গিয়ে অবাক হয়ে বললাম,—এখানে পানের দোকান?

দোকানদারের মাথায় কালো গোল টুপি। সে অল্প একটু হেসে বললে,—ভাইসাব, এখানে আমাদের দেশোওয়ালীরাই বেশি, খাস ফিজির লোক মাত্র শতকরা ৪২ জন, শতকরা আটজন মাত্র ইয়োরোপীয়ান ও অন্যান্য। তাহলেই বুঝুন, আপনাদের সেবার জন্য পান থাকবে না? খেয়ে দেখুন, আসল বেনারসী চীজ। জর্দা দেবো?

বললাম,—না ভাই, জর্দা চলবে না।

তারপর ওদের দিকে ফিরে বললাম,—বেশ যাহোক, আমাকে ফেলে চলে এসেছো যে?

দোসী বললে,—আরে বাবা, যা ব্যস্ত ছিলে তুমি!

মাসুদ একটি পানের খিলি মুখে পুরে বললে,—লোকাল সিগার খাবে নাকি? আমাদের ওদিককার চুট্টার মতো, দারুণ কড়া।

বললাম,—তা এখানে দাঁড়িয়ে করছো কী ? সিনেমা দেখবে না ?

দোসী বললে,—কী করে আর দেখবো ? একটিও টিকিট নেই। এমনকি একস্ট্রাও না। একস্ট্রা টিকিটে লোক নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

এই সময় দোকানদারের খিলি বানানো হয়ে গিয়েছিল, আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে,—ভাইসাব, আমার টিকিটটাও আপনাদের মতো এক জাহাজী দেশোয়ালীকে দিয়েছি, কোথাও কোনো টিকিট নেই।

—কী ছবি হচ্ছে ?

দোকানদার বললে,—বহুৎ বড়িয়া ছবি।

মাসুদ বললে,—লবিতে চলো। সাজানো ছবিগুলো দেখি। তাহলেই বুঝতে পারবে।

দোকানদারের পয়সা মিটিয়ে লবির মধ্যে ঢুকে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বইয়ের নাম,—স্ট্রীট সিঙ্গার। প্রধান ভূমিকায় কে ? না, আমাদের সায়গল আর কাননবালা।

দোসী, মাসুদ দুজনেই অবাঙালী, কিন্তু আমি যে বাংলার। হিন্দী হলেও কলকাতার ছবি। এ ছবি দেখবো না !

ওরা বললে,—খুব চেষ্টা করেছি, কোনো উপায় নেই। কুক্ অনেক আগে এসেছিল, সে ঠিক ঢুকে গেছে।

—তাহলে কালকে যেরকম করেই হোক দেখতে হবে !

ওরা উত্তর দিলো,—কাল অন্য ছবি। এ ছবি মাত্র একদিনের জন্য। এখানে ইংরেজি ছবিরই দাপট বেশি।

—ঠিক জানো ?

দোসী বললে,—বিজ্ঞাপনটা ভালো করে দেখো। আজই শেষ রজনী। কাল ইংরেজি ছবি,—'জোরো রাইডস্ এগেন।'

—তাহলে একদিনের জন্য ছবি আনাই বা কেন ?

মাসুদ বললে,—ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা আলাপ করছিলাম। আমাদের বম্বেরই লোক। পার্শী। চেষ্টা করছেন যাতে বেশি বেশি দেশের ছবি দেখানো যায়। কিন্তু আপাতত তাঁর করার কিছু নেই। অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর একখানা ছবি আনানো গেছে, আবার কালই প্লেনে চলে যাবে সিঙ্গাপুর।

—এখানে প্লেন আছে নাকি ?

দোসী বললে,—আছে বই কী। কী নেই ? রেডিও স্টেশন আছে, দৈনিক খবরের কাগজ আছে। এতসব যেখানে আছে, সেখানে এয়ারপোর্ট থাকবে না ? আছে। নাম হচ্ছে নন্দী এয়ারপোর্ট।

বললাম,—অনেক খবর ত যোগাড় করেছো। কিন্তু মানুষ খেকোদের হদিশ করতে পারলে কী ?

দোসী উত্তর দিলে, আশেপাশে আছে নিশ্চয়ই ! ওশান পাইলট কেতাবে কি মিথ্যে লিখবে ?

আচ্ছা সে মীমাংসা পরে করা যাবে। এখন বলো ত, আসল ছবি কি আরম্ভ হয়ে গেছে ?

মাসুদ বললে,—তা হয়ে গেছে বই কী।

বললাম,—কী আফশোষ ? আমি থাকি ভাইজাগে, বাংলা ছবি আমিও বহুদিন দেখি না।

মাসুদ বললে,—ভাইসাহেব, এটা হিন্দী ছবি, বাংলা নয়। তা-ও শুনলাম অনেক পুরানো।

—কিন্তু বাংলায় তৈরি।

বলা বাহুল্য, আমাদের কথাবার্তা চলছিল হিন্দিতে ! কথায়-কথায় কখনো উত্তেজনায় বা আবেগে কণ্ঠস্বর উ'চু হচ্ছিল। আলো আঁধারিতে তেমন লক্ষ্যে পড়েনি, অদূরে লবির একধারে একটি মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, পাতলা চেহারা, রং কালো। কিন্তু অবাক কাণ্ড, পরনে কালো পাড় গোলাপী শাড়ি। তিনি যে কখন ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাইনি। হঠাৎ তাঁর উপস্থিতি টের পেতেই আমি চুপ করে গেলাম, আমাদের দেশের হিন্দুস্থানীদের মতোই শাড়ি পড়ার ধরন। চোখে-মুখে খুবই সলজ্জভাব, তবু কৌতুহলের তাগিদ তিনি পরিহার করতে পারেন নি। মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন,—আপলোগ ভারতসে আরহে হৈ, কেয়া ?

একযোগে আমরা বলে উঠলাম,—জী।

এরপর হিন্দীতেই কথাবার্তা হতে লাগলো। আজ যে একটি ভারতীয় জাহাজ এদেশে এসেছে, সে খবর আর পাঁচজন ভারতীয়দের মতো তিনিও জানেন। আমাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছেন আমরা ভারতীয় এবং বেশভুষা দেখেও তাঁর অনুমান করতে ভুল হয়নি যে আমরা সেই জাহাজেরই লোক। বলা বাহুল্য, তিনিও ভারতীয়। বললেন, আপনারা কি ছবিটা সত্যিই দেখতে চান ?

মাসুদ বললে,—জরুর।

তিনি বললেন,—তাহলে কৃপা করে আমাদের বাড়িতে আসুন, ওখান থেকে দেখতে না পেলেও কথা শুনতে পাবেন, গানা ভী শুনতে পাবেন।

—কোথায় আপনার বাড়ি ?

তিনি বললেন,—ছবিঘরের ঠিক পিছনেই। পাশের সরু গলি দিয়ে ঢুকতে হয়।

আমাদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম, তবু একটু ইতস্তত করছিলাম। বললাম, আপনাদের অসুবিধা হবে না তো ?

তিনি বললেন,—দেখুন ভাইসাব, আপনারা দেশের লোক, আপনাদের কাছ থেকে দেশের খবরা-খবর কতো শুনতে পাবো ! অসুবিধা হলে বরং আপনাদেরই হতে পারে, গরিব এক বহিনের বাড়ি যাচ্ছেন, খাতির-যত্ন কিছুই করতে পারবো না।

এরপরে আর কথা চলে না। আমরা ওঁর সঙ্গে একটা গলি দিয়ে ছবিঘরের পিছনে এলাম। এটাও খুব সরু একটা গলি। গলির ধারে ছবিঘরের উলটো দিকে লম্বা ব্যারাকের মতো বাড়ি। এদিকটা ব্যারাকের পিছন দিক, লম্বা দেওয়ালের মতো সমান্তরাল চলে গেছে, ভিতরে-ভিতরে শিক দেওয়া জানালা বসানো। ঠিক মাঝামাঝি একটা জানালা দেখিয়ে তিনি বললেন,—এই যে আমার ঘর। কিন্তু আমাদের একটু ঘুরে যেতে হবে।

—তা হোক।

বলে আমরা ওঁর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মোড় ফিরে ব্যারাকবাড়ির সামনে এলাম। বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ছোটখাটো মাঠের মতো। সারি সারি ঘরগুলোর লাগোয়া খানিকটা চওড়া বারান্দাও দেখা গেল, মাথায় টালি দেওয়া ঢালু ছাদ। অনেকের ঘরের সামনেই বারান্দায় আলো জ্বলছিল, দু'একজন বৃদ্ধ চৌপায়ায় চুপচাপ বসেছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর ঘরের সামনে এসে তালা খুললেন। খুব ছোট্ট একফালি জায়গা, একপাশে বোধহয় রান্নাঘর, অন্যদিকে কলতলা। তারপরেই ঘর। একপাশে একটা তক্তপোষের ওপর শতরঞ্চি পাতা, অন্যদিকে ছোট একটা টেবিল আর চেয়ার। ভদ্রমহিলা সুইচ টিপে আলো জ্বেলে আমাদের বসতে বলে জানালা দুটো পুরো খুলে দিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গমগম করা কথা ভেসে আসতে লাগলো ছবিঘর থেকে। কথাগুলো বোঝবার উপায় নেই, শুধু চিৎকার করে কেউ কাউকে যখন ডাকছে, তখনই তা আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সায়গল বা কানন দেবীর গানও শুনেছিলাম, কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়নি। তবে সুরের মাদকতা যাবে কোথায়? কথাগুলো বাংলা নয়, তবু কী এক অব্যক্ত আনন্দে চোখের কোণ বারে বারে ভিজে উঠছিল! আজ ভাবতে অবাক লাগে, কী আবেগপ্রবণই না ছিলাম তখন!

আজ গানগুলো মনে নেই, কিন্তু একটা ডাক স্পষ্ট মনে আছে 'ভুলুয়া'। কে যেন কাকে চিৎকার করে ডাকছিল 'ভুলুয়া!'

কিন্তু ছবির কথা থাক, যাঁকে কেন্দ্র করে এই ছবির গান শোনার সুযোগটা হয়েছিল, তাঁর কথা না বললে এ-কাহিনীর অবতারণাই বৃথা যাবে।

এই ব্যারাকে দু-খানি ঘর নিয়ে এক-একটি কোয়ার্টার। আমাদের বহিনজীদের শোবার ঘর পাশেই। তিনি আমাদের বসবার ঘরে বসিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা করে সঙ্গে অতি মুখরোচক চাল-ছোলাভাজা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করলেন। আমরা বসতে বললাম। বসলেন না, পাশের ঘরের দরজা অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে সেই সলজ্জ, মৃদু ভঙ্গিতে দেশের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

মাস্দুদ ও দোসী বঙ্গে অঞ্চলের লোক, আমি কলকাতার। শুনে বললেন,—খুব ছোটবেলায় পিতাজীর সঙ্গে একবার কলকাতা গিয়েছিলাম। হেঁটে হাওড়ার পুল পার হয়েছিলাম। সারি সারি নৌকোর ওপর বসানো কাঠের

পুল, তার ওপর দিয়ে আদ্‌মী ভী যাচ্ছে, হাওয়া গাড়িভী যাচ্ছে। তাজ্জবের কথা!

বললাম,—বহিনজী, আপনি কোনদিককার লোক, মানে—

উনি বললেন,—মধ্যপ্রদেশে সাতনা বলে একটা জায়গা আছে, তার কাছে আমাদের বাড়ি। সাতনা থেকে করিব 'দশ মিল' হবে।

—তবে তো রেওয়ার কাছে?

বললেন,—হ্যাঁ, তা হবে, নাম শুনেছি রেওয়ার।

—মইহার?

—হ্যাঁ, তাও শুনেছি।

—খাজুরাহো।

—হ্যাঁ, ও নাম ভী শুনেছি।

বললাম,—যান নি? ও-তো সাতনা থেকে বেশি দূরে নয়!

বললেন,—ভাইসাব, আমরা গরিব খেতিহর, মুলুক বেড়াবো কী করে? বারো বরষ যখন উমর, তখন সাদী হয়, আর ষোল বরষ বয়সে আমার ঘরওয়ালার সাথ্‌ এইখানে চলে আসি।

—এর মধ্যে আর দেশে যান নি?

ভদ্রমহিলার চোখ ছলছল করে এলো, বললো,—না।

—সে কী!

কোনো কথা বলতে পারলেন না তিনি, মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। আমরা কথাবার্তা বলছিলাম, কিন্তু যেই গান কানে ভেসে আসছিল, অমনি চুপ করে যাচ্ছিলাম। গান শেষ হতেই আবার শুরু করছিলাম আলোচনা।

মাসুদ বললে,—বহিনজী যদি কিছু মনে না করেন, এ-ঘরের মালিক কোথায়? তিনি কি ছবি দেখছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন,—না। তিনি এখানে নেই, গত মাহিনায় দেশে চলে গেছেন।

—সে কী!

বললেন,—হ্যাঁ। সবাই বলছে, দেশে আজাদী এসেছে। বহুৎ জান কোরবান করে, বহুৎ লড়াই-উড়াইয়ের পর আজাদী মিলেছে, কিন্তু ভাইসাব, আপনাদের পুছ করছি, মনে কিছু করবেন না, আমার ঘরওয়ালা মুলুকে কীরকম আজাদী হয়েছে দেখতে গেছে, সেই সঙ্গে বুড্ঢা বাপ-মাকেও দেখে আসবে। লেকিন বাংলা মুলুকের লোক, কি বোম্বাই মুলুকের লোক, কি মধ্যপ্রদেশের লোক, এইসব ওখানকার লোক আজাদী পেলেই কি তামাম ভারতবাসী আজাদী পেয়ে গেল? আমরাও ত ভারতের লোক। আমরা

আজাদী পেলাম কই? আমাদের কথা কেউ ভাবছে না কেন? ওখানকার মতো এখানেও আংরেজ সরকার কায়েম রয়েছে!

এ-কথার উত্তর আমরা দিতে পারিনি। যখনকার কথা বলছি, তখন ফিজি বা সামোয়া স্বায়ত্তশাসন পায়নি, গভর্নরের অধীনে একটি এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল ছিল, বিভিন্ন দ্বীপের প্রধানদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা-পরিষদও গঠিত হয়েছিল। আগে ভারতীয় মজদুরদের অবস্থা আমাদের দেশের সাবেক নীলচাষীদের মতোই ছিল, এনড্রুজ পীয়ারসন এসে কিছু ধাক্কা না দিলে সে অবস্থার পরিবর্তন হতো কিনা সন্দেহ।

যাইহোক ভদ্রমহিলার প্রশ্নের পর কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। কী যেন ভেবে দোসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা, যুদ্ধের সময় আপনারা এখানে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—এই সুভা-তে?

—হ্যাঁ। যাবো কোথায়?

দোসীর আরও জিজ্ঞাসা ছিল। বললে,—লড়াই এখানে হয়েছিল নিশ্চয়।

সে বিষয়ে উনি বললেন,—না, লড়াই এখানে হয়নি, বড়ো বড়ো হাওয়াই জাহাজ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে, বন্দরে জাহাজ এসে ভিড়েছে, অনেক জাহাজ জায়গা না পেয়ে বাইরে নোঙর করেছিল এ-ও শুনেছি। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় এখানকার অনেক উন্নতি হয়েছিল। এই যে ঘরগুলো দেখছেন, এগুলো মিলিটারিরা তৈরি করেছিল, এখন সরকার আমাদের থাকতে দিয়েছে।

—মিলিটারিয়া এখানে ছিল?

মহিলা বললেন,—হ্যাঁ, ফৌজী সব গোরা আদমী। তারাই ত হাওয়াই জাহাজের আড্ডা বানালো, টেলিফোন লাইন বাড়ালো, রাস্তাঘাটও অনেক করলো। যদি বেড়াতে যান, ত দেখবেন, পাহাড়ের ওপরে তাদের ঘাঁটিগুলোর নিশানা রয়েছে।

—এখানে বেস করেছিল বুঝি?

তিনি বললেন,—ঠিক বলেছেন। এখান থেকে রসদ জোগান যেতো। ধানের খেতও ওদের দৌলতে আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে।

—এখানে ধান হয়?

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন,—আগে হতো না, আমরা ভারতীয় মজদুরেরা এসে বহু মেহনৎ দিয়ে ধান বুনেছি।

—আপনারা নিজেরাই কি ধানক্ষেতের কাজে—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন,—না। আমরা আখের ক্ষেতে কাম করেছি। আখের ক্ষেতের জন্যেই দেশ থেকে এতো-এতো মজদুর এসেছে ক্ষেপে ক্ষেপে।

—এখানে আখ হয় বুঝি?

বললেন,—আখ মাড়াই করে চিনিভী হচ্ছে আজকাল। তাছাড়া পাহাড়ে গিয়ে দেখবেন, কফির চাষও হচ্ছে।

দোসী জিজ্ঞাসা করলো,—আর কী কী হয় এখানে ?

ভদ্রমহিলা এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন, তারপরে বলে উঠলেন,— এখানকার জঙ্গলে একটা জিনিস হয়, তাকে এরা বলে 'বেরেড ফুরুট', আমরা বলি 'রোটিফল।'

মাসুদ কথাটায় উৎসাহিত বোধ করলো। বললে,—ব্রেড-ফ্রুট ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুড়ো চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে কথাটি শুনেছি বটে।

মহিলাটি বললেন, মাঝে মাঝে শহরের বাজারে দেখা যায়। ছেলেরা যে ফুটবল খেলে, ফলগুলো ঐরকম গোল, তবে কিছুটা ছোট, বাইরেটা ঝকঝকে সবুজ, আবার কোনো কোনোটা একেবারে হলদে, সেগুলো পাকা ফল।

—খেয়েছেন কখনো ?

বললো,—আমার ঘরওয়ালা একবার এনেছিল। ভেতরে নরম শাঁস থাকে। সেগুলো অল্প আঁচে গরম করলে বিলকুল রোটির মত দেখায়। একটু মির্চা আর নিমক মিশিয়ে খেয়ে মনে হয়েছিল যেন রোটি নয় আলুভাতে খাচ্ছি।

—বাঃ চমৎকার ত !

এর মধ্যে আবার গান আরম্ভ হয়েছিল। আবার সব চুপচাপ। গান থামবার পর দোসীই মুখ খুলল প্রথম। বললে,—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

তিনি অল্প অল্প হেসে বললেন,—ফরমাস করুন না, ভাইসাব ?

—আপনার স্বামী ফিরবেন তো ?

বহিনজী তাঁর অভ্যস্ত মৃদুকণ্ঠেই বললেন,—তা ফিরবেন।

—আপনি সঙ্গে গেলে পারতেন।

বহিনজী বললেন,—আমরা গরিব মজদুর, অতো রুপিয়া পাবো কোথায় ? অতি কষ্টে তিনি নিজে গেছেন, আমি বা আমার মেয়ে যেতে পারি নি।

বলে উঠলাম,—আপনার মেয়ে ! সে কোথায় ?

বললেন—ঐ একটিই সন্তান আমার। সে সিনেমা দেখছে। একটি টিকিট কোনরকমে জোগাড় করেছিলাম, তাই সে যেতে পেরেছে। তাকে ছবিঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সামনে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় কথাবার্তা শুনতে পেলাম আপনাদের ! দেশোয়ালী ভাষায় কথা বলছে কারা ? আর একটু এগিয়ে দেখি আপনারা।

মাসুদ বললে,—মেয়ে খুব বাচ্চা নিশ্চয়ই ? নইলে আপনি নিজে গেলেন বসিয়ে দিতে, এখান থেকে এইটুকু পথ ?

মহিলা আমাদের দিকে মুহূর্তের জন্য মুখ ফেরালেন। বললেন,— ভাইসাব, আজকের আখবার আপনারা পড়েছেন ?

—না !

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললেন,—তাহলে আমার মেয়ের সম্বন্ধে সব জানতে পারতেন। তার উমর এখন ষোলো, লেকিন সাদী দিতে পারি নি। আমার ঘরওয়ালার দেশে যাবার এটাও একটি কারণ, যদি ভালো ছেলের খোঁজ-খবর পায়।

—কিন্তু খবরের কাগজে আপনার মেয়ের সম্বন্ধে কী বেরিয়েছে? মাপ করবেন, কথাটা জানতে চাইছি বলে।

ভদ্রমহিলা বললেন, ভাইসাব, বহিন যদি দুঃখের কথা ভাইদের না জানায় তাহলে আর কাকে জানাবে? তা ছাড়া, আখবারে সবই বেরিয়েছে, রেখে ঢেকে বলবার তো কিছু নেই।

বলে, একটু থেমে তারপরে শুরু করলেন,—ভাইসাব, আপনারা পড়িলিখি আদমী, কতো কী পড়েছেন, দেখেছেন। আমি লেখাপড়াও জানি না, আমার যেটুকু জানা তা ঐ আমার ঘরওয়ালার কাছ থেকে। বলার কিছু চুক হয়ে গেলে মাপ করবেন।

মাসুদ বলে উঠলো,—অমন করে বলবেন না দিদি, আমরাও তেমন পড়িলিখি নই। আপনি বলুন।

'দিদি' বলে সম্বোধন করায় বোধহয় খানিকটা সহজ হলেন মহিলা, বললেন,—ভাইয়া, এই ফিজিতে একটি আংরেজী কথা খুব আপনারা শুনবেন, কানিবল। ইয়ানে, মানুষ, অথচ মানুষ খায়।

এ-প্রসঙ্গে দোসী একেবারে লাফিয়ে উঠলো। বললে, এ-রকম মানুষ তাহলে সত্যিই আছে? তাহলে এখানে আপনারা আছেন কী করে?

ভদ্রমহিলা ওর উত্তেজনার বহর দেখে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলেন। পরে অল্প একটু হাসলেন। বললেন,—আপনাদের জাহাজ শুনলাম কাল বিকেলেই ছেড়ে চলে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে সময় পাবেন কম, নইলে গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে একটু দূরে দূরে ঘুরে আসতে পারতেন। এখানে উঁচু উঁচু পাহাড় ভী আছে, জঙ্গল ভী আছে। কাল সকালের দিকে যদি সময় পান, তো, কম-সে-কম একটু শহর ঘুরে নেবেন, দূর থেকে 'নামোসি' পাহাড়-চূড়াটা চোখে পড়বে। ওখান থেকে 'ওয়াইমান' বলে একটা ছোট নদী গিয়ে রেওয়ায় পড়েছে। এখানে অনেক বিহারী ভী আছে, ছট্ পরবে খুব ধুমধাম হয়। আমরা দল বেঁধে ঐ নদীতে গিয়ে আস্নান করে আসি, রেওয়া নদী অনেক দূরে। এত বরষ আছি, ঘোরাঘুরিও থোড়া-বহুৎ করেছি। সব থেকে উঁচু পাহাড় যে মাউণ্ট বিক্টোরিয়া আছে না? সেখানেও গাড়ি ভর্তি করে গিয়ে চড়িভাতি সেরে এসেছি, কখনো 'কানিবল' দেখি নি। এখানে মিউজিয়াম আছে, সকালে গিয়ে দেখতে পারেন। তাতে একটা ছবি লটকানো আছে, একটা গাঁ-মতন জায়গা, ঝোপড়ি-মাফিক একটা কুঁড়েঘর। তার সামনে বসে আছে জামা গায়ে পাকাচুলওয়ালা এক বুড়োমানুষ। নিচে লেখা আছে, ঐ বুড়োটাই নাকি শেষ বুড়ো যে মানুষ হয়েও মানুষের মাংস খেয়েছে। তাহলে ভাইয়া,

কী দাঁড়ালো ? সরকার থেকেই বলছে, সারা ফিজিতে কানিবল আর নেই। তবু মানুষের ভয় যায় না। শহরের ধারে এক জায়গায় সপ্তাহে দুবার বাজার বসে। পাহাড়ী লোকেরা আসে, অন্য দ্বীপের মানুষরা আসে,—তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'কানিবল' থাকতে পারে বলে লোকেরা রটনা করতে ছাড়ে না। আপনাদের বলি, রেওয়া নদীর ওপারে অনেকটা দূরে গেলে সমুদ্রের তীরে পৌঁছনো যায়। তারই প্রায় গা ঘেঁষে ছোট্ট এক দ্বীপ আছে। এখানকার লোকেরা বলে, মবায়ু। কিভাবে রটে গিয়েছিল যে ওখানকার লোকেরা নাকি এখনো বাগে পেলে মানুষ ধরে ধরে খায়। আমার ঘরওয়ালা অনেকদিন আগে একবার দোস্তদের সঙ্গে ঐ দ্বীপে গিয়েছিল। কী দেখেছিল শুনবেন ? সেদিন ছিল উৎসব। বড়ো একটা শুওর ধ'রে তার মাথায় ডাণ্ডা মেরে তাকে শেষ করে ফেললো। তারপর তার পেট চিরে তাতে উনুনের মধ্যে-রেখে-গরম-করা পাথরের টুকরো ঢুকিয়ে সেলাই করে দিলো। এরপরে ছাল ছাড়িয়ে উনুনে ভালো করে ঝলসে নিলো। এ পর্যন্ত দেখেই ওরা চলে এসেছিল। উৎসবের বাকি অংশ আর দেখেনি। আমার ঘরওয়ালা বলেছিল, এ-রকম করেই ওরা নাকি মানুষ খেতো। শুওরের বদলে মানুষ।

বহিনজী থামলেন। আমরা অসীম আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম। সিনেমায় তখন গান হচ্ছিল কিনা আমার মনে নেই। বহিনজী আবার বলতে লাগলেন, —এই মবায়ুর লোকেরা হাটে এলে এখনো লোকে ভয় পায়, কাছে ঘেঁষতে চায় না। আমার জিন্দগীতে কখনো এখানে মানুষ খাবার কথা শুনি নি, তবু যে কেন ওটা রটে, কারা রটায় তা জানি না। ভাইয়া সাচ বলবো, আমার ও-ব্যাপারে তেমন কোনো ভয়ডরই ছিল না, কিন্তু সেদিন যখন আমার ষোলো বছরের মেয়ে রাধা হারিয়ে গেল, তখন আমি দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরওয়ালা দেশে, আমি একা মেয়েছেলে কী বিপদে যে পড়লাম বোঝাবার নয়। একদিকে চোখের জল মুছছি, আর অন্য দিকে কোতোয়ালীতে দৌড়চ্ছি, এর মধ্যে আখবারের লোকেরা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো, আমি যেন সাচমুচ বাউরা হয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশ কোন খোঁজ পাচ্ছে না, আমাদের দেশওয়ালীরাও ছুটোছুটি করে কোনো হদিশ আনতে পারছে না, লোকে বলতে লাগলো নির্ঘাৎ কানিবলরা ধরেছে। ঐ মবায়ুর দিকে দলবেঁধে যাও, যদি কোনো নিশানা মেলে। ওখানেই মানুষখেকোদের বাস। এতক্ষণে তোমার মেয়েকে ঝলসে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে।

বলতে বলতে বহিনজীর চোখে আবার জল এসে গেল, গলা ধরে এলো। কোনক্রমে নিজেকে সামলে, চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন, কোন সন্তানের মা এ-কথা শুনে বেঁচে থাকতে পারে ! আমি এখানকার শিউমন্দিরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম। আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও, নইলে উঠবো না ! বোধহয় অজ্ঞান হয়েও পড়েছিলাম। পরদিন দুপুরবেলায় কোতোয়ালীর সিপাহী গিয়ে আমাকে শিউমন্দিরে খবর দিলো, থানায় এসো, তোমার মেয়েকে

পাওয়া গেছে ! আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লাম, পাগলের মতো ছুটলাম থানার দিকে। দেখি মেয়ে বসে আছে, আর কাছেই সেই ছবিতে দেখা মানুষ খেকো বুড়োর মতন একজন বুড়ো। মা আর মেয়ের মিলনের কথা বলে আর লাভ নেই। মা যত কাঁদে, মেয়েও তত কাঁদে। ক্রমে একটু ঠাণ্ডা হতে সব জানা গেল। ঐ বুড়োটা সত্যিই মবায়ু-দ্বীপের লোক। সমুদ্রের ধার থেকে কান্নার শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখে, একটা পালতোলা বিরাট জাঙ্ক ধরনের নৌকো প্রবাল-বাঁধের মধ্যে কী করে যেন আটকে গেছে, নৌকোর লোকেরা নেমে পড়ে নৌকোটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। হাত-পা-বাঁধা মেয়ে জানালায় শিকগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে ! বুড়ো হাঁক দিয়ে লোকজন জড়ো করে তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়লো নৌকোর ওপর। নৌকোর লোকগুলো ফিজির লোক নয়। বলতে লজ্জা করে। তারা রীতিমত সভ্য মানুষ, এই ফিজিতেও তাদের যাতায়াত আছে। তারা মালয় কিম্বা সিঙ্গাপুর কিম্বা অন্য কোথাও থেকে এসেছিল। কালো মানুষ তারা নয়। দিব্যি ঝকঝকে চেহারা, আংরেজী বুলি হরবখৎ ফুটছে তাদের মুখে। শহরেই ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে মেয়েকে কিভাবে একা পেয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে অজ্ঞান করে একটা জীপে তুলে নিয়েছিল। কী তাদের মতলব ছিল কে জানে। ঐ মানুষখেকো দ্বীপের 'মানুষখেকো' লোকগুলো না গিয়ে পড়লে মেয়েকে আর ফিরে পেতাম বলে মনে হয় না। নৌকোর লোকগুলো বিলক্ষণ জখম হয়েও পালিয়ে গিয়েছিল, আর মবায়ু-দ্বীপের সেই বুড়ো মানুষটি মেয়েকে একা পেয়ে ঝলসে পুড়িয়ে খাওয়া তো দূরের কথা, অতি স্নেহে আর যত্নে একা নিয়ে এসেছে তাকে তার মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিতে। মেয়ে বললে মবায়ু-দ্বীপের লোকেরা কবে মানুষখেকো ছিল কে জানে। একটা পাথর-বাঁধানো বিরাট বেদী আছে। সেখানে নরবলি দেওয়া হতো একথাও ঠিক। কিন্তু এখনকার মানুষরা অন্যরকম। শুনে অবাক হবেন ভাইয়া, তাদের মাতব্বররা আংরেজী বুলি অল্প অল্প বলতে পারে। তারা শহরের হাটে আসে সওদা করতে, সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, তাদের নামে ঐ জঘন্য রটনাগুলো করতো মেয়ে-চোর বোম্বেটের দল। সব দোষ ওদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সাধু সাজবার চেষ্টা করতো। কোতোয়ালী বলেছে, বিরাট একটা গ্যাং শীগ্‌গিরই ধরা পড়বে। আখবারেও সেইরকম কথা লিখেছে। মহাদেবের অশেষ করুণা, আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি।

॥ ৪ ॥

এরপর আমাদের সুদীর্ঘ যাত্রা। জাহাজ থামবে একেবারে সিঙ্গাপুরে গিয়ে। বাহিনজী যে খবর পেয়েছিলেন, সেটাই ঠিক। পরদিন বিকেলেই জাহাজ তীর ছাড়লো। ক্যাপ্টেন বললেন,—সুভা-তে আরও একটা দিন থেকে আর কিছু মাল

নেওয়া যেতো, কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি 'কোরাল সী' পার হতে হবে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, শীগ্‌গিরই ওখানকার সমুদ্র রুদ্রমূর্তি ধরবে। শুরু হবে ঝড়-তুফানের কাল।

সমুদ্রে 'তুফান' বা ওখানকার ভাষায় 'তাইফুন'-এর আতঙ্ক কার না আছে? খবরটা শুনে সবারই মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। কেউ আর অকারণে হাসছে না হো-হো করে। কেউ আর মনের আনন্দে শিস্ দিয়ে সুর তুলছে না। দোসী তার রেডিও-রুমে, আমি অবকাশ হলে একবার তার কাছে, আর একবার মাসুদের কাছে চার্টরুমে।

দেখতে দেখতে আমরা উত্তর ফিজি বেসিন ছাড়িয়ে এলাম। এবার বাঁ-দিক ঘুরে চলতে লাগলো জাহাজ। দিন দুই চলার পর দোলা শুরু হলো। নাগর দোলায় বসে ওঠা আর নামার যে শিহরণ, আমরা তা-ই অনুভব করতে লাগলাম সারাক্ষণ। মনে পড়ে একটি মুহূর্তের কথা, আমি তখন বসেছিলাম মাসুদের কাছে। ম্যাপের সামনে ব্রীজে সেকেণ্ড অফিসার আর ক্যাপ্টেন স্বয়ং। স্টারবোর্ডসাইডে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে একমনে কী যেন দেখছিলেন তিনি। হঠাৎ একসময় নাবিক-সুলভ উল্লাসে কলরব করে উঠলেন,—হেই হো! —ল্যাণ্ড অ্যাহয়!

আমরা ছুটে কাছে গেলাম। দূরে আবছা একটা পাহাড় দেখা যায়,—যেন বিরাট একটা ঢেউ উঠে হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে! সেইদিকে একটুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে থেকে তারপরে ক্যাপ্টেন বললেন,—বোধহয় ভ্যানিকোরো দ্বীপ।

তাড়াতাড়ি চার্টরুমে গিয়ে ম্যাপ-ট্যাপ দেখে এসে মাসুদ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—হ্যাঁ স্যার।

ওঁর মুখে তখন একটা অদ্ভুত তৃপ্তির আভা ফুটে উঠেছিল। বললেন,— যুদ্ধের সময় এসব জায়গায় ঘুরেছি। এরপর 'সলোমন সী'-তে পড়বো। তারপরে ডানদিকে আসছে রেনেল দ্বীপ। এই রেনেলের উত্তরেই রয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত 'গুয়াদাল ক্যানাল দ্বীপ', যেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল জাপানীদের সঙ্গে। সেকেণ্ড অফিসার জিজ্ঞাসা করলো,—স্যার, আপনি ওখানে গিয়েছিলেন?

—নিশ্চয়ই!—ক্যাপ্টেন বললেন,—যেমন বৃষ্টি, তেমন জঙ্গল, তেমন মশা। জানো? ম্যালেরিয়া রুখবার জন্য তখন রীতিমতো একটা 'অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া ইউনিট'ই গড়ে তোলা হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন আর কিছু বলেন নি, হয়ত স্মৃতির অতলে অবগাহন করছিলেন। এইবার বুঝতে পারছি, এদিককার সমুদ্রের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই হয়ত তাঁর এই চার্টার্ড-জাহাজটিকে এতদূরে পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু সিঙ্গাপুরে পেঁছিবার আগেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। সলোমন সাগরের পর টাগুলা-দ্বীপ ডাইনে রেখে আমরা যখন কোরাল সী বা প্রবাল সমুদ্রে এলাম, সমুদ্র তখন মোটামুটি শান্তই ছিল, কিন্তু নিউগিনির দিকে মোড়

ঘুরে খানিকটা ভিতরে যেতেই পড়লাম প্রবল তুফানের মুখে। সে প্রলয়ঙ্করী তুফান বা 'তাইফুন'-এর বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, আমাদের জাহাজের কলকব্জা কিছু বিকল হয়েছিল, তাই রেডিওর মাধ্যমে কাছের বন্দরে খবর পাঠিয়ে আমরা কোনমতে সেই বন্দরেই গিয়ে আশ্রয় নিলাম। পোর্ট মোরস্‌বি। বন্দর শুধু নয়, পাপুয়ার রাজধানী।

সমগ্রভাবে নিউ গিনি দ্বীপটি বেশ বড়ো, তার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের নাম পাপুয়া। ম্যাপে দেখা যায়, এই পাপুয়ার একটি তীর অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ভূখণ্ডের প্রান্ত প্রায় ছুঁয়ে আছে; মাঝখানে রয়েছে 'টরেস' প্রণালী। অস্ট্রেলিয়ার সুবিস্তৃত 'প্রবাল বাঁধ' (গ্রেট বেরিয়ার রীফ)-এর উত্তর বিন্দু ঘেঁষে পাপুয়া উপসাগরে ঢুকে 'গ্রেট নর্থ-ইস্ট-প্যাসেজ' দিয়ে টরেস প্রণালী পার হয়ে আরাফুরা সাগর কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে নানান দ্বীপের পাশ কাটিয়ে ফ্লোরেস আর জাভা সমুদ্রে প'ড়ে আমরা সিঙ্গাপুরে গিয়ে পৌঁছবো কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না। 'হাল ভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা' নিয়ে সমাগত পাইলট সাহেবের নির্দেশ মতো জাহাজ চালিয়ে আমরা পাপুয়া বন্দরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। আকাশ থেকে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল।

এ বন্দরে আমাদের নিয়মমাফিক কোনো এজেণ্ট ছিল না বলে রেডিও মারফৎ হারবার-মাস্টারকে একজন এজেণ্ট ঠিক করে দেবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। জানা গেল ফিজিতে যে কোম্পানী আমাদের এজেণ্ট ছিল, তাদেরই একটি শাখা-অফিস এখানে রয়েছে। আমাদের জাহাজের নাম দেখে তারা নিজেরাই হারবার-মাস্টারকে জানিয়ে রেখেছিল। সেজন্য জাহাজ ভিড়তেই পুলিশ ও কাস্টমস-এর সঙ্গে আমাদের এজেণ্টও এসে উপস্থিত হলেন। অর্থাৎ এজেণ্ট-অফিসের স্থানীয় ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং মিঃ কলিন্স, খাস অস্ট্রেলিয়ার লোক। একগাদা কাগজ-পত্র সই-টই করে ক্যাপ্টেন ও'র সঙ্গে আমাকে ও'র অফিসে পাঠালেন। স্থানীয় টাকা-পয়সা নিতে হবে, নইলে নাবিকরা তীরে নেমে খরচা করবে কী করে? দ্বিতীয়ত জাহাজের মেরামতির জন্য ঠিকাদারও ঠিক করে দেবেন মিঃ কলিন্স। কথায় কথায় বোঝা গেল, যুদ্ধের সময় পাপুয়ার অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা তিনি চোখে দেখেন নি। এখন যেটা ও'র লক্ষ্যে পড়েছে, সেটা হচ্ছে এক রাজনৈতিক ঢেউ। সমগ্র নিউ গিনি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এখন যাকে পাপুয়া বলা হচ্ছে, তা ছিল ব্রিটিশদের হাতে। উত্তরাংশ ছিল জার্মানদের অধিকারে, আর পশ্চিম ভূভাগ ডাচদের। এখন পাপুয়ার ভার সরাসরি নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আর জার্মানদের অংশ, যাকে বলা হচ্ছে 'ইউ-এন-ট্রাস্ট টেরিটরি' তারও ভার গ্রহণ করেছে অস্ট্রেলিয়া; সেজন্য এদিকে ততটা উত্তাপ নেই। কিন্তু পশ্চিম অংশ, যাকে 'ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ' বা ইন্দোনেশিয়ার নেতারা বলেন 'পশ্চিম ইরিয়ান', তাকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে বলে প্রবল আন্দোলন চলছে। ১৯৪৫ সালে জাপানীরা ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে চলে যাবার পর ইন্দোনেশিয়া নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেও ডাচরা সহজে তাদের

অধিকার ছাড়েনি। (বর্তমান পরিস্থিতি অবশ্য ভিন্ন। ১৯৪৯ সালে ইন্দো-নেশিয়া সার্বভৌমত্ব অর্জন করে, আর পরের বছরে করে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আলোচ্য নিউগিনির পশ্চিমাংশ বা পশ্চিম ইরিয়ান ইন্দোনেশিয়ারই আওতায় এসেছিল। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন আন্দোলন ছিল অব্যাহত। ঐ অংশের রাজধানী বা প্রধান বন্দরের নাম তখনো 'কোটাবারু' হয়নি, তখনো নাম ছিল 'হল্যান্ডিয়া।')

বৃষ্টি তখনো পড়ছিল। গায়ের বর্ষাতিটা বাইরের হুকে ঝুলিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকেছি, দেখি অন্য এক আগন্তুক আগে থেকে এসে মিঃ কলিন্সের অফিস ঘরে বসে আছেন। পথে আসতে ঘোর কালো যেসব পথচারীদের দেখে এলাম, ইনি কিন্তু সে রকম নন। লম্বা চেহারা, পঞ্চাশের ওপর বয়স বলে মনে হয়, গায়ের রঙ ফর্সাই ছিল, এখন রোদে পুড়ে বিলক্ষণ তামাটে হয়ে গেছে। পরণে নীল ট্রাউজার, গায়ে সাদা গেঞ্জি। তাঁকে দেখে কলিন্স বলে উঠলো, হ্যালো ডক্টর কতক্ষণ ?

—জাস্ট অ্যারাইভড়।

—বোসো। ওঁর সঙ্গে একটু জরুরী কাজ সেরে নি।

আমরা বসে কাজ আরম্ভ করলাম। প্রথমটায় উক্ত 'ডক্টর' ব্যক্তিটি আমাকে তেমন লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু জাহাজ নিয়ে কথা হতেই আমার প্রতি মনোযোগী হলেন। সাধারণত এইধরনের আলাপে কোন জাহাজ, কোথা থেকে আসছো, যাবে কোথায়—এরপরেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম কী প্রশ্নটা অনিবার্যরূপে এসে যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। আমি নাম বলতেই ভদ্রলোক যেন লাফিয়ে উঠলেন। তারপরে চেহারার বর্ণনা শুনে তাঁর আর সন্দেহ রইলো না। বললেন,—ভয়ানক চেনা লোক! আজ সময় হবে না, কাল সকালেই গিয়ে হাজির হবো। তুমি বলবে যে ডক্টর হ্যারিকেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

বিচিত্র নাম। জাহাজে গিয়ে নামটা বলতেই ক্যাপ্টেন চমকে উঠলেন। বললেন,—হ্যারিকেন? এখানে প'চে মরছে নাকি! যুদ্ধের সময় ও তো সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ছিল। গুয়াদালক্যানেল, মালাইটা, ইসাবেল,—কোথায় না দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে ? ওরকম অদ্ভুত মাথা খারাপ লোক পৃথিবীতে যদি দুটি থেকে থাকে!

ক্যাপ্টেন মানুষ, ওঁর কাছে খুব বেশি কৌতুহল প্রকাশ করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম। উনি নিজে থেকেই বললেন,—ডাক্তার মানুষ, যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল কোরে ছিলেন। নাম হ্যারিয়েট, কিন্তু এ দ্বীপ থেকে সে দ্বীপে অনবরত ছোটাছুটি করেন দেখে সৈন্যরা নাম দিয়েছিল, হ্যারিকেন। সেই নামটাই বহাল আছে দেখছি।

আর কোনো কথা হয়নি। সারাদিন কাজের পালা চললো। মেরামতির কাজে বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পর্যন্ত নিজে হাত লাগালেন। বৃষ্টি ধ'রে

গিয়েছিল, কিন্তু এমন একটা গুমোট ভাব যে বেশ কষ্ট হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়তে লাগলো। জাহাজের সবাই এখানকার কালো-কালো লোকগুলোর মতো গায়ের জামা খুলে ফেললো। সন্ধ্যায় আবার ফুরফুরে হাওয়া। সমুদ্র থেকে শহরটিকে ঠিক দেখা যায়নি বা বোঝা যায় নি। মনে হচ্ছিল, অদূরে দিগন্তে বিরাট বিরাট খাড়াই পাহাড় যেন অতিকায় প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পরে জাহাজ জনপদের কাছাকাছি হলে বনজঙ্গল আর লম্বা লম্বা নারকেল-গাছের জটলা চোখে পড়ে। আরও কাছে যাবার পর শহরটাকে একটু-একটু দেখা যায়। মনে হয় অরণ্য যেন শহরটাকে দু-হাত দিয়ে লুকিয়ে রাখে, কাছে গেলে আস্তে আস্তে অতি আদরের জিনিসটাকে বার করে দেখায়।

পরদিন সকালে আকাশ দেখে সবাই অবাক। যেন সমুদ্রটাকেই উলটে দেওয়া হয়েছে। সাদা সাদা হালকা মেঘ এদিক-ওদিক দ্বীপের মতো ছড়িয়ে থাকলেও সারা আকাশটা একেবারে সমুদ্রের মতো নীল। সেকেন্ড অফিসারের ভাষায়, বোতল বোতল নীল কালি যেন আকাশ জুড়ে ঢেলে দিয়েছে!

কিন্তু এ শোভা বেশিক্ষণ নিরীক্ষণ করা গেল না, ক্যাপ্টেনের ঘরে ডাক পড়লো। এখুনি কিছু টাইপ করে দিতে হবে। সে-সব সেরে আন্দাজ নটা নাগাদ আবার ডেকের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছি, দেখি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন ডক্টর হ্যারিকেন। ঠিক সেদিনের পোষাকে, হাতে শুধু একটা চাবির রিং। উনি মুখ তুলতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। হেসে বললেন,—হ্যালো ইন্ডিয়ান?

সম্ভাষণের পালা শেষ করে বললাম,—আমি যে ইন্ডিয়ান, সে খবর নেওয়া হয়ে গেছে ত?

বললেন,—নিশ্চয়। আসল কথা, কলিন্স খুব প্রশংসা করছিল তোমার। আমার মক্কেল কোথায়? গিলবার্ট?

এরপরে ক্যাপ্টেনের ঘরে উল্লাসের জোয়ার বইতে লাগলো। আমাকে কী ভেবে বসতে বললেন ক্যাপ্টেন। ডক্টর ওঁকে বললেন,—আমি তোমাকে নিতে এসেছি হে! আজ লাঞ্চ আমার ওখানে। এই ইন্ডিয়ানটিকেও সঙ্গে নাও, দরকার আছে।

ক্যাপ্টেন আপত্তি করলেন না। বললেন,—সে সব ঠিক আছে, কিন্তু তুমি সলোমান দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে এখানে কেন?

ডক্টর উত্তর দিলেন, শেষ পর্যন্ত এখানেই ডেরা বেঁধেছি। যদিও রুজি-রোজগারের জন্য আমি এখানকার এক রবার-বাগানের ডাক্তার, কিন্তু অন্য কাজও প্রচুর করতে হয়। ভেবেছিলাম ভোরে আসবো, কিন্তু বাড়িতেও রোগীর ভিড় লেগে থাকে, সেরে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল!

ওঁদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তা চলছে, আমি কী কারণে যেন উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ কেবিনের গোল জানালার বাইরে চোখ যেতে দারুণ চমকে উঠলাম। ঐ

নীল বোতল ঢালা আকাশে জ্বলছে একটি তারা, তার ঝলমলে স্নিগ্ধ আলো রাতের মতো না হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। তারাটি একটু বড়োও বটে।

—কী দেখছো হে, অমন করে?

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—স্যর, এমন সময় আকাশে তারা! তাহিতির কাছেও দেখেছিলাম বটে, কিন্তু তখন বেলা প্রায় চারটে। তাই বলে এখনই, এই বেলা দশটায়!

ওঁরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে তারাটিকে দেখলেন। ক্যাপ্টেন বললেন,—ভেনাস।

ডক্টর বললেন,—আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, সলোমন গ্রুপের ইসাবেল দ্বীপটির কথা। তার আকাশে ঐ ভেনাসকে দেখে, সেই ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের জাহাজের ক্যাপ্টেন দ্বীপের উপসাগরটির নাম দিয়েছিল 'নক্ষত্রের উপসাগর'।

ক্যাপ্টেন আমাকে বললেন,—অবাক হয়ো না, এখানকার আকাশ পরিষ্কার থাকলে দিনের বেলা প্রায়ই ঐ ভেনাসকে দেখা যায়।

যাইহোক, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমাকে বেরুতে দেখে আমার বন্ধুরা রীতিমত অবাক হলো। ক্যাপ্টেন জাহাজ ছেড়ে খুব কমই বেরোন, আর বেরুলে সচরাচর কাউকে সঙ্গে নেন না। তাহলে আজ এই অঘটন ঘটলো কেমন করে? তাদের অবাক হবারই কথা।

ডক্টরের সঙ্গে ছিল জীপ। সেই জীপে করে শহর ছাড়িয়ে গাছপালা-ঘেরা গ্রামট্রাম ছাড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। এক জায়গায় দেখলাম, বেশ কয়েকটি নারকেল গাছের মাথা একেবারে নেড়া, যেন বাজ প'ড়ে সব পুড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন বললেন,—বাজ নয়, বোমা। যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে কতো গাছপালা যে পুড়েছে, কতো বাড়িঘর যে ভেঙেছে, তার ইয়ত্তা আছে? এখানে আমি আগে আসিনি বটে, কিন্তু সেনাদের কাছ থেকে অনেক কাহিনী শুনেছি। জাপানীরা পাপুয়া দখল করতে চেয়েছিল। এই যে পাহাড়ের শ্রেণী যার নাম 'ওয়েন স্ট্যানলি রেঞ্জ',-এর ওপারে সমুদ্রের ধারের 'বুনা' বলে জায়গায় সৈন্য নামিয়েছিল।

ডক্টর বললেন,—আরও একটু আছে। পাহাড় পেরিয়ে ওদিককার গ্রামগুলিতেও ঢুকে পড়েছিল। পোর্ট মোরস্‌বি তখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর। এটা দখল করতে পারলে অস্ট্রেলিয়া আক্রমণের খুব সুবিধা পাওয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে আরও পূর্বদিকে মিত্রশক্তির যে সব 'বেস্‌' তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ ব্যবস্থাই বানচাল করে দেওয়া যায়। তাই এই পাপুয়ায় ওরা মরণ-কামড় দিয়েছিল আর সেই সঙ্গে মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে প্রধানত অস্ট্রেলিয়ানরা প্রাণপণ শক্তিতে তাদের উৎখাত করবার চেষ্টা করেছিল। না পারলে তাদের নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করাই যে কঠিন হতো!

ক্যাপ্টেন বললেন,—ওঃ! সে সব কী দিনই না গেছে! ১৯৪২ সালের এপ্রিলের শেষের দিক। জাপানীরা তখন একের পর এক এদিককার রাজ্য জয়

করে চলেছে। হংকং—মালয় ছাড়িয়ে বার্মা পর্যন্ত তাদের হাতের মুঠোয়। এবার তারা সলোমনের 'তুলাগি' আর পাপুয়ার এই 'মোরস্‌বি' ছিনিয়ে নেবার আয়োজন করলো। এদের আক্রমণ ঠেকাতে এই দ্বীপের পাহাড়ে-জঙ্গলে কী ভীষণ যে লড়াই হয়েছিল, তা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডক্টরও তখন যেন সেইসব দিনের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। বললেন,—প্রবাল সমুদ্রে আমাদের বিরাট বিমানবাহী জাহাজ 'লেক্সিংটন'-ডুবির কথা কখনো ভুলবো না।

ক্যাপ্টেন বললেন,—এখানকার যুদ্ধের ক্ষত দেখছি এখনো শুকোয় নি। শহরের কিছু বড়ো বড়ো ভেঙে-পড়া বাড়ি এখনো সারানো হয়নি দেখলাম, আর এখানে দেখছি লম্বা লম্বা নারকেল গাছগুলোর শোচনীয় অবস্থা !

ঠিক এই সময় জীপটা একটা বাঁক নিয়ে এক ঢালু পথ ধরে সোজা এগিয়ে চললো। সামনে বেশ উঁচু করে কাঁটা তারের শক্ত বেড়া দেওয়া, বেড়ার মাঝে মাঝে কংক্রীটের স্তম্ভ। ভিতরে লাল টালি ছাওয়া অনেক কুটিরের সমাবেশ। দূর থেকে দেখলে মিলিটারীদের সযত্নরক্ষিত ক্যাম্প বলে মনে হয়, কিন্তু কাছে গিয়ে অবাক হলাম, গেটের কাছে একটি সুদৃশ্য বোর্ডে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে 'KIRON COLONY'.

'কিরণ' নামটা স্বভাবতই আমাকে চমকে দিয়েছিল। এ যে একেবারে আমাদের 'দেশীয়' নাম।

কয়েকটি কুটির ছাড়িয়ে একটি সুদৃশ্য কুটিরের সামনে গিয়ে আমাদের জীপ দাঁড়ালো। জীপ থেকে নেমে দেখলাম, কুটিরের সংখ্যা কম নয়, সারি দিয়ে ভিতরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে কুটিরগুলো। আমরা যে কুটিরের পাশে গিয়ে নামলাম, তার পিছনে বিরাট এক হলঘর,—মাথাটা কুটিরের মতো লাল টালি-ছাওয়া যদিও। বড়ো বড়ো জানালা, কাঁচের পাল্লা বসানো। ইতস্তত দু-চারজন নার্স ঘোরাফেরা করছে। একটা বোর্ডে লাল অক্ষরে 'Hospital' লেখা। বুঝলাম, ওটা হাসপাতাল। আমরা যে কুটিরে প্রবেশ করলাম, সেটি বেশ প্রশস্ত। একদিকে টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি,—ঝকঝকে-তকতক রীতিমত গোছানো ও ঝাড়পোছ করা। অন্যদিকে আয়না-বসানো ওয়ার্ড-রোব, একটা দেওয়াল-আলমারীতে বইপত্র শোভা পাচ্ছে কাঁচের পাল্লার আড়ালে। আর অন্যদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি খাট, তাতে বিছানা পাতা; পরিষ্কার, টান-টান করে একটা রঙীন নক্‌সা-কাটা বেড-কভার দিয়ে ঢাকা !

বোঝা যায়, এটা চেম্বার ও বেডরুম একসঙ্গে। পাশে আরও একটি ঘরের আভাস পাওয়া যায়। দরজা খোলা থাকায়, সেখানকার ব্যবস্থা দেখে বুঝলাম, ওটা ডাইনিং স্পেস্‌,—তার পাশে বোধহয় আরও একটি ঘর আছে, সেখান থেকে উর্দি-পরা একজন বেয়ারা বেরিয়ে এলো, দোহারা চেহারা, বেঁটে ধরনের, গায়ের রঙ কালো। ডাক্তার তাকে কী ইঙ্গিত করতে সে মাথা নিচু করে সম্মান

জানিয়ে আবার ভিতরে চলে গেল, নিয়ে এলো ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম। অর্থাৎ ডাইনিং স্পেসের পাশে ওটা রান্নাঘর।

চা সহযোগে শুরু হলো আমাদের কথাবার্তা। ক্যাপ্টেনই প্রশ্ন করতে লাগলেন বেশি। বললেন,—এটা তোমার চেম্বার? এখানে বসে রোগী দেখো?

ডক্টর বললেন,—নোপ্! আমার চেম্বার পিছনের হাসপাতালের লাগোয়া। ক্যাপ্টেন, তোমাকে আর তোমার এই ইণ্ডিয়ান বন্ধুটিকে নিয়ে এই কটেজে এসে বসবার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। এই কটেজে এখন কেউ বাস করে না, কিন্তু প্রতিদিন এই ঘরটি ধুয়ে-মুছে সাফ করে রাখা হয়। আজ আমরা এখানে বসেই লাঞ্চ খাবো। আমি সিস্টার ডরেজের কাছে খবর পাঠিয়েছি, তিনিই এই কলোনীর কর্ত্রী, রাউণ্ড সেরে এখুনি এসে পড়বেন। তাঁর কাছ থেকেই সব শুনো। আমি তাঁরই আহ্বানে এই কলোনীর সঙ্গে ডাক্তার হিসাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ক্যাপ্টেন, দু-চারজন দেশী বেয়ারা বা কুক্ হয়ত দেখতে পাচ্ছো, কিন্তু এই কলোনীর বাসিন্দা সবাই নারী। চব্বিশটি কটেজ নিয়ে এই কলোনী, তাহলে কতো এর বাসিন্দা, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারো। এদের জন্য স্কুল আছে, কাজকর্ম করবার নানারকম ব্যবস্থা আছে। কলোনী পেরিয়ে আছে বিশাল বাগান, তাতে সব্জী হয়, গম হয়। আর ভিতরে আছে তাঁতশালা, জামা-কাপড় তৈরি করার জন্য সারি সারি সেলাই-মেশিন বসানো কারখানা। সবই পরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদের দেখাবো। এখানে মেয়েরা সবাই কাজকর্ম করে। শহরের কো-অপারেটিভ-ফার্মগুলো এদের কাছ থেকে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে যায়। এককথায় মোটামুটি এদের নিজেদের আয়েই কলোনীর কাজ চলে যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন বললেন,—বোঝা যাচ্ছে, এটা মেয়েদের আশ্রম বিশেষ। স্থানীয় মেয়েদের নিয়েই বোধহয় তৈরি। এবং মেয়েরা বোধহয় অনাথ?

ডক্টর বললেন, 'অনাথ'ত বটেই, কিন্তু ঐ একটা কথায় সবকিছু বোঝা যাবে না। ক্যাপ্টেন, এখানে নানান দেশের—সাদা কালো—সবরকম মেয়ে এসেই ভিড় করেছে। আসলে এরা কারা, জানো? আশে-পাশের নানান দ্বীপের বাসিন্দা। এখানকার বাসিন্দা ত আছেই। এককথায় এরা সব 'ওয়ারভিক্‌টিম্‌স্!' যুদ্ধের পাশবিকতার এরা নির্মম বলি। যদি মন্তব্য করি, এখানকার সব মেয়েই কুৎসিত রোগগ্রস্ত ছিল, তাহলে কি তোমরা চমকে যাবে? ভাই হে, ঘুরে ঘুরে এখানকার মেয়েদের দেখে যে স্মৃতি নিয়ে যাবে, তা সবাইকে বলে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করো, যতটুকু পারো। বলছি না, এতেই বিশাল যুদ্ধ-চক্রান্ত একদিন তোমরা বানচাল করতে পারবে, কিন্তু তবু, যতটা সম্ভব। জনমত সৃষ্টি করতে দোষ কী? এই কলোনীর একটা নাম দেওয়া হয়েছে; কিন্তু শহরে যাও, সেখানে এ-নাম করলে কেউ চিনতে পারবে না। সবাই বলে 'ভি-ডি কলোনী'। এ থেকেই এই কলোনী সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে।

আমরা অবাক হয়ে ডক্টরের কথা শ্বনছিলাম। এমন সময় প্বর্বকথিত সিস্টার ডরেজ এসে ঘরে ঢ্বকলেন। তাঁর সঙ্গে নার্সের পোষাক পরা একটি তর্বণী ঘোর কালো মেয়ে ছিল। হাতে একটা ব্যাগ। সেটা ঘরের একপাশে নামিয়ে রেখে সে চলে গেল। সিস্টার এসে আমাদের পাশে বসলেন। বছর চল্লিশের মতো বয়স, দীর্ঘ চেহারা, টকটকে গায়ের রঙ। সন্ন্যাসিনীর শ্বভ্র পোষাকে আগাগোড়া আচ্ছাদিত।

প্রাথমিক সম্ভাষণের পর যখন আমার পরিচয় ওঁকে দেওয়া হলো, উনি একটু চমকেই আমার দিকে তাকালেন। তারপরে আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন,—য্বদ্ধের সময় ভারতেও কয়েকটা মাস আমাকে কাটাতে হয়েছে, তারপরে চলে আসি অস্ট্রেলিয়া। আর তারপরে এখানে। ডক্টরের মতো আমিও আমার নিজের দেশের কথা ভুলে গেছি, কিন্তু আমাদের কথা থাক। যদি মনে কিছ্ব না করেন, আমি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, আপনি ভারতের কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ?

বললাম,—প্বব অঞ্চলের। বেঙ্গল।

—বেঙ্গল !—উনি সবিস্ময়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। ডক্টরের ম্বখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আই অ্যাম এক্‌স্‌ট্রিম্‌লি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ ডক্টর, হি ইজ দি রাইট্ পার্‌সন !

—আই নো !—ডক্টর ঠোঁটের প্রান্তে হাসি টেনে এনে বললেন,—আমি সে-কথা আগেই জেনে নিয়েছিলাম। না হলে জাহাজে আরও ইণ্ডিয়ান ছিল, তাদের কাউকে আনতে পারতাম ! নাও, এখন বলো ওকে সব। তোমার ম্বখ থেকেই ও সব শ্বন্বক।

ভদ্রমহিলা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে বিশেষ উত্তেজিত, এ বিষয়ে ভুল নেই। বললেন,—য্বদ্ধ-বিরতির পর এইখানে এক অদ্ভুত মান্বষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁকে ডক্টর দেখেন নি, কিন্তু আমার কাছ থেকে সব শ্বনেছেন। আমিও কি সব জানি ? তাঁর একটি ডায়রী আমরা পেয়েছি। কিন্তু তার ভাষা আমরা কেউ পড়তে পারছি না। আপনি একটু সাহায্য করবেন ? তাহলে খ্বব উপকার হয় আমাদের। মনে হয়, এ আপনাদেরই অঞ্চলের ভাষা।

বলে, তিনি উঠে, দেওয়াল-আলমারীর বন্ধ পাল্লাটা তালাচাবি দিয়ে খ্বলে কালো মলাটের একটা ছোট এবং প্বরাতন ডায়রী নিয়ে এলেন। আমার হাতে ওটি সমর্পণ করে বললেন,—দেখ্বন তো, আমার অন্বমান সত্যি কিনা ?

আমি ডায়রীটা খ্বললাম। ডায়রী বলতে যে চেহারা আমরা ব্বঝি প্রতি প্বষ্ঠায় সাল তারিখ ছাপানো,—এটি সে রকমের নয়। ডায়েরী আকারের একটি বাঁধানো খাতা বলা যেতে পারে।

প্রথম প্বষ্ঠায় কিছ্ব লেখা নেই, লেখা আরম্ভ হয়েছে পরের প্বষ্ঠা থেকে।

এবং ভাষা সম্পর্কে ওঁদের অনুমান নির্ভুল। খুব সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে যে ভাষায় দিনপঞ্জী লেখা, তা বাংলা।

বললাম,—হ্যাঁ আপনার অনুমান ঠিক।

ডরেজ বললেন,—তাহলে অনুগ্রহ ক'রে এটা আপনি নিয়ে যান, কাল সকালে এসে দয়া করে দিয়ে যাবেন, কালও আজকের প্রোগ্রাম ফলো করা হবে, অর্থাৎ তিন জনেই একত্রে এখানে লাঞ্চ খাবেন, আশা করি আপত্তি নেই ?

না। আমাদের তিনজনের কারুরই আপত্তি ছিল না। সেদিন আমি ডায়রীটা জাহাজে নিয়ে এসে কেবিনের দরজা বন্ধ করে পড়তে শুরু করলাম। ভদ্রলোকের নাম কোথাও লেখা নেই, অনুমান করছি, তাঁর নাম,—'কিরণ।'—কিন্তু পদবী কী ? পড়লে হয়ত বুঝতে পারবো।

ভদ্রলোক নিয়ম করে ডায়রী লেখেন নি, মাঝে মাঝে লিখেছেন, যখন যে রকম খুশি। লিখেছেন ঃ

"যুদ্ধে মেডিক্যাল কোরে নাম লিখিয়েছিলাম। সেই কাজেই একদিন এখানে আসতে হয়েছিল। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কার্যকলাপ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব,—এসব কিছুই আমি দেখতে পাইনি, তার অনেক আগেই আমাকে সিঙ্গাপুর থেকে অন্যানাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় আসতে হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে 'তুলাগি'-এবং সেখান থেকে পোর্ট মোর্সবি। যুদ্ধের বিভীষিকা।

যেদিন 'যুদ্ধ-শান্তি' ঘোষিত হলো, সেদিন এই মোর্সবি বন্দরেও উৎসব হয়েছিল, কিন্তু আমি দেখতে পাইনি। আমি তখন পাহাড়ের জঙ্গল-প্রান্তে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে। পোর্ট মোর্সবির পর্বতশ্রেণী ও বিশাল অরণ্যের বিপরীত দিকে সমুদ্রের আর এক অংশের তীরভূমি সংলগ্ন শহর 'বুনা'তে হয়েছিল তুমুল যুদ্ধ, আমাকেও থাকতে হবেছিল সেখানে। সৈন্যরা বলতো, গুয়াদালক্যানালের যুদ্ধের থেকে এই 'বুনা'র যুদ্ধ কম বীভৎস ছিল না। কিন্তু যুদ্ধে আহত হইনি, আহত হয়েছিলাম নিদারুণ 'টাইফাস'-রোগে। এই রোগ ও-অঞ্চলে এক সময় মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। উপযুক্ত ওষুধ এসে পৌঁছতে পারছে না, সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। অসহায় রোগীদের কাতর আর্তনাদ শুনতে শুনতে সে সময় আমার বা আমার সহকর্মী-দের মনের অবস্থা যে কী রকম হয়েছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কবে যে ওষুধ যুদ্ধে আগুন পার হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। ডাক্তার হিসাবে তখন যেন অসহায় উম্মাদের মতো নিজেরই হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করতো। যাইহোক, শেষে রোগ এসে ধরলো আমাকেই, যখন আমি একটা ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে রিট্রিট করে বা পিছু হটে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

পরে শুনেছি, একটা অকেজো জীপের ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে আমি উবু হয়ে পড়েছিলাম শিথিল দেহে, একেবারে অচৈতন্য ; আশেপাশে আমার কোনো

সহকারী বা সৈন্যসামন্ত কেউ ছিল না, অদূর থেকে ক্রমাগত ভেসে আসছিল মেসিন গানের শব্দ।

আমার যখন চৈতন্য হলো, তখন আমি জঙ্গলের মধ্যে কোনো এক কুঁড়েঘরে একটি খাটিয়ার ওপরে অতি সাধারণ বিছানায় শুয়ে আছি। আবছা বুঝতে পারছিলাম, ঘরের মধ্যে একজন নার্স ঘোরাফেরা করছে। আমি কি কোনো অস্থায়ী হাসপাতাল-ক্যাম্পের কোনো কুঁড়েঘরে শুয়ে আছি?

পরে, যখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো, মেয়েটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তখন ওর পোষাক দেখে বুঝলাম, নার্স নয়। সাধারণ একটা ছিটের খাটো গাউন পরা, মাথার চুল নিউগিনির বুনোদের মতো শক্ত শক্ত কোঁকড়া নয়। গায়ের রঙও তাদের মতো ঘোর কালো নয়, বলা যায় বাদামী। একটু লম্বাটে ধরনের চেহারা। পরে পরিচয় হতে জানিয়েছিল, সে পলিনেশিয়ান।

আসলে জীপে আমাকে ঐভাবে প'ড়ে থাকতে দেখে মেয়েটিই আমাকে কোনক্রমে টেনে নিয়ে আসে তার কুঁড়েঘরে। তারপরে তার অক্লান্ত সেবা-পদ্ধতির সাহায্যে আমাকে বাঁচিয়ে তোলে, পোর্ট মোর্সবির বড়ো হাসপাতাল থেকে ডাক্তারের উপদেশ মতো কিছু ওষুধ নিয়ে আসে।

সে ওষুধের শিশি আমি পরে দেখেছিলাম, নিচে একটুখানি তলানি পড়ে আছে। দেখেই বুঝলাম, সাধারণ ফিভার মিকচার, যা তখনকার দিনে সাধারণ সৈনিকদের দেওয়া হতো। ওতো টাইফাসের যথাযথ ওষুধ নয়! তাছাড়া সমগ্র দ্বীপে তখন টাইফাসের ওষুধ ছিল দুষ্প্রাপ্য। সে ওষুধ পাওয়াই বা যাবে কী করে? এবং তা-ই যদি হয়, তাহলে আমি বেঁচে উঠলাম কী ভাবে?

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী বলতে পারে। সে বললে,—আমি আমাদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করতাম।

—কেন!

—বাঃ! তোমাকে সারিয়ে তুলতে হবে না!

—কেন! হঠাৎ আমাকে সারিয়েই বা তুলতে গেলে কেন?

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকালো। আমি নাম দিয়েছিলাম পলি। পলি বললে,—অবাক কাণ্ড! জীপে তোমাকে ঐভাবে দেখতে পেয়ে তোমাকে ফেলে আসবো!

বললাম,—আমাকে কি চিনতে? দেখেছিলে আগে?

তিনি বললেন,—বোধহয় না। কী করে দেখবো?

—তবে?

প্রশ্ন শুনে সে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললো। বললে,—সত্যি বলবো? তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, বোধ হয় আমারই কোনো ভিজিটর। কতো অগুনতি লোক এসেছে! সবাইয়ের মুখ মনে রাখতে পেরেছি নাকি? এই পোষাকে সবাইকেই দেখতে একরকম।

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—তুমি কি তাহলে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—হ্যাঁ, যা ভাবছো, আমি তাই।

এরপরে ডায়রীতে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। দিনের পর দিন দুটি মন কেমন করে পরস্পরের কাছে আসতে লাগলো, তার বর্ণনা দিতে লিপিকার কোনো কার্পণ্য করেননি। কিন্তু একটা জায়গায় পলি ছিল অনড়,—পাথরের মতো ; ধরা ছোঁয়া দিতো না। একদিন কেঁদে বলেছিল, আমাকে কাছে টেনো না, আমার খারাপ রোগ।

কিরণ বলেছিলেন, আমি ডাক্তার, তোমাকে সারিয়ে তুলবো।

কিন্তু সে-সব বিস্তারের মধ্যে না গিয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পলি সেদিন কাছেরই কোনো এক জায়গা থেকে ক্লান্ত পায়ে ফিরে আসছিল, জীপের মধ্যে ওকে ঐভাবে দেখতে পেয়ে সঙ্গের বান্ধবীর সাহায্যে ওকে তুলে নিয়ে আসে। ও যে মিত্রপক্ষের সৈনিক, এটা পোষাক আর চিহ্ন দেখে বুঝেছিল, কিন্তু সে যে ডাক্তার, তার সংক্ষিপ্ত চিহ্ন দেখে বুঝবার মতো অভিজ্ঞতা পলির ছিল না।

যাইহোক, এরপরে কিরণ লিখে গেছেন অদ্ভুত কথা ঃ

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, আমার ফিরে যাওয়া উচিত। দেশে মা-বাবা-ভাই-আত্মীয়স্বজন সবাই আমার আসার পথ চেয়ে বসে আছে, তবু আমার যাওয়া হলো না! পলিকে কেন্দ্র করে আমি এক জগৎকে আবিষ্কার করলাম, এরা যুদ্ধের বলি। নানান দ্বীপ থেকে এদের টেনেটুনে নিয়ে এসে এ-দ্বীপ ও-দ্বীপ ঘোরানো হয়েছিল। ফলে, এদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল কুৎসিত এক উদগ্র ব্যাধি। এবং সে ব্যাধির প্রতিক্রিয়াও সাংঘাতিক। বিশেষ করে একদিন একটি মেয়েকে যখন পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে আত্মহত্যা করতে শুনলাম, সেদিন আর স্থির থাকতে পারিনি। এই দ্বীপে একটি আশ্রম করে ঐসব হতভাগিনীদের নিয়ে এসে কী করে জড়ো করবো, এই হয়ে দাঁড়ালো আমার দিবারাত্রের চিন্তা। শুধু জড়োই করবো না, তাদের চিকিৎসা করে ভালো করবো। কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, তবু আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। প্রাণ যায় সেও স্বীকার। পলি আমাকে দুরন্ত রোগ থেকে বাঁচিয়ে তুলে নতুন জীবন দিয়েছে ; সেই পলির মুখের দিকে তাকিয়ে তার ঋণশোধ করবার জন্যই আমাকে এই কাজ, তা সে যতই দুরূহ হোক, করে যেতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, কাজ নিয়ে দিনের পর দিন আমার কেটে গেছে, দেশে যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। এমনকি মাকে নিয়ম মতো চিঠি পর্যন্ত লেখবার অবসর পেতাম না। একাজে সাহায্য যেমন পেয়েছি, বাধাও পেয়েছি প্রচুর। একদল প্রাক্তন সৈনিক প্রমত্ত হয়ে একবার আশ্রমে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল, আমি রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দেওয়ায় আমাকে প্রচণ্ড প্রহারে শয্যাশায়ী করে দিয়েছিল, যদিও তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এই হতভাগিনীদের দলই একসঙ্গে তেড়ে এসে তাদের হটিয়ে দিয়েছিল। সরকার থেকে আমাকে জমি দেওয়া হয়েছিল, প্রচুর জমি। আর তাছাড়া অর্থও তাদের কাজ থেকে কিছু পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য।

আমি তখন শহরে গিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলাম। ঐ হতভাগিনীরাও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চাঁদা-ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়তো। এমনি করে কী ভাবে যে একদিন এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠলো, তা আমিই ভাবতে পারছি না। আমার সব থেকে বড়ো সান্ত্বনা আশ্রমের একটি রোগিনীও মারা যায় নি, তারা ধীরে ধীরে সেরে উঠে এই আশ্রমেরই কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। তারা কেউই আশ্রম ছেড়ে তাদের পুরানো জীবিকায় ফিরে যেতে চায়নি, আমার পুরস্কার এইখানে। তার ওপর পেলাম সুদূর বেলজিয়ামের এক সন্ন্যাসিনীকে, তিনিঃ সর্বস্বপণ করে এই আশ্রমের ভার তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু মুক্তি আমি পাচ্ছি কী? এই হতভাগিনীরা যখন 'ব্রাদার' বলে আমার দিকে তাকায়, তখন বুঝি তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকেই ঐ ডাক বেরিয়ে আসছে! সে ডাক উপেক্ষা করতে পারছি কই? কখনো কখনো সমুদ্রতীরে চলে যাই, যিনি নিজেকে 'সরসামস্মিসাগরঃ' বলে গীতায় উল্লেখ করেছেন, সেই তাঁকেই যেন দেখতে পাই। ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে যেন ক্রমাগত কাছে আসছেন, বলছেন, "মাভৈঃ, ভয় নেই। আমি আছি তোমার সঙ্গে।"

এখানে বলা দরকার, খুব সংক্ষেপেই আমি ডায়রীর বৃত্তান্ত লিখে গেলাম। কিরণ কিন্তু পাতার পর পাতা ব্যয় করে গেছেন—তুচ্ছ খুঁটিনাটি বর্ণনাও তিনি বাদ দেননি। কিন্তু কোথাও দেননি তিনি তাঁর নিজের পরিচয়। তাঁর দেশের ঠিকানা, নিজের পুরো নাম বা মা-বাপ-ভাইদের নাম।

কিন্তু তারপর? গেলেন কোথায় তিনি? কী হয়েছিল তাঁর পরিণতি?

উত্তর পেলাম পরদিন সিস্টার ডরেজের কাছ থেকে। তিনি জানালেন, "অস্বাভাবিক পরিশ্রমে তাঁর শরীরে আর কিছু ছিল না। তার ওপর তাঁর মন ছিল অতিরিক্ত সংবেদনশীল। এই হতভাগিনীদের দুঃখকষ্ট লক্ষ্য করে, এবং এদের মধ্যে যারা আশ্রমেই সন্তান প্রসব করেছিল, তাদের বিকলাঙ্গ কিম্বা অন্ধ বাচ্চাগুলোকে দেখে তিনি নাকি সহ্য করতে পারতেন না। স্নায়ুর ওপর এই আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবতঃ তাঁর হয়েছিল মৃগীরোগ। ডাক্তার হিসাবে তাঁর শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত ছিল। তা তিনি নেননি। ঐ রোগেই হঠাৎ তিনি জলে ডুবে মারা যান। বন্দরের সী-বীচে অনেকে স্নান করতে যায়, ডাক্তারও নেমেছিলেন একদিন কীসের খেয়ালে কে জানে,—আর উঠে আসেন নি! সম্ভবতঃ স্নানের সময় হঠাৎ ঐ মৃগীরোগেই তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, কেউ লক্ষ্য করেনি, জলে ডুব দিলেন আর উঠলেন না।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ডায়রীটি না পড়তে পারায় আমরা সরকারী সাহায্য নিয়েও তাঁর দেশে তাঁর ঠিকানায় কোনো খবর দিতে পারিনি। আশ্রমের মেয়েরা, বিশেষ করে তাঁর 'পলি' তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করে। তাঁর স্মৃতি-চিহ্নকে বহুমূল্য মণির মতোই রক্ষা করতে চায়, কিন্তু সেটুকুই ত সব নয়। তাঁর দেশের লোক—বাড়ির লোক হয়ত এখনো তাঁর পথ চেয়ে বসে আছে। আপনি তো ডায়রীটা পড়লেন, জানতে পারলেন ওঁর পুরো নাম ঠিকানা?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—না। ও-দুটোর একটা নিয়েও তিনি মাথা ঘামাননি। সারা ডায়রী জুড়ে শুধু ঐ হতভাগিনীদের কথা—আর যুদ্ধ নামক বিভীষিকার কথা বলে গেছেন,—আর যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের খোঁচায় মানুষের মধ্যকার দৈত্যরা বেরিয়ে আসে, দেবতারা পড়ে ঘুমিয়ে। সে অবস্থা একেবারেই কাম্য নয়!

॥ ৫ ॥

আমাদের জাহাজ পোর্ট মোর্স্‌বির পর টেরেস প্রণালী পেরিয়ে ধাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার উত্তরতম প্রান্ত থার্সডে দ্বীপে এসে থেমেছিল। ঠিক দ্বীপে নয়, দ্বীপ থেকে একটু দূরে নোঙর ফেলেছিল, তা-ও মাত্র চার ঘণ্টার জন্য। কী কারণে ঠিক মনে নেই, বোধ হয় যান্ত্রিক কোনো গোলযোগ ঘটেছিল। ওদিকে দিনের বেলার আকাশে 'ভেনাস' বা শুক্রগ্রহ জ্বলজ্বল করছে, আর দ্বীপের নাম 'থার্স ডে' বা বৃহস্পতি দ্বীপ! দ্বীপের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, শুধু এই নামটা আমার কাছে বড়ো অদ্ভুত লাগছিল। এই জাহাজের চীফ অফিসার বড়ো স্বল্পভাষী মানুষ, যখনই দেখি, হয় কাজে মত্ত, নয়ত নিজের ঘরে ব'সে রেডিও শুনছেন বা হাতের-কাছে-পাওয়া যে কোনো বই বা পত্রিকা পড়ছেন। ঘটনাচক্রে সেদিন 'থার্স-ডে' দ্বীপ দেখবার সময় আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু একটা বলা উচিত মনে করে মন্তব্য করে-ছিলাম,—থার্স ডে! কী অদ্ভুত নাম, তাই না?

চীফ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন,—হ্যাঁ, এরকম নাম আরও আছে। আর একটা দ্বীপের নাম আছে, 'সান ডে দ্বীপ',—সেটা এখান থেকে আমরা ঠিক দেখতে পাবো না। সবই বোধহয় ক্যাপ্টেন জেমস্‌ কুকের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত।

আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে চীফ বলে চললেন,—'গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ' থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার অনেক অংশই ক্যাপ্টেন কুক আবিষ্কার করেন। সে হচ্ছে ১৭৭০ সালের কথা। এখান থেকে দক্ষিণে—পূর্ব উপকূল ঘেঁষে ওঁর নামাঙ্কিত একটি শহরই রয়েছে,—'কুকটাউন'।

কথাগুলো ভদ্রলোক বলছিলেন আমাকে, কিন্তু মুখ ছিল দ্বীপের দিকে। রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন, কথাটা শেষ ক'রে সোজা হলেন, ভ্রু ঈষৎ কুঞ্চিত, বললেন,—দ্বীপের ঐ ভারী জঙ্গলটা লক্ষ্য করছো?

আমি ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। তটরেখায় ছোটখাটো শহর, যেমন হয় বন্দরের চেহারা, তেমনি। কিন্তু তার পটভূমিকায় বিরাট অরণ্যানী চোখে পড়ে। গাছপালা যেন দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। খুব উঁচু পর্যন্ত সে অরণ্যানী বিস্তৃত। মনে হচ্ছে ওখানে পাহাড় আছে, পাহাড়ের ওপর কিছু বড়ো গাছ—আমাদের অশ্বত্থ গাছের মতো মনে হয় যেন,—দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় জটলা করে।

চীফ বোধহয় গাছপালার ভক্ত। ভালো করে তাকাতে তাকাতে একসময় স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন,—আহ্! ইট্স্ নো মাউণ্টেন অ্যাট অল্! ও-গুলো পাহাড় নয়! গাছগুলোই অতো বড়ো।

গাছ!

চীফ বললেন,—হ্যাঁ—বিগ ট্রি—আমি 'সেডার' ভাবছিলাম। না—সেডার নয়—সেডার অতো উঁচু হবে না। ও-গুলো হচ্ছে 'কারি'-গাছ। এ-গাছগুলো তিনশো ফিট পর্যন্ত উঁচু হয়! কী ম্যাজেস্টিক! দেখেছো?

আমি ছাতার মতো ডালপালা মেলে দেওয়া গাছগুলো দেখবার চেষ্টা করছিলাম। এতো দূর থেকে ভালো বোঝা যায় না। গাছগুলো দিগন্তে দাঁড়িয়ে আছে। ও-গুলো 'থার্স ডে' দ্বীপের গাছ, না, মূল ভূখণ্ডের,—তা এখান থেকে বোঝবার উপায় নেই।

চীফ ততক্ষণ তাঁর ঘর থেকে দূরবীণ নিয়ে এসে ভালো করে দেখতে আরম্ভ করেছেন। চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন,—হোয়াট এ ফেট্! এর পরে যখন আসবো, তখন হয়ত দেখবো, বিগ-ট্রিগুলো আর নেই, কেটে ফেলেছে! মানুষের লোভ!

বলতে বলতে চলে গেলেন নিজের কেবিনের দিকে। আমি যে সঙ্গীর মতো পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, সে-কথা বোধহয় সেই সময় তাঁর মনেই ছিল না। অচিরে 'কারি'-বৃক্ষ একদিন কাটা পড়বে, এই দুঃখই তাঁকে তখন অভিভূত করেছিল বোধহয়।

যাই হোক, জাহাজ আবার একসময় নোঙর উঠিয়ে যাত্রা শুরু করলো। আরাফুরা সাগর পেরিয়ে যেতে কতো দ্বীপের পাশ কাটিয়েই না আমরা গিয়েছিলাম! 'তৌনিস্বার', 'গোয়া' 'আলোর' ইত্যাদি। তারপর 'ফ্লোরেস সাগর'-এ প'ড়ে আবার তুফানের মুখোমুখি। সেটা কাটিয়ে যখন জাহাজ বা আমরা একটু সুস্থ হয়েছি, তখন 'মাদুরা'-দ্বীপের কাছাকাছি হবার আগেই মুখ একটু ডানদিকে ঘুরিয়ে যেতে যেতে একসময় বোর্ণিও (এক অংশের আধুনিক নাম 'কালিমানতান' ঃ যেটা ইন্দোনেশিয়ার অধিকারে) কে ডানদিককার দিগন্তে রেখে একদিন এসে পৌঁছলাম সিঙ্গাপুর-বন্দরে। দূরে বোর্নিওকে দেখতে দেখতে আমরা যখন চলছিলাম, তখনো ঘটনাচক্রে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন চীফ অফিসার। বোর্ণিও সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। বললেন,—'রাজা ব্রুক'-এর নাম শুনেছো? জেমস্ ব্রুক?

—না!

তিনি বললেন,—বোর্ণিওর সঙ্গে এই মানুষটির নাম জড়িয়ে আছে। ডাচরা এখানে কিছু খুঁটি গেড়েছিল বটে। সে হলো ১৬০৪ সালের কথা। কিন্তু দুশো বছর ধরে তারা খুব একটা ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেনি। দ্বীপের লোকেরা বাধা দিয়েছিল প্রচণ্ড। বাধা দিয়েছিল জলদস্যুরা। যে ভদ্রলোক এখানকার অধিবাসীদের ওপর প্রথম কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন,

তিনি ডাচ্ নন, একজন ইংরেজ : জেমস্ ব্রুক। আগে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করতেন। এখানে এসে তিনি একদিকে রুখে দিয়েছিলেন জলদস্যুদের, অন্যদিকে সভ্যতা বিস্তার করতে চেষ্টা করেছিলেন এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে। এ হচ্ছে ১৮৩৮ সালের কথা, যখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। ১৮৩৯ সালে তিনি যখন 'সারাওয়াক' (বোর্নিওর একটি অঞ্চল)-এ নামলেন, তখন ওখানকার সুলতানের বিরুদ্ধে নরমুণ্ড শিকারী দুর্ধর্ষ 'ডায়াক' জাতিরা বিদ্রোহ করেছে। জেমস ব্রুক সুলতানের হয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সুলতান ব্রুককে নিজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় রাজা ব্রুক।

যাহোক আমি বলছিলাম সিঙ্গাপুরের কথা। অতীতে যখন ভারতের সঙ্গে মালয়ের বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক লেনদেন চলতো, তখন এই 'সিংগাপোর'-এর নাম ছিল 'সিংহপুর।' কে যেন লিখেছিলেন, 'কলকাতা বন্দরের তুলনায় এ-বন্দর অন্তত দশগুণ বড়ো।' কথাটা মিথ্যা নয়। এর 'বাংকারিং' বা জাহাজে কয়লা বোঝাই করবার বিপুল আয়োজন দেখে প্রথমেই সে-কথা মনে হয়। তীরে যেন সারি সারি কয়লার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন চীনে মজুরদের সংখ্যাই ছিলো বেশি, এখন কী হয়েছে জানি না।

সিঙ্গাপুর বিষুবরেখার কাছে, সেজন্য খুবই গরম হবার কথা। কিন্তু সিঙ্গাপুর প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বীপ, এর চারদিকেই জল আর জল—তাই আব-হাওয়া যাকে বলে 'নাতিশীতোষ্ণ।'

বিরাট বন্দর, বিপুল কর্মচক্র, বন্দরে জাহাজের পর জাহাজ ভিড়েছে, কিছু জেটিতে, আর কিছু বয়ায় বাঁধা প'ড়ে আছে, জেটিতে স্থান পায় নি। আমরাও সাধারণ জেটিতে জায়গা পাইনি, পেয়েছিলাম 'বাংকারিং'-জেটিতে। আমাদের দরকার জ্বালানী, অর্থাৎ কয়লা এবং সাধারণ খাদ্যদ্রব্য।

সত্যি কথা বলতে কী, সিঙ্গাপুর দেখার আমার আগ্রহ ছিল সব থেকে বেশি। এবং এখানকার 'প্রশাসনিক ব্যবস্থা' তুলনায় অনেক সুশৃংখল বলে আমার দিককার কাজকর্ম শেষ হতে সময় বেশি লাগলো না। দোসী আর মাসুদকে টেনে নিয়ে যখন শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, তখন সন্ধ্যা হতে অনেক দেরি।

বন্দরের মধ্যে জাহাজও যেমন আছে, তেমনি একটু বড়ো ধরনের ক্ষুদে ছই-ওয়ালা পানসীও আছে। পানসী আছে, পালতোলা বড়ো নৌকো 'জাঙ্ক'-ও আছে। জাহাজ আর পানসী-টানসি নিয়ে সর্বক্ষণ বন্দরটা যেন গমগম করছে। বন্দরে যারা পানসী ও নৌকো নিয়ে আসে, তারা অধিকাংশই চীনা। বন্দরের এলাকা ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়তে যে রিক্সার ঝাঁক চোখে পড়লো, সে-গুলিও টানছে চীনা। অবশ্য মালয়ী ও চীনাদের চট্ করে এক নজরে আলাদা করে চেনা যায় না। কিছু কালো মালয়ী আছে, যাদের চট্ করে চিনতে অসুবিধা হয় না,

কিন্তু ফর্সা মালয়ীদের চীনাদের মধ্য থেকে খুঁজে বার করতে দেরি লাগে। পরে শুনেছিলাম, এখানকার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই চীনা।

সিঙ্গাপুর-সম্পর্কে আমার আগ্রহ বেশি এই কারণে যে, বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে, আমার এক সম্পর্কিত মামাতো দাদা (যাঁদের প্রতিষ্ঠানের বিশাখাপত্তন-শাখায় আমি তখন কর্মে নিযুক্ত) তাঁদের জাহাজী-কাজের শাখা-অফিস খোলার জন্য সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন কলকাতা থেকে জাহাজে করে। যাতায়াতে তাঁর লেগেছিল তেইশ দিন। এই তেইশ দিন তিনি মাত্র পাঁউরুটি খেয়ে কাটিয়েছিলেন। তিনি পোষাকে 'সাহেব' হলেও ভিতরে ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ছোঁয়াছুঁয়ি-বাছবিচার ইত্যাদি তাঁর ছিল খুব বেশি, তদুপরি খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল সাংঘাতিক। সিঙ্গাপুরে তিন-চারদিন অবশ্য ভালো হোটেলে পছন্দমতো খাবার খেয়েছিলেন, কিন্তু জাহাজে পাঁউরুটি ছাড়া আর কিছুই না। তাঁর এই শুধু পাঁউরুটি-খেয়ে-থাকা নিয়ে আমাদের ভ্রাতাভগ্নী বা বন্ধুমহলে অল্পবিস্তর রসিকতা চলতো বলে কথাটি আমার আজও মনে আছে।

তাঁর কাছ থেকে কিছু বর্ণনা শুনেছিলাম সিঙ্গাপুরের। যে-কথা শুনে-ছিলাম, সে-কথা আজ সবাই জানেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর কথা কারুর অজানা নয়, অজানা নয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা। কিন্তু আমি যখনকার কথা লিখছি, তখন পুরোনো হয়ে যায়নি ও-সব প্রসঙ্গ। তাই আমি সঙ্গীদের নিয়ে রিক্সা করে প্রথমেই ঢুকলাম 'সিটি হল' কোথায়, সেটি খুঁজে বার করতে। আজ সিটি হলের সামনে নেতাজীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে বলে শুনেছি, কিন্তু সেদিন যখন সিটি হলের সামনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন কোনো মূর্তি বা স্মারক-স্তম্ভ চোখে পড়েনি। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে নেতাজী রাসবিহারীর সঙ্গে এই সিটি হলের সামনের প্রাঙ্গণেই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। এই সিঙ্গাপুরেই নেতাজীর 'দিল্লী চলো,—চলো দিল্লী'র আহ্বান! এই সিঙ্গাপুরেই তাঁর অভিবাদন-বাণী,—'জয় হিন্দ্!' এই সিঙ্গাপুরেই তাঁর বিখ্যাত উক্তি,—'রক্ত দিন, আমি দেবো স্বাধীনতা'।

দোসী আর মাসুদকে প্রথমে বলিনি কোথায় যাচ্ছি। মাসুদ একটু স্থূলকায় বলে সে একটা আলাদা রিক্সায় পিছনে পিছনে আসছিল। তারা প্রথমে ভেবে-ছিল, সিঙ্গাপুর আমার জানা শহর এবং সে-জন্য স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনো আকর্ষণীয় স্থানে বুঝি তাদের নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সিটি হলের সামনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পেঁছে রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে যখন নেতাজীর কথা বললাম, তখন তারাও সসম্ভ্রমে সবকিছু শুনতে লাগলো।

এইখানে একটু ব্যক্তিগত কথা বললে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার ঐ দাদা সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে যখন তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল, তার মধ্যে রাসবিহারী বসুর প্রসঙ্গ ছিল। আমি ওঁর কাছ থেকে শুনে রাসবিহারী

সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা আরম্ভ করি। ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার কিছু পুরানো কপি আমাদের বাসায় দিল, তাতে রাসবিহারীর প্রসঙ্গ ছিল। আর তাছাড়া বিশাখাপত্তনে আসবার আগে কলকাতায় থাকাকালীন কিছু পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে নেতাজী—আজাদ হিন্দ-ফৌজ-রাসবিহারী সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করছিলাম। তখন আমি কেন, প্রত্যেক বাঙালীই বোধহয় এসব কথা শুনতে আগ্রহী ছিলেন। ঠিক এই সময় ঘটনাচক্রে চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘের একটি উৎসবে সবান্ধব যোগদান করতে গিয়ে হঠাৎ আলাপ হয়ে গিয়েছিল রাসবিহারীর অনুজ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসুর সঙ্গে। তিনিও তখন উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁদেরও আদি বাড়ি ছিল চন্দননগরে। আমি তাঁর কাছ থেকে রাসবিহারী-প্রসঙ্গে বহু তথ্য শোনবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। আজ অবশ্য সে-সব তথ্য বাঙালী পাঠকের জানা, তবু সে-সময় ও-সব কথা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। সেজন্য সিঙ্গাপুরে গিয়ে প্রথমেই সিটিহলের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। বিজনবাবু আর একটি জায়গার নাম করেছিলেন, ‘বিদাদারি।’ এই ‘বিদাদারি’র সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। না দিলেও ঘুরে ফিরে আবার আমরা সিটি হলে ফিরে এসে-ছিলাম। তখন মাসুদ আর দোসিও এ-প্রসঙ্গ শুনতে বিশেষ উৎসুক হয়ে পড়েছিল। আজাদহিন্দ্ বাহিনীর সংগঠনে রাসবিহারীর অবদানের কথা সবাই জানেন, তার পুনরুল্লেখ এখানে করার দরকার নেই। ব্রিটিশ শক্তির শক্ত ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছিল ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি। সে-সময় মালয়—সিঙ্গাপুরে জাপানীসেনা যে পাশবিক বর্বরতার সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা মেলা ভার। লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, ইত্যাদির ঘটনা ছিল ব্যাপক। পরে একটি বিবরণ মারফৎ জানা গিয়েছিল, মালয়-সিঙ্গাপুর মিলিয়ে ধর্ষিতা হয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার নারী ; যার মধ্যে মারা গিয়েছিল চার হাজার। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, কোনো ভারতীয় নারীর অসম্মান তারা করে নি, কোনো ভারতীয় পুরুষও হয়নি লাঞ্ছিত। এর মূলে ছিলেন রাসবিহারী, এবং পরে আজাদহিন্দ্ ফৌজের তৎকালীন সামরিক অধিনায়ক মোহন সিং। তখনো নেতাজী জার্মানী থেকে সাবমেরিনে ক’রে এসে পৌঁছান নি। সে ব্যবস্থারও মূলে ছিলেন রাসবিহারী।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মোহন সিং-এর কৃতিত্বের কথাও স্মরণ করা উচিত। সিঙ্গাপুর রণাঙ্গনে ব্রিটিশ-পক্ষে যে ভারতীয় সৈন্য ছিল, বিপক্ষে দাঁড়ানো ‘আজাদহিন্দ্ ফৌজ’-এর সামরিক অধিনায়ক মোহন সিং-এর হৃদয়স্পর্শী ভাষণে সেই সৈন্যরা দলে দলে এসে এ-পক্ষে যোগদান করেছিল।

অথচ এই মোহন সিং-ই পরে কর্তৃত্বের মোহে আসক্ত হয়ে রাসবিহারীর বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেন নি। তখন আজাদহিন্দ ফৌজ-সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। দোসী ও মাসুদকে বিশদ করে সব বললেও এখানে তা বলার দরকার নেই। কারণ, মোহন সিং-এর হঠকারিতার কথা আজকের বাঙালী

পাঠকের অজানা নয়। তবে সিঙ্গাপুরকে কেন্দ্র করে সেদিন যে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সংক্ষেপে কিছু বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। মোহনসিং ও তাঁর কয়েকজন অনুচরের প্ররোচনায় সেদিন অনুপস্থিত রাসবিহারীর ছবি ও জাতীয় পতাকা ভারতীয় সামরিক ও অসামরিক জনতা পুড়িয়ে দিয়েছিল, এমন কী, আজাদহিন্দ্ ফৌজের নথিপত্র জ্বালিয়ে দিতেও তারা ইতস্ততঃ করেনি। শেষ পর্যন্ত এই সিঙ্গাপুরের 'বিদাদারি'তেই রাসবিহারী ১৯৪৩ সালের ৮ই জানুয়ারি আজাদহিন্দ্ ফৌজের ছোট-বড়া সব কর্মচারীদের এক সভা আহ্বান করলেন। যারা সভায় এসেছিলেন, তারা অনেকই রাসবিহারীকে আগে দেখেননি। বিরুদ্ধবাদীরা যে-ভাবে রাসবিহারী সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন, তাতে তাঁদের কাছে রাসবিহারী ছিলেন এক ভীষণ প্রকৃতির ও আকৃতির মানুষ। কিন্তু 'ভীষণ আকৃতি'র বদলে তাঁরা গাড়ি থেকে নামতে দেখলেন এক দীর্ঘকায় শীর্ণকায় বিধ্বস্ত বৃদ্ধকে। মনে রাখতে হবে, তখনো সুভাষচন্দ্রের পদার্পণ ঘটেনি। সমস্ত গোলমাল মিটিয়ে একতাবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানিয়ে সেই সভায় রাসবিহারী বলেছিলেন, মোহনসিং না থাকতে পারে, আমিও না থাকতে পারি, তাই বলে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেন বন্ধ হবে? দেশ কারও একার নয়, একা কেউ দেশ স্বাধীন করতে পারে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? প্রথমে নানারকম কটূক্তি, পরে অশালীন ভাষায় গালাগালি জনমণ্ডলী থেকে রাসবিহারীর উদ্দেশে বর্ষিত হতে লাগলো। সেই জনগর্জনে রাসবিহারীর কণ্ঠ ডুবে গেল। তিনি চুপ করে রইলেন। যেন স্তব্ধ, সমাহিত মূর্তি! দুটি চোখে ফুটে উঠলো অশ্রুবিন্দু। সেই বিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই দৃশ্য দেখে হঠাৎ জনতা নির্বাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এধারে-ওধারে শুরু হলো মৃদু গুঞ্জন। তারপরেই হঠাৎ জনগণ চিৎকার করে উঠলো, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ! রাসবিহারী বোস কি জয়!' যারা তাঁর ছবি পুড়িয়ে একদিন পদদলিত করেছিল, তারা আজ তাঁরই গুণগ্রাহী হয়ে দাঁড়ালো মুহূর্তে। পরবর্তীকালে আজাদহিন্দ ফৌজের মেজর বীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'মুক্তিসেনার ডায়রী'তে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখে গেছেন, 'নিতাই গৌরের সহিষ্ণুতার কাহিনীর মতোই এ-কাহিনী অদ্ভুত।'

কিন্তু সিঙ্গাপুরের কাহিনী আরও আছে। আজাদহিন্দ বাহিনীর পুনর্গঠনে রাসবিহারী যখন ব্যস্ত, তখন এই সিঙ্গাপুরে বসেই তিনি খবর পেলেন তাঁর একমাত্র পুত্র অশোক (মাসাহিদে) যুদ্ধে মারা গেছে! এই নিদারুণ শোকের বার্তা কাউকে জানতে দিলেন না তিনি। বুকের ব্যথা বুকে রেখেই তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন। ফলে আক্রান্ত হতে লাগলেন হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায়। কিন্তু তবুও বিশ্রাম নেই। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'I am a Fighter! One Fight more!' এই প্রসঙ্গেই বিশেষ করে মনে পড়ে যায়।

সিঙ্গাপুরের 'ক্যাথে থিয়েটার গ্রাউণ্ড' আমরা অবশ্য সেদিন খুঁজে বার

করেছিলাম। এই ক্যাথে থিয়েটার-ময়দান ভারতীয়দের কাছে আজ মহাতীর্থ সন্দেহ নেই। সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে সুমাত্রায় এসে পেঁছলেন। সুমাত্রা থেকে সিঙ্গাপুরের পথের দূরত্ব আর কতটুকু? কিন্তু সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে রাসবিহারীর কাছে না পেঁছে আকাশ-পথে চলে গেলেন সরাসরি টোকিও। সেখানে জাপানী মন্ত্রী ও সমর-দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার পর সিঙ্গাপুরে এসে রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এই সিঙ্গাপুরেই ক্যাথে থিয়েটার-ময়দানের জনসভায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদহিন্দ ফৌজ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব ও সভাপতিত্ব গ্রহণ করলেন। রাসবিহারী জনতার উদ্দেশে বললেন, আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, টোকিও থেকে আপনাদের জন্য আমি কী এনেছি? এনেছি এই উপহার—সুভাষচন্দ্র বসু।

আদর্শ কর্মীর মতো নেতাজীর হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে তিনি টোকিও ফিরে গেলেন নিজের শাশুড়ী শ্রীমতী কোকো সোমা (স্ত্রী বহুপূর্বেই মারা গিয়েছিলেন) ও কন্যা তেৎসু (ডাক নাম, তেতিকো)-র কাছে। কঠিন পীড়ায় তিনি তখন আক্রান্ত। তারপরে নেতাজী-প্রেরিত দুঃসংবাদ 'মুক্তিসেনা কোহিমা ও ইম্ফলে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত,'—শোনবার পর তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি জাপানী জনসাধারণের প্রিয় 'সেনসেই' বা 'মাষ্টারমশাই' এবং আমাদের আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু মহাপ্রয়াণ করলেন।

কিন্তু ইতিহাস ছেড়ে এখন আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ক্যাথে থিয়েটারের সামনে বসে বসে গল্প করতে করতে কখন যে রাত হয়ে গেছে খেয়াল করিনি। তাড়াতাড়ি উঠে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রিক্সা ধরলাম। রাতের সিঙ্গাপুর তখন অভিসারিকার রূপ নিয়েছে। আজ আমরা জাহাজে 'খাবোনা' বলে নোটিস দিয়ে এসেছিলাম, তাই শহরের কেন্দ্রে এসে আমরা রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে 'সৌখিন' বা 'ফ্যাসানেবল্' পাড়ায় এলাম। লোকজনে যেন গম গম করছে। দোসী বললে,—এযেন মেলা বসে গেছে! রাত হয়ে গেলেও মেয়েদের আনাগোনার বিরাম নেই। অভিজাত মহিলারা 'শপিং' অর্থাৎ কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন। রেডিও-র সরব চিৎকার, রিক্সা, গাড়ি ইত্যাদির ভিড়, তার মধ্য দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথিকের চলাচল! একটা কথা প্রচলিত আছে—'Singapore never sleeps!'…দেখে মনে হলো, কথাটা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। চীনা শ্রমিক-মেয়েরা প্যান্টের ওপর লম্বা জামা প'রে দ্রুত পথ হাঁটছে, হাঁটছে সাটিনের ঝকমকে পোষাক পরে মালয়ী মেয়েরা, তারমধ্যে শাড়ি-পরা ভারতীয় মেয়েদেরও দেখা যায়।

যাইহোক, আমরা একটা খানদানী হোটেল দেখে ঢুকলাম। আজকাল কলকাতায় চাইনীজ খাবার 'চাউ-মেন'-এর চাহিদা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু তখন কলকাতার মানুষ ওতে তেমন অভ্যস্ত হয়নি। আমরা তখনকার দিনে সেই 'চাউমেন' খাবো বলে একটি ছোট টেবিল ঘিরে তিনজনে বসলাম। তখনকার

দিনে ডলার (মালয়-ডলার অবশ্য) হিসাবে রীতিমত খরচাই হয়েছিল আমাদের। বেশি খরচা হবার আরেকটা কারণ ছিল। ঐ হোটেলে ছিল ক্যাবারে নাচ। বলা বাহুল্য, ক্যাবারে-নাচ দেখার অভিজ্ঞতা সে-ই আমার প্রথম। প্রায় নিরাবরণ মহিলাটি (মালয়ী, না, স্থানীয় চীনা, কে জানে?) নাচছেন একটা মঞ্চে, মাঝে মাঝে আমাদের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছেন, আর তাঁর ওপর এসে পড়ছে রঙ-বেরঙের আলোর বৃত্ত, কিন্তু আমি 'হাঁ' হয়ে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে থাকলেও, দোসী বা মাসুদ, যারা এই সব ব্যাপারে প্রায় প্রতি বন্দরেই উৎসুক হয়ে ওঠে, তারা নিস্পৃহ হয়ে বসে রইলো। খাওয়া তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা বললে,—দূর ভালো লাগছে না, উঠে পড়া যাক!

মহিলাটি ঘুরে ফিরে স্টেজে গিয়ে হাজির হলেই পুরো আলো জ্বলে উঠছিল। সেইরকম একটা ফাঁক খুঁজে নিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম,—ব্যাপার কী! এমন অভাবনীয় দৃশ্য ছেড়ে—

দোসী বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—প্যাথে-গ্রাউণ্ডে যে প্রসঙ্গ হচ্ছিল, সেসব শোনবার পর আর কি ওসব ভালো লাগে? জাহাজে ফিরে চলো। ফিরে গিয়ে তোমার কাছে সব শুনবো। আজ দেখছি তুমিই 'হিরো'।

কিন্তু জাহাজে ফিরবো কী? জাহাজ কয়লা-বোঝাই শেষ করে জেটি পরিত্যাগ করে একটি 'বয়া'য় গিয়ে বাঁধা পড়ে আছে, অন্য জাহাজকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে। আমাদের জাহাজের মতো বহু জাহাজই ঐ রকম বয়া অবলম্বন ক'রে জলে ভাসছে, তাদের ভিড়ে আমাদেরটি খুঁজে বার করবো কী করে?

সমাধান করে দিলো সামপানের মাঝি। জাহাজের নাম বলতেই সে ঠিক আমাদের পেঁৗছে দিলো। গ্যাঙওয়ে নামানো ছিল, আমরা যথারীতি উঠে গেলাম জাহাজে।

আমরা যখন সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম, তখন ওখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। মালয়ী এবং স্থানীয় চীনাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াচ্ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপানীদের কাছ থেকে সিঙ্গাপুর ফিরে পাবার পর থেকেই। 'অর্থনৈতিক পুনর্গঠন'-এর নামে তারা ক্রমশই বিভেদ-সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠছিলো। কিন্তু জনতার জাগ্রত অংশও চুপ করে ছিল না। মূল চীন ভূখণ্ডের মুক্তি-আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় মালয়েও গণসংগঠন তৈরি হয়ে গেরিলা-যুদ্ধের মাধ্যমে তারা সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানবার প্রয়াস করছিল। সিঙ্গাপুরের আলোঝলমল 'ক্যাবারে নৃত্য' শোভিত নৈশজীবন বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে এসব বোঝবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। কিন্তু একেই বলে বোধ হয় 'দৈববাণী'। জলে দাঁড় ছপছপ করে ফেলে সামপানের চীনা মাঝি আমাদের জাহাজে নিয়ে চলেছে, আর আমরা তার কাছেই ছইয়ের বাইরে বসে (কারণ, ছইয়ের মধ্যে মাঝির স্ত্রী আর দুটি বাচ্চা ঘুমোচ্ছিল।

সামপানেরই বুকে ওদের ঘরবাড়ি আর সংসার। সেজন্য সামপানের আকৃতি তুলনায় একটু বড়ো।) আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলাম ইংরেজীতে। আলোচ্য বিষয় ছিল, ক্যাবারে নাচ। মাঝিটি যে ইংরেজী বুঝতে পারে এটা জানবো কী করে? হঠাৎ দৈববাণীর মতোই সে বলে উঠলো,—দেয়ার ইজ আদার সিংগাপোর অলসো।

এবং এই 'আদার সিংগাপোর' সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না, যদি না সে মুখ খুলতো। আমাদের আগ্রহ দেখেই সে ঐ তথ্যগুলো আমাদের পরিবেশন করেছিল।

মালয়ের পরের ইতিহাস এখন আমরা সবাই জানি। ১৯৫৩ সালে ১৫০০ মাইল জুড়ে মূলতঃ ব্রিটিশের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল একটি ফেডারেশন, যার নাম দেওয়া হলো মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড থেকে শুরু করে সুদূর ফিলিপাইন পর্যন্ত ছিল এর বিস্তৃতি। সিঙ্গাপুর দ্বীপও মালয়েশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল ১৯৫৫-র জুলাই পর্যন্ত। একটা তথ্যে দেখা যায়, 'Singapore's population had made the Chinese the majority group in Malaysia'। এই কারণেই প্রধানতঃ মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন সিঙ্গাপুর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য, যদিও মালয়ের 'জোহোর'-প্রদেশের একটি অংশের সঙ্গে বিরাট এক নবনির্মিত সেতুর মাধ্যমে যুক্ত। এই সেতুর সঙ্গে 'পাইপ লাইন' লাগানো রয়েছে। সেই পাইপ করে জোহোর পর্বত থেকে পানীয় জল আসে সিঙ্গাপুরে।

॥ ৬ ॥

সিঙ্গাপুরের পর জাহাজ যখন মালয়ের সুবিখ্যাত 'পেনাং' বন্দরে ধরলো না, তখন অনেকে বলাবলি করছিল, তাহলে নিশ্চয় 'রেঙ্গুন' যেতে হবে। কিন্তু প্রত্যাশীদের হতাশ করে রেঙ্গুনে জাহাজ না গিয়ে গ্রেট নিকোবরের পাশ কাটিয়ে পেঁছালো গিয়ে আন্দামানে। নিকোবরের কাছাকাছি হতেই আবার তুমুল ঝটিকার মুখে গিয়ে পড়লো জাহাজ। আমাদের 'সী-সিক্‌নেস'-এর বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, ক্যাপ্টেন স্থির করেছিলেন সোজা দেশের মাটিতে গিয়ে ভিড়বেন। কিন্তু জাহাজের যান্ত্রিক দুর্বলতা, বিশেষ করে একটি বয়লারের গোলমালের জন্য তাঁকে মত পরিবর্তন করে 'নানকোরী'র কিনার ঘেঁষে কার নিকোবরের 'কাহানা'র কূলে নোঙর ফেলে রাত কাটিয়ে পরদিন গিয়ে পেঁছতে হয়েছিল দক্ষিণ আন্দামানের 'পোর্টব্লেয়ার' বন্দরে।

গ্রেট্ নিকোবরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন ঝড়ের উথাল-পাথাল সামলে নান্‌কোরী দ্বীপের হারবার বা বন্দরে গিয়ে জাহাজের 'অসুখ' পরীক্ষা করা হবে বলে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন তখনো দেশের মাটিতে ভিড়বার আশা ছাড়েননি, তাই নান্‌কোরীতে না থেমে সোজা এগিয়ে

চললেন। তারপরে জাহাজের অসুখ খুব সোজা নয় মনে হওয়ায় একটু খতিয়ে দেখার জন্য কার নিকোবরে এসে থামলেন। আকাশজুড়ে তখনো মেঘ, যদিও সমুদ্র মোটামুটি শান্ত। ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে একটু 'খতিয়ে' দেখার পর স্থির হলো, উপায় নেই, জখমী বয়লারকে সামলানোর জন্য পোর্টব্লেয়ার গিয়ে অন্ততঃ দিন তিনেক বিশ্রাম না নিলে আর উপায় নেই।

আমাদের উপরি লাভ হলো একরাত্রির জন্য 'কার নিকোবর' অবলোকন। 'কাহানা'তে শিপিং অফিস আছে। খবর পেয়ে নৌকোয় করে অফিসটির কর্তা জাহাজে এসে উঠলেন। স্থানীয় মানুষ। খৃষ্টান। এঁর মুখে শুনলাম যে ঝড়ে আমরা বিপর্যস্ত হচ্ছিলাম, তার কারণ নিছক ঝড় নয়, ঝড়ের এক অপদেবতা 'টারাই' আমাদের পিছনে লেগেছিলেন। ধর্মে খৃষ্টান, অথচ 'অপদেবতা'য় বিশ্বাস কেন, একথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে আর বলা হলো না। তাঁর এ মন্তব্যে তিনি যে অত্যন্ত 'সিরীয়াস,' একথা তাঁর মুখ দেখে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। বয়স আন্দাজে ভদ্রলোককে দেখায় তরুণ। কাজ শেষ হলে আমার ঘরে ওকে টেনে আনলাম। সেলুনে গিয়ে খেয়েও এলাম আমরা একসঙ্গে। চেহারা সিঙ্গাপুরে-দেখা মালয়ীদের মতো, ফর্সা চেহারা, উচ্চতায় পাঁচফুটের একটু বেশি হবে। খুব ফুর্তিবাজ, মিশুকে লোক। নাম জিজ্ঞাসা করতে হেসে বলেছিল, আসল নাম বেশ বড়ো, মনে রাখতে পারবে না, ফিলিপ বলে ডেকো।

ফিলিপ পোর্টব্লেয়ারের স্কুলে লেখাপড়া করেছে, ইংরিজি মোটামুটি জানে, বলতে, পড়তে, লিখতে জানে, নইলে এজেন্ট কোম্পানীর স্থানীয় অফিসের ম্যানেজারের চাকরি পেলো কী করে? হিন্দীও একটু আধটু জানে, 'কেয়সা হ্যায়?' 'আচ্ছা', 'তন্দুরস্তি', 'কোশিশ', 'নিম্বুপানি', 'মুরুগা' 'মছ্‌লি', 'গোস্ত্‌'-এসব কথা তার বাক্যাংশের মধ্যে প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছিল।

দোসী প্রশ্ন করলো,—ওয়েল ফিলিপ, এ-দ্বীপে তোমাদের খৃষ্টানদের সংখ্যা কতো?

ফিলিপ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো,—সিক্স থাউজ্যাণ্ড স্যার, ইন দিস লিট্‌ল আইল্যাণ্ড। আমাদের নেতার নাম নিশ্চয় শুনেছো,—বিশপ রিচার্ডসন? তিনি এখানকারই লোক।

ওই দ্বীপের ইতিকথা পর্যন্ত ফিলিপের নখদর্পণে। ওর কাছ থেকেই জানলাম, ভারতের দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল নিকোবর দ্বীপ জয় করেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে। পুরো দ্বীপটাকে তাঁর সময়ে 'নাক্‌কাভরম' বলা হলেও, 'গ্রেট নিকোবর'কে আলাদা ক'রে বলা হতো 'নাগদ্বীপ', এবং 'কার নিকোবর'কে বলা হতো 'কারদ্বীপ'। 'নাক্‌কাভরম' কথাটার মানে হচ্ছে 'নগ্ন বা নাগাদের দেশ।' সে-হিসাবে কোথাও কোথাও 'নগ্নদ্বীপ' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

যাই হোক, রাত প্রায় দশটা নাগাদ ফিলিপ নেমে তার নৌকো করে ঢেউয়ে

নাচতে নাচতে চলে গেল। ভোরবেলা আমাদের জাহাজ ছাড়বে বলে তোড়জোড় চলেছে, আমরা গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। দেখি, তীরের কাষ্ঠনির্মিত ছোট্ট জেটিতে অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফিলিপ হাত বাড়িয়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে। তার পাশে একটি নিকোবরী মহিলা দাঁড়িয়ে, বোধহয় ওর বউ। তরুণী। তার পরণে মালয়ীদের মতো ছাপা কাপড়ের লুঙ্গি, গায়ে সাদা ব্লাউজ, দু-হাতে দুটি ক'রে চুড়ি, গলায় হার। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে, কাণে রিং।

সমুদ্র তখন শান্ত। এত শান্ত যে সমুদ্র বলে চেনা যায় না, যেন চিল্কা হ্রদের জলের মতো স্থির। শুধু তীরে গিয়ে ঢেউ যখন পড়ছে, তখন সাদা ফেনার রেখা দেখা যায়। কয়েকটা টালির ছাদওয়ালা পাকাবাড়ি দেখা গেলেও অদূরের কুটিরগুলো বড়ো অদ্ভুত। আমাদের গ্রামের ধানের গোলা যেমন হয়, তেমনি গোলাকার-স্তূপের মতো দেখতে, কিন্তু আকারে বড়ো, আর ঘরগুলো সাত-আট ফুট উঁচুতে খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।

জাহাজ তখন ছেড়ে যাচ্ছে। আমরাও হাত নাড়ছি, ওরাও হাত নাড়ছে। বউটির সঙ্গে আলাপ হয়নি আমাদের। কিন্তু ফিলিপ আমাদের কথা তাকে বলাতে সে-ও আমাদের 'বন্ধু' করে নিয়েছে মনে মনে। ওদের দ্বীপভর্তি নারকেল গাছ। অতি ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা, প্রায় গায়ে-গায়ে ঠেকানো। ফিলিপ বলেছিল, আমাদের প্রধান খাদ্য যেমন ভাত, ওদের প্রধান খাদ্য তেমনি নারকেল। ওর কাছ থেকে আরও জেনেছিলাম, কার নিকোবরের জনসংখ্যার অনুপাত অন্যান্য দ্বীপের থেকে বেশি। যুদ্ধের সময় জাপানীদের একটা ছাউনি পড়েছিল ঐ দ্বীপে। তারা পাকা রাস্তাও তৈরি করেছিল কয়েকটি; পাকা দেওয়াল-ঘেরা টালির ছাদওয়ালা ঘরও তাদের তৈরি। নেতাজী এসে এই দ্বীপের নামকরণ করেছিলেন 'স্বরাজ'। ১৯৪৫ সাল থেকে সরকারের সঙ্গে চুক্তি ক'রে আকুজি এ্যাণ্ড কোম্পানী নিকোবরীদের সঙ্গে ব্যবসা করছে। এই দ্বীপের সাধারণ লোক, বিশেষ করে গ্রামের লোক, এখনো টাকা-পয়সার ব্যবহার জানে না, নারকেল-এর বদলে দরকারী জিনিসপত্তর কিনে নেয়। 'বিনিময়'-পদ্ধতি এখনো চলছে, তবে বেশি দিন আর নয়, সভ্যতার ঢেউ যত এসে দ্বীপে লাগবে, ততই ও-সব আদিম অভ্যাস বদল হয়ে যাবে,—এই ছিল মিস্টার ফিলিপের অভিমত।

যাই হোক, ভোরে রওনা হয়ে আন্দামান অর্থাৎ পোর্ট ব্লেয়ারের জেটিতে গিয়ে যখন আমাদের জাহাজ ভিড়লো, তখন বিকেল হয়ে গেছে,—বলা যায়, পড়ন্ত বিকেল। এক ধরনের নরম গোধূলির আলো চারদিকে প'ড়ে অপরূপ এক স্নিগ্ধতা ফুটিয়ে তুলেছে। সিঙ্গাপুরের হৈ-চৈ-রৈ-রৈ আর সমারোহের তুলনায় এ-যেন নিস্তব্ধ-নিঝুম একটি ছোট গ্রাম। দু-পাশে পাহাড় সমুদ্রের বুক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার মধ্য দিয়ে পথ করে আমরা জেটিতে ভিড়লাম। জেটির পিছনেই পাহাড়ী পথটা চোখে পড়ে—খানিকটা উঠে ভিতরের দিকে মিলিয়ে গেছে!

যথারীতি এজেণ্টের লোক এলো। এলো পুলিশ, কাস্টমস্। কাগজপত্র সই-সাবুদ ক'রে মিনিট পনেরোর মধ্যেই চলে গেল। বোধহয় ভদ্রলোকদের তাড়া আছে, অফিসের ঝামেলা চুকিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চান। জাহাজে খাওয়া-দাওয়া হয় সন্ধ্যার সময় এ-কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু এ'দেরকে ক্যাপ্টেন সান্ধ্য-ভোজনে আমন্ত্রণ জানালেও তাঁরা সবিনয়ে 'দুঃখিত—অপারগ', এই কথা জানিয়ে 'কাল আসবো' বলে চলে গেলেন। পিছনে পিছনে সৌজন্যের খাতিরে আমিও তাঁদের এগিয়ে দেবার জন্য জেটিতে নামলাম, এবং জেটিতে নামলাম বলেই ঘটনাটা ঘটলো, নইলে কী হতো, কে জানে। ওঁদের বিদায় দিয়ে ফিরবো বলে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় একটি কণ্ঠস্বর যেন আমার পায়ে তৎক্ষণাৎ শিকল পরিয়ে দিলো : এই যে লেখক মশায়, যাচ্ছেন কোথায় ?

একে তো এক যুগ বাদে বাংলা ভাষা এসে 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল', তার ওপরে 'লেখক' বলে এই সুদূর আন্দামানে সম্বোধন করে কে ?

তাকিয়ে দেখি আমারই বয়সী একটি দোহারা চেহারার ফরসা ব্যক্তি, ঘোর খয়েরী প্যাণ্টের ওপরে সাদা বুশসার্ট প'রে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় পাখির বাসার মতো একরাশি চুল, চিরুণীর শাসনেও তেমন সজুত হয়নি।

চিনতে হয়ত আরও একটু দেরি হতো, কিন্তু ঐ পাখির বাসার মতো রাশি-কৃত চুলই ওকে চিনিয়ে দিলো মুহূর্তে। সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—তুই !

এগিয়ে এসে আমাকে দু-হাতে বিজয়া দশমীর সম্ভাষণের মতো জড়িয়ে ধরলো, বললে,—হ্যাঁরে—আমি। অনিমেষ বাগচি—পিতার নাম সুরেশ বাগচি—সাকিন—

—চুপ কর—চুপ কর !—বলে উঠলাম,—এখানে কী করছিস ? গভর্ণমেণ্ট তোকে দ্বীপান্তরে পাঠালো কবে ? হাতে-পায়ে বেড়ি পরেছিস তো, নাকি !

অনিমেষ বললে, নারে ভাই—'বেড়ি' পরার সৌভাগ্য এখনো হয় নি। আর গভর্ণমেণ্ট পাঠাবে ? সেই বরাত করেছি কী ? পাঠিয়েছে এক প্রাইভেট কোম্পানী,—তাদের দেশলাই কারখানা আছে এখানে—তারই একটি জোরালো কিসিমের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঘুরছি আর কী !

—তার মানে তুমি অফসর-লোগ !—বললাম,—আয় জাহাজে আয়—এখন আমাদের নৈশ ভোজের টাইম—চলে আয়—একসঙ্গে খাবো—তুই আমার গেস্ট।

জেটির অন্যান্য লোকজন আমাদের কাণ্ড দেখছিল। জেটিতে অনিমেষ একাই ছিল না, আরও অনেকে ছিল। কেন, কে জানে ! এ-তো প্যাসেঞ্জার জাহাজ নয় যে, আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে তাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাতে আসবে !

কিন্তু 'অনিমেষ' কি সেই ছেলে ? সে কিছুতেই জাহাজে 'খেতে' আসবে না, আমিও ছাড়বো না, রীতিমত হাত ধ'রে টানাটানি চলতে থাকলো কিছুক্ষণ। জাহাজের 'ডেক'-এর কাছ থেকে মাসুদ দেখছিল ব্যাপারটা। জেটির লোকজন আরও ঘন হয়ে এলো। চারপাশের এতগুলি কৌতুহলী দৃষ্টির জন্যই হার মানলো অনিমেষ, বললে—চল্। তোর সঙ্গে পারবে কে ?

ওপরে যেতেই মাসুদ ওর অপরিচিত অনিমেষকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, —হ্যালো মিস্টার, ওয়েল কাম। বাঙ্কিং-এর বাকি অংশটুকু জাহাজে হয়ে যাক, আমরা একটু দেখি।

আমি অনিমেষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম মাসুদের। অনিমেষ এইবার উত্তর দিলে মাসুদের মন্তব্যের। বললে,—জেটিতেই হেরে গেলাম বাঙ্কিং-এ; আর কি তার জের টানা চলে? তবে হেরেও সুখ আছে, কলেজের বন্ধু কি না!' কলেজে খুবই অন্তরঙ্গ ছিলাম দুজনে।

মাসুদ বললে,—ভেরি গুড! আসুন, আগে খাবার টেবিলে গিয়ে বসা যাক।

খাবার টেবিলের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। শুধু একটা ব্যাপার দেখে অনিমেষ বোধ হয় অবাকই হয়েছিল। আমি 'চিকেন' নিলাম না দেখে ও বললে, সে কী! এখনো মুরগি ধরিস নি?

একটু হেসে বললাম, না। কলেজ-লাইফে কতো চেষ্টা করেছিস তোরা খাওয়াতে, রেস্টুরেন্টে বসে? পেরেছিলি?

অনিমেষকে একটু চিন্তান্বিত দেখালো, বললে,—তাইতো! তোকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কী খাওয়াবো। এখানে তো মুরগি ছাড়া—

আমাদের বাংলা কথাবার্তার মধ্যে এইখানে দোসী একটু বাধা দিলে। বলা বাহুল্য, দোসীও আমাদের টেবিলের শরিক ছিল এবং তার সঙ্গেও অনিমেষের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।

সে বললে,—হোয়াট্ ইজ ইট্! এনি প্রবলেম?

সবটা শুনে তারপরে হেসে উঠলো, বললে,—ও-তো 'পাক্কা' জাহাজী নয়, তাই 'ফুড-হ্যাবিটে' বহুৎ গড়বড় আছে। হিলসা-রুহি-চিংড়ি ছাড়া আর কোনো মাছ খাবে না, 'মাটন' ছাড়া আর কোনো মাংস খাবে না, ওকে ভেজিটেরিয়ানই বলতে পারো। কারণ জাহাজে ওসব পদার্থ সবসময় থাকে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরে এসে দেখা গেল, তখনো গোধূলির আলো আকাশ থেকে মিলিয়ে যায় নি। অনিমেষ জানালো, এখানে আকাশ পরিষ্কার থাকলে গোধূলি একটু বেশিক্ষণই বিরাজ করে।

আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে অনিমেষ বললে—আজ আর শহর কী দেখবি, রাত হয়ে যাবে। এখানে আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই সব নিঝুম হয়ে যায়, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

বললাম—তাহলে কাল সকালেই বেরুনো যাবে। আমার ঐ বন্ধুরাও সঙ্গে থাকবে। বুঝলি?

ও বললে—সেইজন্যই তো কথাটা বলছি। যে বাড়ি, তিনজনের জায়গা হওয়া মুশকিল। ওরা সকালে যাবে, তুই আমার সঙ্গে চল্—রাতটা আমার ঘরে থাকবি—কোনো অসুবিধে হবে না।

বললাম—সর্বনাশ! রাত বারোটার পর জাহাজের বাইরে থাকার নিয়ম নেই। ঠিক আছে চল্, বারোটার আগে ফিরে এলেই হবে।

অনিমেষ বললে,—বললাম না, রাত আটটা—সাড়ে-আটটার পর সব নিঝুম হয়ে যায় ? অতো রাতে ঘোরাফেরা খুব 'সেফ'-ও নয়।

—কেন ?

ও বললে—এটা যে কয়েদীদের উপনিবেশ ছিল, তা ভুলে যাচ্ছিস কেন ? বঙ্গদেশ থেকে বিপ্লবীরা এই কালাপানি পার হয়ে এসেছিল বটে, সেইসঙ্গে মারাত্মক খুনি বা ডাকাতরাও কি আসে নি, বিশেষ ক'রে অন্যান্য জায়গা থেকে ? তাদের অনেকে এখানেই থেকে গেছে, দেশে আর ফিরে যায় নি।

—তাহলে ?

অনিমেষ বললে,—রাতের বেলা ছুটি নে না ? দ্যাখ্‌না চেষ্টা ক'রে ?

খুবই আশঙ্কা ছিল ছুটি পাবো না বোধহয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন খুশমেজাজে ছিলেন, বললেন,—ঠিক আছে, কাল সকালে রিপোর্টিং। কেমন ?

—ধন্যবাদ স্যার—গুড নাইট্‌।

চলে এলাম অনিমেষের সঙ্গে। দোসীদের বললাম,—কাল এসে তোমাদের নিয়ে যাবো।

মাসুদ বললে,—ওল্ড ম্যানকে ম্যানেজ করে ছুটি নিলে কী ক'রে ?

দোসী মন্তব্য করলে,— প্যাপুয়ার পোর্ট মোর্সবির কথা মনে নেই ? ওখান থেকেই ওল্ড ম্যানকে হাত করেছে।

হেসে বললাম,—তাহলে আমার ক্ষমতা আছে, স্বীকার করো ?

—ও-ইয়েস।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

জেটি ছেড়ে ওপরের পথে হাঁটতে হাঁটতে বললাম,—কতদূরে তোর বাসা ?

ও বললে,—চল্‌ না—বেশি দূর নয়।

বললাম,—পায়ে যখন বেড়ি পরিস্‌ নি, তখন একাই আছিস্‌ বুঝতে পারছি। কেমন কাটছে দিন ?

বললে,—প্রথম-প্রথম মন্দ লাগেনি। সেলুলার জেল—বিপ্লবীদের গৌরব গাঁথা—কিম্বা ম্যারিনা পার্কে পায়চারি করা—অথবা একটু দূরে 'করবাইনস্‌ কোভ'-এ দলবল মিলে সমুদ্রের নিরালা তটে গিয়ে চড়ুইভাতি করা,—অথবা কখনো তুষনাবাদ অঞ্চলে গিয়ে আমাদের দেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে গিয়ে একটু-আধটু সমাজসেবা করা—কিন্তু তার পর ? তারপরেই হাঁপিয়ে উঠতে হয় !

— লাইব্রেরি-টাইব্রেরি নেই ?

বললে—'অতুলস্মৃতি' বলে বাঙালীদের একটা আড্ডা ছোটখাটো যে গ'ড়ে ওঠেনি এমন নয়, কিছু বই-ও আছে, মাঝে মাঝে থিয়েটার-ফিয়েটারের চেষ্টাও করা হয়। বিশেষ করে এখানে যিনি কমিশনার আছেন, তিনি বাঙালী, মিঃ ঘোষ, তাঁর উৎসাহে কিছু কিছু উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে জাগছে। তাঁর স্ত্রী

মিসেস্ ঘোষ, এখানকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক আর গান করাবার আয়োজন করছেন,—কিন্তু তবুও কি মন ভরে ?

কথা বলতে বলতে আমরা পোর্টব্লেয়ারের আসল বিকিকিনি বা 'মার্কেটিং সেন্টার'-এ এসে পড়লাম। সামনেই ঘড়ি-ঘরের স্তম্ভটি দেখা যাচ্ছে।

ও বললে,—কাল সব ঘুরে ঘুরে দেখিস। আজ বাড়ি গিয়ে সারারাত গল্প।

—সেলুলার জেলটা আগে দেখবো, বুঝলি ?

ও বললে,—বাঙালী যারা আসে, সবাই তাই দেখতে চায়। আমাদের কাছে তো 'দ্বীপান্তর' মানেই ছিল আন্দামানের বিভীষিকা! জানিস? বীর সাভারকরকে যখন সেলুলার জেলের গেটে নিয়ে এলো, তখন তাঁর কাগজপত্র দেখে দুঁদে লালমুখো অর্থাৎ ব্রিটিশ জেলারেরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল, বলেছিল,—মাই গড! ফিফ্‌টি ইয়ার্স!

—তার মানে—পঞ্চাশ বছরের জেল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ,—অনিমেষ বললে,—সেলুলার জেলে আর 'দ্বীপান্তর'-এ এখন অবশ্য কেউ আসে না। এর কটি 'সেল' বা 'খুপরী' ছিল জানিস? ৬৯৮টি। গত যুদ্ধের সময় জাপানীদের অধিকারে থাকার কালে ১৯৪১ সালে দারুণ ভূমিকম্প হয়ে এই জেলের অনেক ভাঙচুর হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে নেতাজী এসে এর নামকরণ করেছিলেন 'শহীদ' দ্বীপ। এর থেকে ভালো নামকরণ আর কী হতে পারে? এখন এটা হাসপাতাল হয়েছে, মিউজিয়াম হয়েছে, কিন্তু তখনকার দিনগুলির কথা ভাবতো? 'চাবুক' মারার যন্ত্রটা তোকে দেখাবো। ওখানে উপুড় করে বেঁধে সপাং সপাং করে চাবুক মারা হতো। অত্যাচারে অত্যাচারে বহু বন্দী পাগল হয়ে গিয়েছিল, বহু বন্দী আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছিল!

আমরা হাঁটছিলাম। জিমখানা মাঠের কাছে ওর ছোট্ট কাঠের একখানা বাড়ি। শুনলাম, কোম্পানী থেকে ব্যবস্থা করা ছিল বলে রক্ষে, নইলে পোর্ট ব্লেয়ারে এসে চট্ করে আস্তানা পাওয়া অত সোজা নয়। অবশ্য কমিশনার খুব চেষ্টা করছেন, নতুন-নতুন ট্যুরিস্ট লজ ইত্যাদি করার অনেক পরিকল্পনা আছে, যেমন আছে পানীয় জল আনবার ব্যবস্থার পরিকল্পনা।

ওর বাড়ির বারান্দায় একটি বর্মী মেয়েমানুষ বসে ছিল পাশে একটি হ্যারিকেন নিয়ে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। বর্মী লুঙ্গি আর সাদা জামা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আর গায়ের রঙও কালো। কালো রঙ কি বর্মীদের হয়?

অনিমেষ তার সঙ্গে হিন্দীতেই কথা বলছিল। বোঝা গেল মেয়েটি ওর বাসায় কাজকর্ম করে। ওর দেরি দেখে বসেছিল, নইলে অনেকক্ষণ আগেই চলে যেতো। ও বোধ হয় ওকে রান্নাঘরে গিয়ে কফি তৈরি করতে বলে থাকবে। মেয়েটি তাই চলে না গিয়ে পাশের একটি ঘরে ঢুকলো হ্যারিকেনটা উঠিয়ে নিয়ে। আমরা ওর ঘরে ঢুকলাম। কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্পটা শোভা পাচ্ছে। কাঠের সব আসবাবপত্র। বেতের টেবিল আর ইজিচেয়ারও আছে।

বললে,—এটা বসার ঘর। পাশেরটা শোবার। বি কম্‌ফর্টেব্‌ল্‌। কফি খেয়ে শোবার ঘরে গিয়ে একেবারে বিছানায় গড়াবো।

ওর পাশ ঘেঁষে গদি-দেওয়া কাঠের সোফাটায় বসলাম, বললাম,—নিরালা-নিঃঝুম—দারুণ তো!

ও বললে,—হ্যাঁ, লেখকদের পক্ষে আইডিয়াল! কিন্তু আমাদের পক্ষে?

বললাম,—হ্যাঁরে, মেয়েটি বর্মিজ, না?

অনিমেষ হাসলো, বললো,—মেয়েটি আন্দামানী। খাস এখানকার মেয়ে। কিছু কিছু আন্দামানী রক্তে সভ্যতার রক্ত ঢুকেছিল। এ-মেয়েটিও তাই, মা ছিল আন্দামানী জংলী, বাপ ছিল বাইরের লোক। হয়ত বা এখানকার বাসিন্দা হয়ে যাওয়া কোনো প্রাক্তন কয়েদী। কে বলতে পারে?

একটু পরেই মেয়েটি বেতের তৈরি ট্রে-তে করে দু-কাপ কফি আর কিছু বিস্কুট নিয়ে এলো। অনিমেষ তাকে বললো,—রাতে আমরা খাবো না, রুটি-গুলো তুই বাড়ি নিয়ে যা। শুধু চিংড়িগুলো এখানে দিয়ে যা।

—চিংড়ি?

—হ্যাঁরে—আজ বাজারে চিংড়ি উঠেছিল। খেয়ে দেখ্‌ না—গলদা চিংড়ি।

সুতরাং চিংড়ির কারিও এলো। খেতে খেতে গল্প করছিলাম। মেয়েটি বিদায় নেবার পর বললাম,—নাম কীরে—মেয়েটির?

বললে,—নোভা। ওর কাহিনী তোকে বলবো, তোর কাজে লাগতে পারে।

—বল?

—হ্যাঁ,—অনিমেষ বললে,—কাহিনী এখানে অজস্র ছড়ানো—তুলে নিয়ে মালা গাঁথতে পারলেই হলো! এক একটি মানুষ এক-একটি কাহিনী!

বললাম,—আশ-পাশের দ্বীপগুলিতে ঘোরাঘুরি করেছিস?

অনিমেষ উত্তর দিলো,—২০৩টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান, কটাতে ঘুরবো বল্‌? পাশের রস্‌ আইল্যাণ্ড? ওখানেই আগে কমিশনার এবং হোমরা-চোমরারা থাকতেন ব্রিটিশ আমলে, এখন পরিত্যক্ত। ওখানেই একবার গিয়েছিলুম। আর উঠেছিলাম একটা পাহাড়ে। এখানকার অর্থাৎ পোর্টব্লেয়ার-অঞ্চলের দ্বীপের সব থেকে উঁচু পাহাড় মাউন্ট হ্যারিয়েটে—উচ্চতায় প্রায় দু-হাজার ফিট। ওখান থেকে দৃশ্য অবশ্য সত্যিই দেখবার মতো।

—তাই নাকি! তাহলে কাল নিয়ে চল্‌ না?

অনিমেষ কফি শেষ করে সিগারেট ধরালো, বললে,—অত সোজা নয় ব্রাদার —দলবল না নিয়ে আমরা ওসব জায়গায় যাই না। জঙ্গুলে জায়গা তো? ভয় আছে।

—কিসের ভয়! বাঘ-টাঘ?

ও হেসে বললে,—না—না—জন্তুজানোয়ারের ভয় নয়—মানুষেরই ভয়।

এক ধরনের জংলী মানুষ, তাদের আজও বশ করা যায়নি—সভ্য, কাপড়চোপড়-পরা মানুষ দেখলেই তারা তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে, এমনি আক্রোশ!

—কেন?

উত্তর দিলো—ওরাই তো এখানকার আদিবাসী। সভ্য মানুষ যত এসেছে, তত ওরা লড়াই ক'রে তাদের হঠাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারবে কেন? তাই সভ্যরা যত এগুচ্ছে, ওরা তত পেছিয়ে যাচ্ছে। পেছিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু আক্রোশ যাচ্ছে না। ওদের বলে, জারোয়া বা জারুয়া।

অনিমেষ একটু থেমে তারপরে বললো—শুনবি তাহলে? এখান থেকে খানিকটা দূরে জঙ্গল কেটে বসতি হয়েছে—জায়গাটার নাম তুষনাবাদ—ওখানে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল। তাদের একটি অল্পবয়সী বউ—কী করতে যেন জঙ্গলের ধারে গিয়ে পড়েছিল—কাঠকুটো কুড়োতে হয়তো—তখন গোধূলিকাল—সন্ধ্যা অবশ্য হয়নি—গাছের আড়াল থেকে তীর মেরে তাকে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে!

সোজা হয়ে উঠে বসেছি, বললাম,—বলিস কী!

ও বললে,—এই তো মাসখানেক আগেকার ঘটনা—হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল—বাঁচলো না!

আমি চুপ করে রইলাম। ও-ও নিস্তব্ধ। তারপরে ওর শোবার ঘরে যখন পাশাপাশি খাটে এসে পা ছড়িয়ে বালিশ কোলে করে বসে আরাম করে সিগারেট ধরিয়েছি, তখন প্রসঙ্গটি আবার উঠলো। বললাম,—এই অনিমেষ, কাল আমাকে ঐ ওখানে, মানে, তুষনাবাদে নিয়ে যাবি?

—ওরে বাবা! জীপ দরকার হবে।

—পাবি না?

অনিমেষ বললে,—কাণ্ড অনেক। ফ্যাক্টরি থেকে ছুটি নিতে হবে—জীপ জোগাড় করতে হবে! তার থেকে কাল শহর দ্যাখ্ না—অতুল স্মৃতি-মন্দির-ম্যারিনা—আমাদের 'স-মিল', মিউজিয়াম, সেলুলার জেল।

বললাম,—পরশু দেখবো। তুই দ্যাখনা ভাই—যদি কাল তুষনাবাদ যাওয়া হয়?

—দেখি।

সকালে জাহাজে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করাই সার হলো। একটি চিঠির খসড়া তৈরি, টাইপ করা, আর এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে কিছু টাকার ব্যবস্থা করা। ব্যস—দশটাতেই জাহাজ ছেড়ে বেরুতে পারলাম। দোসী আর মাসুদকে নিয়ে সেলুলার জেলে গেলাম। খুপরি খুপরি ঘরের সারি—তিনতলা। দেখলাম, বেত মারার যন্ত্র—ফাঁসির দড়ি—ইত্যাদি, দেখতে দেখতে রুদ্ধশ্বাস হতে হয়। অনিমেষ দ্বীপের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করেছে, 'মেভারিক' জাহাজ সংক্রান্ত ঘটনা বললো, ১৯১৫ সালের ঘটনা। বাঘা যতীন—রাসবিহারী বসু—এম-এন-রায়দের পরিকল্পনা। বালী দ্বীপের কাছাকাছি

কোনো জায়গা থেকে জার্মানী অস্ত্র বোঝাই করে দেশে যাবে মেভারিক জাহাজ। পথে আন্দামান আক্রমণ করে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্ত করতে হবে, এই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু সে-পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়, ইত্যাদি।

এখান থেকে গেলাম আমরা ওর ফ্যাক্টারতে। সেখান থেকে জীপে ক'রে কয়েক মাইল দূরে অরণ্য-রাজ্য তুষনাবাদ অঞ্চলে। এখানেই ক্ষুদে ট্রেন দেখি। দার্জিলিং রেলওয়ের মতো ক্ষুদে ট্রেনের লাইন পাতা। তাতে করে ছোট এঞ্জিন ছোট ছোট ফ্লাট-ওয়াগনে করে বড়ো বড়ো কাঠের টুকরো বয়ে নিয়ে চলেছে। এক জায়গায় দেখলাম, হাতিতে সেই কাঠের গোলাকার খণ্ডগুলিকে ওপর থেকে শুঁড় দিয়ে গড়িয়ে নিচে ফেলছে। জাহাজের ডোরিকের মতো ছোট ক্রেনে করে সেই কাঠের গুঁড়ির খণ্ড ওয়াগনে তোলা হচ্ছে।

তুষনাবাদ একটা উপত্যকা মতন। মুলি বাঁশ কেটে সেই বাঁশের দরমা দিয়ে ঘর করে নিয়েছে উদ্বাস্তুরা। নিজেরা খেটে ধান ক্ষেত করেছে। আমরা যখন গেছি, তখন কিছু ছেলে একজন মাতব্বরের কাছ থেকে সড়কি ছোঁড়া শিখছিল। বেত দিয়ে তৈরি ঢাল, বেতেরই তীক্ষ্ম সরকি। আমাদের দেখে তারা কাছে এলো। মাঠে যারা কাজ করছিল, তারাও মুখ তুলে তাকিয়েছে। এবং আমরা দুজন বাঙালী শুনে তাদের আগ্রহ বেড়ে গেল। আমরা খুঁজে খুঁজে সেই বউটির স্বামীকে বার করলাম। তখনো তার স্বাভাবিকতা ফিরে আসে নি। চুপচাপ থাকে। পড়শীরা ওকে স্নান করিয়ে আনে, পড়শীরাই ওর ভাত রেঁধে দেয়। ওর আর কেউ ছিল না। স্বামী আর স্ত্রী—এই দুজনেই সবার সঙ্গে 'মহারাজা' জাহাজে চ'ড়ে আন্দামানে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করলেও কথা বলে না, বিশেষ করে লোকজন দেখলে কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। লোকটি গেল না আমাদের সঙ্গে জঙ্গলের সেই কিনারের জায়গাটাকে দেখাতে, যেখানে ওর বউকে তীর মেরেছিল জারুয়ারা। সে বসে একটা দা দিয়ে যেমন বাঁশ চিরে দরমা বানাচ্ছিল, তেমনি বানাতে লাগলো। আমাদের নিয়ে গেল অন্য লোকেরা।

অরণ্যের এ অংশটা তত গভীরও নয়। সমতল শেষ হয়ে একটু উঁচুতে উঠে ক্রমে ক্রমে পাহাড়ে মিশে গেছে, সেখানে জঙ্গল নিবিড় হতে পারে—এখানে নয়। রেল লাইন জঙ্গলের ভিতরে আরও এগিয়ে গেছে। অনিমেষ চাথাম জেটির লাগোয়া বিরাট কাঠের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, সেজন্য কাঠ ও চেনে। একটি পড়ে থাকা মহীরুহের কাটা কাটা খণ্ডগুলির দিকে এগিয়ে গেল। গুঁড়ির কাটা অংশটা একেবারে ধবধবে সাদা। বললে,—এখানেই ঘটেছিল ঘটনাটা। ধবধবে গাছের গুঁড়িগুলো দেখতেই বোধ হয় মেয়েটি এগিয়ে এসেছিল। গাছটি দেখবার মতো নয়? একে বলে 'হোয়াইট চুংলাম'। মরা গাছ, তাই কাটা প'ড়ে গেছে।

কী হে, কাজ হচ্ছে এখানে?

ওরা বললে,—না বাবু।

অনিমেষ কথা প্রসঙ্গে নানান গাছের নাম করতে লাগলো,—হোয়াইট ধ্প, চুই, কোকা, মার্বেল-উড, ইত্যাদি। আমার সেদিকে মন ছিল না। আমি ভাবছিলাম তর্ণী বউটির কথা। হয়ত বনের এই শোভা দেখার আগ্রহ ছিল তার, নইলে একা একা 'বসতি' ছেড়ে এতটা পথ সে আসবে কেন? অবশ্য খ্ব দ্র পথ নয়, ঐ তো দেখা যাচ্ছে, একটু নিচে - সমতল ভূমিতে—এক ঝাঁক কুটির —ছিন্নম্ল মান্ষদের নতুন বসতি।

আমরা বেশি ক্ষণ থাকতে পারিনি ওখানে। কারণ, জীপ ছেড়ে দিতে হবে তাড়াতাড়ি। আমরা চারজন আজ আবার অনিমেষেরই অতিথি। সেজন্য তাড়াতাড়ি ফিরতে হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সময়ে পেঁছানো গেল না। জিমখানার প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে যখন আমরা অনিমেষের বাড়ির সামনে নামলাম, তখন বেলা প্রায় দ্টো। আমাদের খাবার আগলে বসে আছে অনিমেষের 'নোভা'।

আমাদের ছেড়ে দিয়ে জীপ চলে গেল। বসবার ঘরেরই এক প্রান্তে খাবার টেবিল সাজানো। প্লেট, জলের গ্লাস, জাগ ইত্যাদি। অনিমেষ নোভাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলো,—ঘরমে খানা দে আয়া, কি নেহী?

—নেহী।

অনিমেষ বললো,—তো আভি চলা যাও—তুরন্ত —জলদি!

নোভা বোধ হয় অন্র্প আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢ্কে ওর যা নেবার, তা গোছাতে লাগলো।

আমরা যে যার চেয়ারে বসবার পর অনিমেষ বললে—ফ্রেন্ডস, প্লিজ। হেল্প্ ইয়োরসেল্ভস্।

—ও শিয়োর!

আমার দিকে ফিরে অনিমেষ বললে,—ওকে ছ্টি দিলাম। নইলে ওর ঘরের লোকের খেতে দেরি হয়ে যাবে।

রান্নার আইটেম কম ছিল না। চাপাটি, ঘি-ভাত, তার পরে লাউ-চিংড়ি, পেঁপের ডালনা, মাছের ম্ড়ো দিয়ে ডাল, র্ইমাছ ভাজা, নারকেলের কুচি দিয়ে তৈরি একবাটি মিষ্টি। এছাড়া ম্রগির ঝোল ছিল ওদের জন্য।

বললাম,—তোমার নোভা তো দিব্যি রান্না করে!

অনিমেষ বললে,—শিখেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর দোসী বললে,—নাইস ডিসেস। থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ বাগচি।

সোফায় বসে যে যার সিগারেট ধরালাম। মাসুদ বললে,—তোমার বন্ধ্কে রাত পর্যন্ত রাখতে পারো মিঃ বাগচি, কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, হ্কুম আছে। এর ইতিহাসটা একটু বলো।

অনিমেষ বললো,—১৮৫৭ সালের সিপাহী-জাগরণের বন্দীদের নিয়ে ১৮৫৮ সালে এই বন্দীনিবাস গ'ড়ে ওঠে। তখন জাহাজ ভিড়বার এই এবার্ডিন জেটি আর ঐ Penal settlement—এ ছাড়া কিছ্ ছিল না। কর্তারা

থাকতেন রস-আইল্যাণ্ডে। তারপরে এলেন বাংলার বিপ্লবী বন্দীরা দফায় দফায়। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। তারপরে ১৯২২-২৩ এ আসে এখনকার কেরালা (তখনকার 'মালাবার')-র ১৯২১-র মোপ্‌লা বিদ্রোহের প্রায় পাঁচ হাজার বন্দী। ওদের অনেকে এখানেই চিরতরে বাসা বেঁধে ছিল। তারপরে ১৯২৬ এ আসে বার্মা থেকে 'কারেন'-বন্দীরা। আসলে এটা বন্দীদেরই উপনিবেশ ছিল তখন। যুদ্ধের সময় জাপানীরা দখল করেছিল আন্দামান। তারাও অনেককে বন্দী করে সেলুলার জেলে রেখেছিল, অনেককে এখানে ফাঁসি দিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে—বন্দীরা আর আসছে না বটে- আসছে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর দল। আর আমরা যারা এসেছি ? কেউ চাকরি করতে, কেউ ব্যবসা করতে। সব মিলিয়ে এখানকার মানুষরা হচ্ছে পাঁচমিশেলী। আদিবাসী আছে নানান রকম, তার মধ্যে সেন্টিনেলী আর জারুয়ারা হিংস্র। পাল্টা আক্রমণ করে ওদের মেরে না ফেলে ওদের আস্তে আস্তে বশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যাইহোক, বেলা তিনটে নাগাদ ওরা বেরিয়ে পড়লো। ওদের আমরা ঘড়িঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। ফেরার পর জিমখানা মাঠের প্রান্তে এসে অনিমেষ একটু দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে,—সিগারেট খাবি ?

—দে।

সিগারেট ধরালাম, বললাম,— হঠাৎ দাঁড়ালি কেন ?

অনিমেষ বললে,—তোর বন্ধুদের কাছে এখানকার ইতিহাস বলতে বলতে মন হঠাৎ সেই ফেলে আসা দিনগুলিতে চলে গেল। মনে আছে তোর সঙ্গে আমার কবে ছাড়াছাড়ি হলো ? ১৯৪১ সালে কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের দিনটির কথা মনে পড়ে ? সেই তোতে আমাতে পাগলের মত ছুটে জোড়াসাঁকো চলে গিয়েছিলাম ? মনে পড়ে সেই এলিট সিনেমার পাশের 'ওয়াই-ডাবলিউ-সি-এ-' হল্‌টির কথা, যেখানে ঐ সালেরই নভেম্বরে তোর লেখা নাটক হয়েছিল ? তার পরেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তুই চাকরি পেয়ে চলে গেলি ঘাটশিলায়, আর আমি চলে এলাম চাকরি নিয়ে আন্দামানে। তখন যুদ্ধেরই চাকরি-- যদিও আমি ঠিক মিলিটারি ছিলাম না। থাকলে নির্ঘাৎ আমাকে বন্দী করতো জাপানীরা। জাপানীদের আন্দামান দখল করার হিড়িকে অনেকেই পালিয়েছিল—আমি পারিনি— আমি এখানকার এক সিন্ধী ভদ্রলোকের দয়ায় তাঁর গদিতে চাকরি পেয়েছিলাম। তাঁর দোকান ছিল ঘড়িঘরের কাছে। তাঁর দোকান এখনো আছে, তিনি অবশ্য বেঁচে নেই, ছেলেরা ব্যবসা দেখছে। তাঁর দোকান ছিল, কাঠের ব্যবসাও ছিল, 'উইমকো' ফ্যাক্টরিতে কাঠ চেরাই করে চালান দেওয়া। এই জিমখানার মাঠে দাঁড়িয়ে ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরের শেষ তারিখে নেতাজী যে বক্তৃতা করেছিলেন, তা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। কিন্তু তিনি আসবার আগে জাপানীদের আমলে এখানে এমন একটি নৃশংস ব্যাপার দেখেছিলাম, যা মনে পড়লে আজও আমি শিউরে উঠি।

জানিস ভাই, সেদিন ছিল ছুটির দিন। ঘরে বসে বই পড়ছি, এমন সময় ঢ্যাঁড়া শুনলাম, যে যেখানে আছো এখ্খুনি ছুটে জিমখানার মাঠে জড়ো হও!

চমকে উঠলাম। কয়েকজন জাপানী সৈন্য মার্চ করে চলেছে। ওদের নিয়ম জানতাম। ঢ্যাঁড়া পড়লে যে যেখানে যেভাবে থাক, তখ্খুনি ছুটে যেতে হবে। নইলে বেত, বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো, কিম্বা বুটের লাথি। সেজন্য পাজামা আর গেঞ্জি পরা অবস্থায়, সার্টটা আলনা থেকে টেনে নিয়ে গায়ে গলাতে গলাতে পাড়-কি-মরি করে ছুটলাম! গিয়ে দেখি, আমার মতো বহু লোক ছুটে এসেছে। মাঠটাকে ঘিরে কাতারে কাতারে লোক। ভিতরে কিছু সঙ্গীনধারী জাপানী সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। আর মাঠের মাঝখানে একটি মানুষকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কে মানুষটি তা আমরা জানি না, তার পরণে একটা জাঙিয়া ছাড়া আর কিছু নেই। একটা সৈন্য কাছে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য একটি সৈন্য সজোরে চাবুক চালাচ্ছে তার সারা গায়ে। এক একটা চাবুক পড়ছে, আর মানুষটি চিৎকার করে উঠছে! সারা পিঠে চাবুকের চিহ্ন দড়ির মতো ফুঠে উঠেছে! আমি যখন গিয়ে পেঁছেছি, তখন মানুষটি প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছে আর চিৎকার করছে! চারদিকের লোক নির্বাক হয়ে দেখছে, চোখে তাদের আতঙ্কের ছাপ, ভয়ে কেউ টুঁ শব্দটি করছে না, প্রতিবাদ করা দূরের কথা! লোকটি একসময় সহ্য করতে না পেরে একটা হাত দিয়ে চাবুকের দণ্ডটি ধরে ফেলেছিল। আর যাবে কোথায়! দুজনে ওর সেই হাত ধরে হাতের কনুইয়ের কাছে মোটা বেটনটি গলিয়ে মট্ করে হাতটি ভেঙে ফেললে! সেই 'মট্' করা শব্দ আমরা সবাই শুনতে পেয়েছিলাম। সবার মুখ দিয়ে নিজেদের অজান্তেই একটা অস্ফুট চাপা শব্দ একযোগে বেরিয়ে এলো, —আ! সঙ্গে সঙ্গে জাপানী সৈনিকদের চক্ষু আরক্ত হয়ে উঠলো, একজন চিৎকার করে উঠলো—সাইলেন্স, খামোশ। জনতা চুপ। নিদারুণ আক্রোশে লোকটির অন্য হাতটিও ঐভাবে 'মট্' করে ভেঙে ফেলা হলো! মানুষটি তখন অর্ধমৃত—সে গোঙাচ্ছে! শুধু তার পা দুটো ছট্ফট্ করছিল বলি-দেওয়া ছাগলের মতো! জাপানীরা এটাকেও ঔদ্ধত্য মনে করে একটি পা ঐরকম ক'রে ভেঙে ফেললো। অন্য পাটাও ভাঙতে যাচ্ছে, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটলো। একটি জংলী তরুণী মেয়ে, পরণে ময়লা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরা, বুকে ময়লা জামা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—চিৎকার করে ছুটে গেল লোকটির দিকে। জাপানী সৈন্যরা হক্চকিয়ে গিয়েছিল, নইলে মেয়েটি লোকটির কাছে পেঁছোবার আগেই তাকে ওরা ধরে ফেলতো। মেয়েটি লোকটির বুকে আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল কী যেন ওদের ভাষায় বলতে বলতে, কিন্তু তখন দুদিক থেকে দুজনে ওকে ধরে ফেলেছে। মেয়েটির হাত ছাড়াবার সে কী প্রাণপণ চেষ্টা! যে সৈন্যটা চাবুক মারছিল, সে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—আওরৎ কেয়া বোল্তা হ্যায়?

প্রথমে কেউ উত্তর দেয়নি বা দিতে সাহস পায়নি। সৈন্যটি তখন ধমকে উঠলো,—আওরৎ কেয়া বোল্‌তা হ্যায় ?

ওর কাছের সারির একটি বুড়ো মত লোক এবার উত্তর দিলে। বললে,—উসকো মরদ—সোয়ামী !

জাপানীটা এবার মেয়েটির দিকে তাকালো। তারপরে অপর সৈন্য দুটিকে ইঙ্গিত করলো। সৈন্য দুটি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলো মেয়েটিকে। মেয়েটি তাড়াতাড়ি বসে লোকটির মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিলো। লোকটির গোঙানী তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু আমাদের মনে হলো, সে যেন বলছে,—পানি পানি !

সারির মধ্য থেকে কে যেন ছুটে গিয়ে কাছের কোনো ঘর থেকে একটি অ্যালুমিনিয়ামের লোটায় জল নিয়ে এলো। জলটা দেখে মেয়েটি হাত বাড়ালো জলটা নেবে বলে। জলটা নিয়ে সে তার 'মরদ' বা 'সোয়ামী'র মুখে দেবে। কিন্তু জলের লোটাটি তার কাছে পৌঁছাবার আগেই সেই লোটার ওপর এসে পড়লো চাবুক-হাতে সৈন্যটির লাথি। জল গড়িয়ে পড়ে গেল মাটির ওপর ! আবার উঠলো জনতার মধ্যে চাপা আর্তনাদ,—আ !

মেয়েটির চোখ দুটিতে তখন যেন আগুন জ্বলে উঠলো। সে আর দ্বিরুক্তি করলো না, নিজেই তার বুকের জামা ছিঁড়ে ফেলে একটি স্তন গুঁজে দিলো লোকটির তৃষ্ণার্ত মুখখানার মধ্যে, তখন তার আর কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

চাবুক হাতে সৈন্যটি জনতার সারির দিকে একটু সরে এলো। বললে,—আওরৎ জংলী হ্যায় ?

সেই বৃদ্ধটিই উত্তর দিলো,—জী।

—সাচ্‌ ?

—সাচ্‌।

জাপানী সৈন্যটি বললে,—মগর ও আদমী তো জংলী নেহী।

বৃদ্ধটি বললে,—এইসা হোতা হ্যায় জী এহী মুলুক মে।

জাপানীটি কী ভাবলো কে জানে, গটগট করে সঙ্গের সৈন্যটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে জীপে উঠে চলে গেল। পাহারাদার জাপানী সৈন্যরা দাঁড়িয়ে রইলো। ওদের ভয়ে আর কেউ কাছে গেল না।

খানিক পরে একটি অ্যাম্বুলেন্স এলো। লোকটাকে আর মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

অবাক হয়ে ওর কাহিনী শুনছিলাম। ও থামতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—তারপরে কী হয়েছিলো জানো ?

—জানি, অনিমেষ বললে,—তুমি শুনলে আরও অবাক হবে, ঐ জংলী মেয়েটা লোকটার বউ ছিল না। লোকটাকে চিনতো না, দেখেওনি এর আগে। ঢ্যাঁড়া শুনে সবার সঙ্গে সেও ছুটে এসেছিল দেখবে বলে। ঐ নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখতে দেখতে আর সহ্য করতে না পেরে সে ঐ ভাবে পাগলের মতো ছুটে

গিয়েছিল ওর কাছে, 'আমার মরদ—আমার মরদ' বলে ওদের নিজস্ব ভাষায় চিৎকার করতে করতে। ভেবে দেখো ভাই, আমরা এতো লোক দাঁড়িয়ে, এতো সভ্য লোক, কিন্তু কারুরই বিবেক সাড়া দেয়নি, হয়ত বা ভয়ে আমরা সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে একটি জংলী মেয়ে কেমন করে ছুটে গেল? ছুটে গেল এমন এক লোকের কাছে, যে ওদের জাতের লোক নয়, যাকে ও চেনে না, এমন কী, দেখেও নি কোনো দিন!

আমি হাতের সিগারেটটা 'অ্যাশ্-ট্রে'তে গুঁজে বলে উঠলাম,—কিন্তু তারপর কী হলো? লোকটি বাঁচলো?

অনিমেষ বললো,—দেখতে চাও তাকে? এসো আমার সঙ্গে।

বলে আমাকে নিয়ে বাইরে এসে তালা দিলো দরজায়। তারপরে রওনা হলো ওর বাড়ির পিছন দিককার একটা পায়ে-চলা পথ ধ'রে।

এ-ও কাঠের একটি বাড়ি। ছোট্ট, ঝুপড়ি মতো। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকতে হয়। একটি খাটিয়ার ওপর একটি মানুষ শুয়ে আছে, শীর্ণ মানুষ। গায়ে গেঞ্জি। তার দুটি হাতই কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা। পরণে ছিল খাকির হাফ প্যাণ্ট। তাই দেখতে অসুবিধা হলো না, তার বাঁ-পাটা হাঁটুর কাছ থেকে বাদ। অন্য পা-টা ঠিকই আছে, তবে অস্বাভাবিক শীর্ণ। আর শিয়রের কাছে মেঝের ওপর বসে তার মাথায় হাত বুলোচ্ছিল সেই মেয়েটি, যার নাম—নোভা।

আমাদের দেখে প্রথমটায় সে অবাক হলো, তারপরে উঠে দাঁড়ালো। অনিমেষ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলো,—কেয়সা হ্যায় ইয়ুসুফ?

লোকটা একটু হাসলো, বললো,—আচ্ছা হ্যায়, বাবুজী।

আমাকে দেখিয়ে অনিমেষ বললে,—হামারা দোস্ত।

ইয়ুসুফ বললে,—নমস্তে বাবুজী।

—নমস্তে।

অনিমেষ তার চাবির রিংটা নোভার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে,—চাবিটো রাখ দো, হাঁ? হাম ঘুমনে যাতা হ্যায় দোস্তকো সাথ্।

তারপরে আরও দুটো দিন ছিলাম আন্দামানে। শুনলাম, জাহাজ এলে যে পারে সে-ই যায় জেটিতে জাহাজ দেখতে। অনেকটা পাড়া-গাঁয়ের পোস্টাফিসে ডাক আসার সময় জড়ো হবার মতো। যদি চেনাজানা কেউ জাহাজ থেকে হঠাৎ নেমে পড়ে,—যার চিঠি আসে না, সেই ব্যক্তির হঠাৎ চিঠি আসার মতো! এখন অনেক জাহাজ হয়েছে, তখন ছিল এক এবং অদ্বিতীয় 'মহারাজা' জাহাজ। অনিমেষরা 'মহারাজা' জাহাজ আসার খবর পেলেই জেটিতে ছুটতো, তার ওপরে আমাদের জাহাজ গিয়ে ওদের জেটিতে ভিড়লো, তা হোক না মালবাহী জাহাজ, এ-একটা নতুন খবর বটে! তবু তো সবাই টের পায় নি, অনিমেষ বলেছিল, টের পেলে রীতিমত ভিড় হয়ে যেতো।

ওর সঙ্গে কত জায়গাই না ঘুরেছিলাম। 'করবাইন্স্ কোভ' নামক

মনোরম সমুদ্র-বেলা বা 'সী-বিচ' থেকে শুরু ক'রে 'চাথাম জেটি,' 'মধুবেন' থেকে শুরু করে দুর্গম সুদূর দক্ষিণ আন্দামানের পাখীদের উপনিবেশ 'চিড়িয়াটাপু' পর্যন্ত। অবশ্য ফ্যাক্টরির জীপ আর লঞ্চ না পেলে এ-সব ঘুরে ঘুরে দেখার সুবিধা হতো না।

কিন্তু জাহাজে ওঠার পরে ফেরার পথে অনিমেষের সঙ্গে মনে পড়ছিল নোভার কথা, পাপুয়ার কিরণের কথা, ফিজির বহ্নিজীর কথা, তাহিতির সেই অপরূপ-মাতৃমূর্তির কথা!

॥ ৭ ॥

জাহাজ যখন মুখ ফেরালো দেশের মাটিতে গিয়ে পৌঁছবে বলে, তখন আমার মনে চিন্তা ঢুকলো, ঠিক কোথায় যাবে জাহাজ? ক্যাপ্টেন কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু এখনো উত্তর আসে নি। যদি সরাসরি কলকাতা যায়, তো কী হবে? কলকাতায় আমার বাবা-মা-ভাইরা আছে, তাদের সঙ্গে এই ফাঁকে দেখা হয়ে যাবে অবশ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তাও থেকে যাচ্ছে। বিশাখাপত্তনে আমি যে কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করতাম, তাদের প্রধান কার্য্যালয় ছিল কলকাতায়। আগেই বলেছি, আত্মীয়তা আছে তাদের সঙ্গে। তাদের অবশ্য না জানিয়েই জাহাজে উঠেছিলাম, জানালে যদি নিষেধাজ্ঞা জারী হয়? তাই ভাবছিলাম, কলকাতায় গেলে জানাজানি হয়ে যেতে পারে। যদিও তাতে খুব একটা অপরাধ হবে না এই কারণে যে, ঐ সময়, আমাদের যে-সব জাহাজী লাইনের সঙ্গে কারবার, সেইসব লাইনের একটি জাহাজও বিশাখাপত্তনে আসবে না। সুতরাং কাজের ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু তাঁদের আসল কথাটা না জানিয়ে এভাবে হঠাৎ বেরিয়ে পড়া,—এটা কি ঠিক হয়েছে? আমার বয়স তখন ছাব্বিশ-সাতাশ। সে-বয়সে যুক্তির থেকে আবেগটাই বড়ো হয়ে থাকে। যখন বিশাখাপত্তনের বন্ধু সনৎবাবু জাহাজে ওঠবার সুযোগটা করে দিলেন এই জাহাজের স্থানীয় এজেণ্টকে বলে, যখন তিনি ছাড়া বাঙালী মহলের কাকপক্ষীও কেউ জানবে না এই ভরসা পেলাম, তখন সমুদ্রে ভেসে পড়তে দোষ কী? আমার বিশাখাপত্তনের বাসা তখন 'অবিবাহিতের গুহা', সেজন্য অন্য কোনো টানও ছিল না। কিন্তু যতই 'কলকাতায় জাহাজ না গেলেই ভালো হয়' বলে বারবার নিজের মনে আওড়াই, ততই আর একটা চিন্তার উদয় হয়। জাহাজ যাক না কলকাতায়, পাপুয়ার সেই 'কিরণ'-এর মা-বাবা-ভাই-বোনদের ঠিকানা যদি কোনরকমে পাওয়া যায়!

কিন্তু না, সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে জাহাজ ফিরে গেল যে বন্দর থেকে বেরিয়েছিল, সেই বন্দরেই। অর্থাৎ বিশাখাপত্তন থেকে এসেছিল, বিশাখাপত্তনেই ফিরে গেল। অফিসে সহকারীদের বলে গিয়েছিলাম এবং

কলকাতায় হেড-অফিসেও ট্রাঙ্ক-কলে জানিয়েছিলাম, এখন তো জাহাজ নেই, আমি একটু ছুটি নিয়ে দাক্ষিণাত্য ঘুরে আসতে যাচ্ছি।

কিন্তু কানাঘুষা জিনিসটা সাংঘাতিক। কতরকমই না রটেছিল! আমি নাকি ছুটি নিয়ে অন্য কোনো কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করতে কোথাও গেছি, ইত্যাদি। তা, সনৎবাবুর সঙ্গে দেখা হতে জানা গেল, আসল কথা কেউ টের পায় নি।

জাহাজ থেকে নামলে দু-তিনদিন একরকম মাথা ঘোরা থাকে, সেটা সারতে-না-সারতেই চিঠির মাধ্যমে হেড-অফিস থেকে আদেশ এলো,—"অবিলম্বে 'কোকনদ' যাত্রা করো, সেখানে একটি ক্ষুদে জাহাজে কিছু কাজ পাওয়া গেছে। বিস্তৃত বিবরণ সঙ্গে দেওয়া গেলো। লোকজন সঙ্গে নেওয়ার দরকার নেই, তুমি একা গেলেই হবে।"

অতএব, আবার ডানা মেলো। এ অবশ্য সমুদ্র পেরুনো নয়, ট্রেনে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হয়ে খানিকটা মাত্র যেতে হবে, অন্ধ্রদেশের মধ্যেই। অমন যে গমগম-করা দীর্ঘ গোদাবরী-ব্রীজ, তা-ও পার হতে হবে না।

তথাস্তু। ছেলেবেলায় ভুগোলের বইতে একটা নাম মুখস্থ করতে হয়েছিল ঃ 'কোকনদ।' 'কোকনদ' ভারতের পূর্ব উপকূলের একটি বিশিষ্ট বন্দর।

কিন্তু গিয়ে দেখি, নামেও মিল নেই, চেহারায়ও বিশিষ্ট বন্দর বলে মনে করবার হেতু নেই।

স্থানীয় নাম, 'কাকিনাদা',—ছোট একটি জনপদ, বন্দর বলতে যে চিত্রটি মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে, এ-বন্দরের সঙ্গে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই! দূরে, কখনো-সখনো দু-একটি জাহাজ এসে নোঙর করে। নৌকোর সাহায্যে সেই জাহাজ থেকে মাল খালাস করে নিয়ে আসতে হয়। খাতায়-কলমে এই জায়গাটাকেই বন্দর বলে। কিন্তু আমার চোখে গোদাবরী নদীর একটি শাখা জনপদের কাছেই যেখানে বঙ্গোপসাগরে এসে মিলিত হয়েছে, সেখানটাই যা একটু বন্দর বলে মনে হলো। নইলে পুরোনো বাড়িঘর আর ছোট ছোট গলি-সমাকীর্ণ অন্ধ্রপ্রদেশের আর সব ক্ষুদ্র শহরের মতোই কাকিনাদাকে দেখতে। কোথাও নতুন নতুন বাড়িঘর বা অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তার নির্মাণ কার্য চোখে পড়লেও শহরের পুরোনো চেহারাটা ঢাকা পড়তে চায় না।

বলা বাহুল্য, আমার কাজের ব্যাপারে বন্দরের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ করতে হয় সব থেকে বেশি। এই বন্দরের কোলে জাহাজ ভেড়ে না বটে, কিন্তু পালতোলা নৌকো, যা সমুদ্রে যাতায়াত করে মাল নিয়ে এ বন্দর থেকে সে বন্দরে, তার ভিড় অবশ্য কম নয়। বিড়ির পাতা, তামাক পাতা, হরতুকি, ছাগলের চামড়ার স্তূপ,—এগুলিই ছিল প্রধান পণ্য। এই পণ্যই বয়ে নিয়ে আসতো ঐসব ছোট-ছোট পালতোলা কাঠের জাহাজ,—যাদের কর্ণধার বা ক্যাপ্টেনকে বলা হতো, 'নাওখোদা।' তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করার দরুণ শোনাতো, 'নাখোদা।' (কলকাতার 'নাখোদা' মসজিদের 'নাখোদা' নামটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়)।

এইরকম একটি কাঠের পালতোলা জাহাজের 'নাখোদা'র সঙ্গে আমাকে আলাপ-পরিচয় করতে হয়েছিল কাজের খাতিরে। থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম ছোট্ট একটি হোটেলের ছোট্ট একটি ঘরে। আহার্য অবশ্যই নিরামিষ।

বন্দরের ভিতরে বড়ো জাহাজ না এলেও জাহাজ চলাচল ও বহুবিধ কাজ-কর্মের জন্য এজেন্টদের অফিস ছিল, তাদের মধ্যে গোটা তিন-চার নাম-করা অফিস, যাদের হেড অফিস কলকাতা বা মাদ্রাজ। তখন দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম, ও-সব কাঠের পালতোলা জাহাজের জন্যও নির্দিষ্ট এজেন্ট আছে, এজেন্টদের অফিস আছে। মিঃ রামলু এইরকমই এক এজেন্ট-অফিসের ম্যানেজার। কাজের ব্যাপারে এঁর সঙ্গেই আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল সবার আগে। এক কথায়, আমার সেই কাকিনাদা-ভ্রমণের দিনে এই মিঃ রামলু আর কাঠের ঐ পালতোলা বড়ো নৌকো বা জাহাজের 'নাখোদা',—পোলাইয়াই হয়ে পড়লো আমার সমধিক পরিচিত ব্যক্তি। বেশ মনে আছে, একদিন মিঃ রামলুর অফিস থেকে বেরিয়ে আমি পোলাইয়ার জাহাজে যাবো বলে বেরিয়েছি, অনেক সময় তাড়াতাড়ি করার জন্য রিক্সা নিতাম, সেদিন পথটুকু হেঁটেই পার হচ্ছিলাম। বড়ো রাস্তা পার হয়ে সর্টকাট করবো বলে একটা নাবাল জমির মধ্য দিয়ে চলেছি, পায়ে চলা সরু পথ, একধারে ছোট ছোট ঝুপড়ি;—কাচ্চাবাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মায়েরা গৃহকাজ করছে। বেলা তখন এগারোটা সাড়ে-এগারোটা হবে—রোদ্দুর বেশ প্রখর,—আমি শেষ ঝুপড়িটা পার হয়ে গেছি, এমন সময় কে যেন ডেকে উঠলো,—সাব ?

কণ্ঠস্বর বেশ ভারী, তাই মৃদুভাবে উচ্চারিত হলেও আমার কানে স্পষ্টই বাজলো ঐ ডাক।

স্বভাবতই একটু থমকে গিয়েছিলাম, যদিও জানতাম না আমিই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কিনা।

পরক্ষণেই আবার কানে এলো সেই ডাক,—সাব ?

এবার ফিরে তাকালাম। কালো চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দাড়ি কামানোই অভ্যাস, কিন্তু দিন দুই না-কামানোর দরুন খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। চোখ দুটি বড়ো বড়ো, একটু গোলাকার ও আরক্ত। ভুরু দুটি ঘন। কপালের ডানপাশে সিঁথির কাছাকাছি একটা দাগ। পরনে লস্করদের মতো নীল প্যান্ট, গায়ে খাকি সার্ট। পোশাক খুবই ময়লা। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে বলে সেলাই করা,—লোকটাকে আগে দেখেছি বলে মনে পড়লো না।

লোকটি বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল একটা খুপরির কাছ ঘেঁষে। মুখে বিনীত ভাব, হাত দুটি জড়ো করা।

—সাব, আমি আপনাকে চিনি।

লোকটা অবশ্যই বাংলায় কথা বলেনি। বলেছিল হিন্দীতে। বোঝবার সুবিধার জন্য আমাকে বাংলাতেই বলতে হবে। হিন্দী-ভাষণ শুনেও একটু

চমকে গিয়েছিলাম। কারণ, ও অঞ্চলে হিন্দী-ভাষণ অন্তত তখনকার দিনে সুলভ ছিল না।

বললাম,—কিন্তু আমি ত তোমাকে চিনতে পারছি না!

বললো,—আমার নাম রাজু—পোতরাজু। আমি পোলাইয়ার জাহাজে কাজ করতাম। এই পোর্টে এসে ও আমার নোকরি খতম করে দিয়েছে—আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম,—সে কী! এ কী পারে নাকি? তোমাদের ইউনিয়ন আছে না?

মুখখানা কালো হয়ে গেল রাজুর। বললে,—আছে সাব। লেকিন আমাদের ইউনিয়ন কিছু করতে পারবে না বলেছে। আমি এমন একটা কাজ করেছি, যার জন্য নাখোদা আমাকে তাড়াতে পারে, বলার কিছু নেই।

—তবে আমাকে বলছো কেন?

লোকটা বিনয়ের ভঙ্গিতে আরও নুয়ে পড়লো, বললো,—আপনার কথা শুনবে সাব! আপনি পাড়ালিখি আদমী। আপনাকে খুবই মান্য করবে।

বললাম,—কিন্তু তোমাকে আমি চিনি না, জানি না—তোমার কথা বলবো কী করে, অ্যাঁ?

লোকটা আমার কথা শুনে একেবারে পায়ের কাছে বসে পড়লো, বললো,—দয়া করুন হুজুর। আমি মারা পড়বো!

আমি একটু কঠোর স্বরেই বলে উঠলাম,—ওঠো বলছি!

লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

বললাম,—তোমার যদি এমন অবস্থা, তাহলে আমাকে না ধরে মিঃ রামলুর কাছে গেলে না কেন?

বললো,—গিয়েছিলাম সাব। তিনি কোনো কথা কানেই তুলছেন না। নাখোদা, যা বলবে বা যা করবে, তার ওপর তিনি কোনো কথা বলবেন না। সত্যি কথা বলতে কী, রামলু সাব আমাকে তাঁর অফিস থেকে দারোয়ান দিয়ে বার করে দিয়েছেন।

বলতে বলতে মানুষটার গলা ধরে এলো, চোখ ছলছল করে উঠলো।

বললাম,—দেখ, এ ব্যাপারে আমিও কিছু বলতে পারবো না। আমি নতুন লোক, এখানকার ধরন-ধারণও জানি না। তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছো, যা গুরুতর অপরাধ।

আমি হয়ত আরও কিছু বলতাম, কিন্তু লোকটা বাধা দিয়ে হঠাৎ মধ্য পথে বলে উঠলো,—সাব!

তার মুখে একটা বিস্ময় ও বেদনার ছাপ ফুটে উঠলো।

বললাম,—না ভাই, আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি চললাম।

সে আবার বলে উঠলো,—সাব!

তার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত কাতরতা ফুটে উঠলো, আমি পা বাড়িয়েও থমকে

দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। সে বলতে লাগলো,—সাব, যদি কিছু মনে না করেন, এই ঝুপড়ির মধ্যে একবার আসবেন? আপনি নিজেই সব দেখতে পারবেন—বুঝতে পারবেন—আমি হয়ত 'কসুর' করেছি, লেকিন সব কসুরেরই ত 'মাফি' আছে?

আমি একটু অবাক হয়েই লোকটিকে দেখছিলাম। কৌতূহল যে না হচ্ছিল এমন নয়, কিন্তু কোনো বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে পারি এই শঙ্কায় কৌতূহলকে দমন করলাম। গম্ভীর গলায় বললাম,—না বাপু, আমার দ্বারা সম্ভব নয়, চললাম।

বলে, আর না দাঁড়িয়ে সোজা হনহন করে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমার গন্তব্যস্থানের দিকে। পিছন থেকে লোকটা বার কয়েক 'সাব-সাব'-বলে ডাকতে লাগলো, কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করলাম না।

'নাবাল' জমি গিয়ে মিশেছে একটা অপরিসর রাস্তায়। রাস্তা দিয়ে মেছুনীর দল মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে হেঁটে চলেছে, আমি তাদের পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলাম পোলাইয়ার কাঠের নৌকো বা 'জাহাজ'-এর দিকে।

একটু দূর থেকেই সারি সারি কাঠের জাহাজগুলি চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি জাহাজ থেকে দুটি করে তক্তা জেটির ওপর এসে পড়েছে। জেটিগুলি কাঠ দিয়ে তৈরি। জেটির নিচে কালো রঙকরা কাঠগুলির ওপরে সাদা সাদা অজস্র বিন্দুর ছাপ। শামুক বা ছোট শাঁখ লেগে ঐ অবস্থা হয়েছে কাঠগুলোর।

সমুদ্রের জল এখানে সামান্য স্তিমিত। ঢেউ তুলে কাঠের গায়ে আর তীরভূমির পাথরে এসে পড়ছে। দূর থেকে একটা কোলাহলও কানে আসে। মাথায় বস্তা নিয়ে যে কুলিগুলি তক্তার ওপর দিয়ে জাহাজ থেকে জেটিতে আসছে, তাদেরই কলরব একটা সম্মিলিত কোলাহল হয়ে বেজে উঠছে। জলের আছড়ে পড়ার শব্দের সঙ্গে মিশে ওদের কলরব একটা অদ্ভুত স্বরধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে।

আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম পোলাইয়ার জাহাজের দিকে। জাহাজের একটা নাম ছিল, মালয়ালম ভাষায় লেখা, জাহাজের পিছনে খোদাই করে তার ওপরে কালো রঙ করা। (পরে জেনেছিলাম নামটা—বেল্‌পরত্তি—যার নাম জবা ফুল) আর জাহাজের সামনে গলুইয়ের বাঁ দিকে ছিল ইংরেজি অক্ষরে খোদাই করা—'কে ৫৭৩৭'।

আমি জেটি থেকে তক্তার ওপর উঠে কুলিদের পাশ কাটিয়ে কোনক্রমে জাহাজের পাটাতনে নামলাম। পোলাইয়াকে বৃদ্ধ বলা চলে, কিন্তু শরীরের পেশীগুলি এখনো শিথিল হয়নি। দাড়ি গোঁফ নেই, মাথার চুল সামনের দিকে পাতলা, সেখানে যেটুকু চুল আছে, তা একেবারে সাদা। বেশ দীর্ঘ চেহারা, ঘাড়ের কাছটা সামান্য নুয়ে পড়েছে মনে হয়। পোলাইয়ার মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু দাগ—গায়ের তামাটে রঙ মুখে ঘোর কালো দেখায় ঐ দাগের জন্য। পোলাইয়ার চেহারার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তার জুলপি দুটি। কানের শেষ পর্যন্ত নেমে এসেছে, বেশ ঘন, কিন্তু আগাগোড়া পাকা চুলে ভর্তি।

আমাকে দেখে পোলাইয়া এগিয়ে এলো, বললে,—আসুন বাবুজী, ঘরে বসবেন চলুন।

ওর সঙ্গে ওর ঘরে অর্থাৎ কেবিনে গিয়ে বসলাম। কাজের কথাবার্তা শেষ করে আমি এলাম পোতরাজুর প্রসঙ্গে। বললাম,—পোতরাজু বলে কাউকে চেনো?

ভ্রু-কুঁচকে বললে,—পোতরাজু? ও বুঝেছি, আমার জাহাজের মাল্লা ছিল। তা আপনি ওকে চিনলেন কী করে?

বললাম,—পথে আসতে আমাকে ও ধরেছিল। ওকে নাকি তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো?

—হ্যাঁ।

—কেন বলো ত?

পোতরাজুর কথায় মুখখানা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল পোলাইয়ার। বললে,—সে অনেক 'শরম'-এর কথা বাবুজী। ওসব আপনার না শোনাই ভালো।

বললাম,—শোনবার আকাঙ্ক্ষা আমার খুব নেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাকে ও ধরলো কেন, সেইটাই ভাবছি।

পোলাইয়া উত্তর দিলো,—ওর ঐ স্বভাব। জাহাজে কে আসে না আসে সবই দূর থেকে লক্ষ্য করে। আপনি কেন, রামলু সাহেবকে পর্যন্ত ও গিয়ে ধরেছিল। কিন্তু থাক এসব কথা, আপনি চা খান বাবুজী।

ছোট্ট কাঠের জাহাজ, কিন্তু ভিতরে সব ব্যবস্থাই আছে। জাহাজের বাবুর্চি ইতিমধ্যে একটা ট্রে ক'রে আমাদের জন্য চা আর আলুর বড়া নিয়ে এসেছে। দেখেছি, আলুর বড়া চাটনি দিয়ে খেতে এরা খুব ভালবাসে।

আমি নিশ্চুপে চায়েই মন দিয়েছিলাম। পোলাইয়া একটা বড়ায় কামড় দিয়ে চায়ের কাপে একটু চুমুক দিলো। তারপরে বললে—লোকটিকে ছাড়িয়ে দিয়ে আমারই কি কম ক্ষতি হয়েছে বাবুজী? ওর মতো দক্ষ মাল্লা খুব কম পাওয়া যায় এই লাইনে। কিন্তু উপায় নেই, আইন আমাকে মেনে চলতেই হবে।

বললাম,—লোকটার কষ্টও ত খুব। এ-বাজারে চাকরি খাওয়া—

পোলাইয়া বললে,—চাকরি পাওয়া ওর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। এই যে সারি সারি সব জাহাজগুলি রয়েছে, যে-কোনো জাহাজে যাক, কেউ না কেউ ওকে নিয়ে নেবেই।

একটু অবাক হয়েই তাকালাম পোলাইয়ার দিকে। বললাম,—তাহলে ও যাচ্ছে না কেন?

পোলাইয়া একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। মুখখানা নিচু, থমথমে। আমার সন্দেহ হলো, বুড়োর চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো,—সাহেব, আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে আমার জাহাজে কাজ করতে এসেছিল। সেই থেকে আমার চোখের সামনেই বড়ো হয়ে উঠেছে। এ জাহাজের ওপর আমার যেমন মায়া, ওরও তার থেকে কম মায়া নয়। এই

জাহাজেই ত ও বড়ো হয়ে উঠেছে। কতো ঝড়-ঝাপটা থেকে এই জাহাজকে আমরা দু'জনে বাঁচিয়েছি। তরতর করে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠে গেছে, শক্ত হাতে দরকার হলে এর হাল ধরতেও সাহায্য করেছে।

বললাম,—বুঝলাম। কিন্তু বাঁচতে ত হবে! অন্য জাহাজে চাকরি নিক। সে সবও ত এই ধরনের জাহাজ।

• পোলাইয়ার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এলো, বললে,—ওর দুঃখটা বুঝি, কিন্তু আমারও উপায় নেই। আইন-কানুন আজকাল বড়ো কড়া। এককালে জাহাজে 'নাওখোদা'ই ছিল আইন। সে যা করতো, তাতে কারুর কোনো কথা বলার এক্তিয়ার ছিল না। তখন আমিও অনেক বে-আইনী কাজ করেছি। কিন্তু এখন আর পারি না। অন্য মাল্লারা গিয়ে ঠিক নালিশ করে আসবে। সে বড়ো ঝঞ্ঝাট। বুড়ো বয়সে আর ঝুট-ঝামেলা সহ্য হয় না।

বলে, একটু থেমে নিজেই শুরু করলো পোলাইয়া,—আমরা দরিয়ায় ঘুরে বেড়াই, ছোট-ছোট বন্দরে আসি যাই সওদা নিয়ে। দূরপাল্লা আমাদের নয়, বড়ো জোর সিংহল, কিম্বা মালদ্বীপ, কি লাক্ষা দ্বীপ। কিন্তু তবু ত দরিয়ার মানুষ আমরা। বন্দরে গিয়ে জাহাজ যখন ভেড়ে, মাঝি-মাল্লারা যে কলের জাহাজের মাল্লাদের মতো একটু-আধটু ফুর্তি-টুর্তি না করতে যায় এমন নয়। আমার মতো বুড়ো হাবড়াদের কথা ছেড়ে দিন, জোয়ান মানুষরা একটু-আধটু আমোদ-আহ্লাদ করবে বই কি। সেটা কি খুব দোষের?

বলে উঠলাম,—সে ত খুবই স্বাভাবিক। এ রকম কোনো দোষের জন্যই কি ওকে তুমি শাস্তি দিয়েছো পোলাইয়া?

মাথা ঝাঁকিয়ে বুড়ো বলে উঠলো,—না সাহেব না। অমন দোষ-টোষ একটু-আধটু সবার আছে—ওর জন্য কোন্ মাল্লা আর অফিসে যাবে নালিশ করতে?

অবাক হয়েই বললাম,—তবে?

পোলাইয়া বলতে লাগলো,—সাহেব ছেলেটা আমার এমন ছিল যে, বন্দরে জাহাজ ভিড়লে সব মাল্লারা যখন আমোদ-আহ্লাদ করতে যেতো, ও তখন আমাকে ছেড়ে যেতে চাইতো না। আমার কাছে ব'সে ব'সে 'সজুতেল মুনতাহার'-এর কাহিনী শুনতো।

—সেটা আবার কী?

পোলাইয়া বললো,—আমাদের দরবেশদের কাছ থেকে শোনা। বেহেস্তে একটা গাছ আছে। সে গাছের পাতায় আমাদের প্রত্যেকের নাম লেখা আছে। সেই নাম-লেখা পাতাটি যখন খসে যাবে, তখন আমাদেরও দুনিয়ার খেলা ফুরিয়ে যাবে। বুঝেছেন তো সাহেব? প্রত্যেকের নাম-লেখা এক-একটা পাতা। এক পাতায় দুটো নাম থাকে না।

বললাম,—বাঃ! সুন্দর ত!

পোলাইয়া তার কথার ঝোঁকে বলতে লাগলো,—এইরকম ছেলেকে নিয়ে আমি বিপদেই পড়েছিলাম সাহেব। ওর বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ হয়েছে,

আমি ওর জন্য একটি 'বহু' ঠিক করলাম। নেগাপট্টম থেকে একটি গরিবের মেয়ে জোগাড় করলাম, মেয়েটির বাপের খবর কেউ বলতে পারলো না। মা ছেলেবেলায় মারা গেছে, মানুষ হয়েছে এক পাতানো মাসীর কাছে। মানুষ হয়েছে মানে মাসীর সংসারে দাসী-বাঁদীর মতো খেটেছে। মাসী মেয়ে দিতে রাজী হলো এক কাঁড়ি টাকার বিনিময়ে। আমি মেয়েটাকে সোজা জাহাজে এনে রেখেছিলাম সাহেব। এটা বে-আইনী কাজ। তবে, তখনকার দিনে 'নাওখোদা'র ওপরে কেউ কথা বলতে পারতো না। ভাবলাম, মেয়েটাকে নিয়ে ত যাই, পরের বন্দরে নেমে ওর সঙ্গে শাদীর বন্দোবস্ত করবো। ছেলে প্রথমটায় বিগড়ে গেলেও পরে রাজী হলো। পরের বন্দর ছিল মুসলিপত্তন। সেখানে ওর শাদী দিলাম। কিন্তু যে কথা আমরা আনন্দের হিল্লোলে একবারও ভাবিনি, সেটাই সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। শাদী ত দিলাম, বউটাকে রাখবো কোথায়? কার কাছে? আমরা ত দরিয়ার মানুষ। এক, ওকে জাহাজ থেকে সরিয়ে যদি ঐ মুসলিপত্তনেই সংসার পেতে দেই? কিন্তু সে প্রস্তাবে ছেলে রাজী হয় না। সে দরিয়ার মানুষ, দরিয়া ছেড়ে যাবে কেন? সেইজন্য আবার 'গয়েরকানুনি' বা বে-আইনী কাজ করলাম। মেয়েটাকে শাদীর পরেও জাহাজে রেখে দিলাম। ঠিক করলাম, নেগাপট্টম যখন যাবো, তখন মেয়েটাকে ঐ মাসীর বাড়িতেই রেখে দেবো। ছেলে টাকা দেবে তার বউয়ের জন্য, তাহ'লে আর তাকে রাখতে আপত্তি কি? কিন্তু বাবুজী কার্যক্ষেত্রে তা হলো না। মাসী রাখতে রাজী হলো না। আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে সোমত্ত বউকে একা-একা রাখাও ঠিক নয়। ওর জানাশোনা পাড়া-পড়শীরাও বারণ করলে। বললে,—দিনকাল ভালো নয়—যদি কোনো বিপদ ঘটে? আমরা আর কতো পাহারা দিতে পারবো? ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো তারও বোধহয় তেমন ইচ্ছা নয়, অগত্যা ওকে জাহাজেই রাখলাম। আপনাকে বলবো কী সাহেব, আগাগোড়া ব্যাপারটা বে-আইনী হলো। অনেক মাল্লা হৈ-চৈ করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো আমরাও বউ এনে জাহাজে রাখবো।

অবশ্য তা তারা করে নি শেষপর্যন্ত। সত্যিকথা বলতে কী তারা কেউ শাদী করবার লোকও নয়। তারাও মিছিমিছি হৈ-চৈ করতো, আমিও মুখ বুজে সব সহ্য করতাম। এই ভাবে দু-দুটো বছর কেটে গেল। আমার বুড়ো বয়স, আমার মনটা খুঁত-খুঁত করতো। এখনো পর্যন্ত একটি ছেলে কোলে এলো না বউটার। কিন্তু বলার কিছু নেই সবই খোদার ফজলে হয়। ততদিনে মাল্লাদের হৈ-চৈ অনেক কমে এসেছে। মেয়েটা সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথাবার্তা বলতো। জাহাজের অনেক রান্নার কাজ অনেক সময় নিজের হাতেই করতো, শাড়ির আঁচলটা কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে ঐ পাটাতনের ওপর ঘোরাঘুরি করতো, মাল্লাদের কাজে পর্যন্ত সময় সময় সাহায্য করতো। আমার ভালোই লাগতো দেখতে। ও যেন জাহাজেরই একজন হয়ে গেছে। সাহেব, খোদার ফজলে সবই ভালো চলছিল, ছেলেটারও মন আনন্দে ভরপুর ছিল। একবার

টিউটিকোরিনের কাছে আমরা ঝড়ে পড়ি, জাহাজ ভেঙে পাল ছিঁড়ে সে এক নিদারুণ অবস্থা। কোনক্রমে তীরে এসে ভিড়েছিলাম। টিউটিকোরিনে জাহাজ মেরামতির জন্য আমাদের এক মাসের ওপর আটকে থাকতে হয়েছিল। আমি জাহাজের মেরামতি নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, অন্য কোনো দিকে মন দেবার উপায় ছিল না। ছেলেটাও সব সময় আমার কাছে থাকতো, আমার সঙ্গে খাটতো। জাহাজ মেরামতি হবার পর জাহাজে মাল ভর্তি করে আবার আমরা যেদিন দরিয়ায় ভাসলাম, সেদিন হঠাৎ আবার হৈ-হৈ পড়ে গেল, মেয়েটার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ততক্ষণ আমরা দরিয়ার অনেকটা মধ্যে এসে পড়েছিলাম। সাহেব, আবার আমি বে-আইনী কাজ করলাম। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আবার টিউটিকোরিনে। একটু দূরে নোঙর ফেলে ছোট নৌকো করে কয়েকজনকে পাঠালাম তীরের দিকে! তার মধ্যে অবশ্য ছেলেটিও ছিল। ওরা ঘণ্টা তিনেক খোঁজাখুঁজি করলো। তারপরে হতাশ হয়ে ফিরে এলো। মেয়েটির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। কী বলবো সাহেব, ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বড়ো কষ্ট হয়েছিল সেদিন, কিন্তু কী আর করা যাবে? কেউ কোনো খোঁজই দিতে পারলো না। আমি আর কতক্ষণ জাহাজ আটকে রাখতে পারি? বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিতে হলো। দিন কতক ছেলেটা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ালো, তারপরে আগের মতোই কাজে মেতে গেল। আমি যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে ডেকে আরও খোঁজখবর নিতে লাগলাম। কেউ কোনো হদিশ দিতে পারলো না। বউটা কি বেঘোরে মারা গেল, না কোনো শয়তানের খপ্পরে পড়লো, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সাহেব, এইভাবে পুরো বরষ কেটে গেল। এর মধ্যে দু-দুবার টিউটিকোরিনে গেছি, আমি নিজে খোঁজখবর নিয়েছি, কিন্তু কোনো হদিশ পাইনি। ছেলেটা নিজেও কি খুঁজেছে কম? শেষপর্যন্ত আমি ওকে বললাম,—বেটা, যা হবার তা হয়ে গেছে; তুই আর একটা শাদী কর, আমি মেয়ে জোগাড় করছি। কিন্তু ছেলে বেঁকে বসলো, কিছুতেই শাদী করলো না। পীড়াপীড়ি করতে বললে,—আমরা দরিয়ার মানুষ, মাটির মানুষ কি আমাদের কাছে বাঁধা পড়তে চায়, না বাঁধা পড়তে পারে? তুমি আর ওসব চেষ্টা করো না। না সাহেব, আর আমি সত্যিই ওসব চেষ্টা করিনি।

দিন কাটতে লাগলো। দরিয়ার বুকে সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে যায়। ছেলেটার কাছে ততদিনে আমাদের এই জাহাজটা যেন প্রাণের থেকেও বেশি কিছু হয়ে উঠেছে। কাজের লোক ছিল, কাজ করতো প্রাণমন দিয়ে। কিন্তু এরপর জাহাজটা যেন ওঁর দিল হয়ে দাঁড়ালো। বুড়ো মানুষ, প্রথমটায় বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলাম: মেয়েটার স্মৃতি জাহাজটার সারা গায়ে ছড়ানো সেইজন্যই জাহাজটা ওর দিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলতে বলতে বৃদ্ধের গলা এই সময় ধরে এলো। রুদ্ধ আবেগ তার কণ্ঠরোধ করলো। আমি বললাম, পোলাইয়া আমি বুঝতে পারছি, কতো ভালোবাসো তুমি পোতরাজুকে। কিন্তু—

বৃদ্ধ নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগলো,—বাবুজী, আমাদের ভালোবাসার আর দাম কতটুকু? আমি জানি, কেন ও এই জাহাজেই আসতে চায়? এই জাহাজে যে ওর সেই বউটির স্মৃতি জড়ানো! তাকে হারালেও তার স্মৃতি নিয়ে ও বেঁচেছিল এই জাহাজে। এরপর থেকে জাহাজ যখনই কোনো বন্দরে ভিড়তো, সবাই নামতো, ও কখনো নামতো না।

—একেবারেই না?

বৃদ্ধ বললে,—একেবারেই না বলা ভুল। ওর বন্ধু-বান্ধবরা জোর করে কখনো-সখনো টেনে নামাতো, আর তাছাড়া আমিও বলতাম। এভাবে মনমরা হয়ে একটা মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে? কিন্তু সাহেব, ওর মন চাইতো না, ওর মন এই জাহাজটা ঘিরেই ঘুর ঘুর করতো। আমি বুঝি সাহেব, স্মৃতি এমনই জিনিষ!

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

আমি বললাম,—তবুও ওকে তুমি তাড়িয়ে দিলে?

বৃদ্ধ বললো,—হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিলাম। ওর কষ্ট হবে, তবু ও তা সহ্য করুক, সহ্য করতে করতে একদিন যদি ও স্মৃতির বাঁধন কাটাতে পারে, ত আমি বলছি সাহেব, নতুন করে ও আবার বেঁচে উঠবে, আবার হয়ত ঘর-সংসার করবে।

বললাম—তাহলে এইটাই আসল কারণ? বে-আইনী ব্যাপার-ট্যাপার যা বলেছিলে, সেটা কিছু নয়?

বৃদ্ধ জোর দিয়ে বললে, কারণ দুটোই সমান। বেআইনী ব্যাপারটাও তুচ্ছ করবার বিষয় নয়।

বললাম,—আচ্ছা পোলাইয়া, এইবার বলো ত এই বে-আইনী ব্যাপারটা কী? কী ও করেছিল? কোনো নারীঘটিত—

পোলাইয়া বাধা দিয়ে উঠলো, তাহলে ত বাঁচতাম সাহেব! আমি ত চাইছিলাম যেমন করে ওর জীবন থেকে ওর 'দিল'কে কেউ কেড়ে নিয়ে গেছে, ও-ও তেমনি অন্য কারুর 'দিল'কে নিয়ে আসুক, আমি যেমন করে পারি জাহাজেই তাকে লুকিয়ে রাখবো।

আমি কৌতূহলে উদ্বেল হয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, তাহলে তোমার ধারণা, ওর বউকে কেউ ছিনিয়েই নিয়ে গেছে। বেঘোরে মারা পড়েনি?

—হ্যাঁ বাবুজী, আমার তাই-ই বিশ্বাস—বৃদ্ধ বললে, এর কোনো প্রমাণ পাইনি, তবু আমার মন বলে, এটাই সম্ভব। টিউটিকোরিনে কেউ ওর বউকে ভুলিয়ে বা জোর করে নিয়ে চলে গেছে। বেঘোরে সে মরে নি, তাহলে সে খোঁজটা কেউ না কেউ পেতোই।

একটুক্ষণ থমকে থেমে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জাহাজে কে এক মাল্লা কার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে। জলের ওপর দিয়ে সেই ডাক কেঁপে কেঁপে তীরের দিকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো সাড়া ভেসে আসছে না।

বললাম,—পোলাইয়া তোমার কথা বুঝলাম। এবার বলো ত, কী ওর অপরাধ, যার জন্য তুমি ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছো ?

পোলাইয়া উত্তর দিলে,—ছেলে-চুরি। আমাদের আগের পোর্ট ছিল মাদ্রাজ। সেখান থেকে জাহাজ ছাড়বার পর দেখি একটা বছর দেড়েকের ছেলেকে ও চুরি করে এনে জাহাজে লুকিয়ে রেখেছে। ছেলেটা কাঁদে, কিছু বলতে পারে না। ওকেও জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না। আমি রেগে ওকে চড় মেরেছিলাম সাহেব, তবুও বলছে না, এ কার ছেলে, কেমন করে ও নিয়ে এসেছে ছেলেটাকে ?

অবাক হয়েই ওর কথা শুনছিলাম। কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারি নি। তারপরে সম্বিত ফিরে আসতে বললাম, এর বেশি আর কিছু তুমি জানো না বোধহয় ?

—না।

বলা বাহুল্য, আর আমি বেশিক্ষণ জাহাজে থাকি নি। আমার তখন যাওয়ার কথা ছিল মিঃ রামলুর অফিসে, কিন্তু সেখানে যাওয়া হলো না। আমি জাহাজ থেকে নেমে সেই নাবাল জমি দিয়ে হেঁটে সেই ঝুপড়িগুলোর দিকে চলতে লাগলাম দ্রুত পায়ে। রাস্তায় তখন মেয়েদের ভিড় বেশি। বোধহয় মাছের নৌকো অনেকগুলি এসে পেঁছেছে। মেয়েরা ঝাঁকায় মাছ নিয়ে দ্রুতগতিতে হেঁটে চলেছে। আমি তাদের পার হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগলাম।

বোধহয় একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম। কে পোলাইয়া, কে পোতরাজু, কে তার বউ, আর কেই বা আমি ! অথচ সেই মুহূর্তে আমার মন জুড়ে ওদের কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। জরুরী অফিসের কাজ মুলতুবী রেখে আমি 'অকাজ'-এর অভিমুখে চলেছি, এটা জানতে পারলে আমার মনিবরা খুশি হবেন না, কিন্তু আমিও নাচার। জীবন সম্বন্ধে আমার এই উদগ্র কৌতূহল সারাজীবনই আমার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে এনেছে, তবু আমি নিজেকে কখনো নিবৃত্ত করতে পারি নি, আজও পারছি না। কিন্তু থাক আমার এই আত্মবিশ্লেষণের কথা। কিছুদূর এগিয়ে আসবার পর আবার হঠাৎ কানে এলো সেই ডাক,—সাব ?

চমকে তাকিয়ে দেখি, পোতরাজু।

বললাম, তুমি ! কোথায় ছিলে ?

—আপনারই সঙ্গে সাব। আপনারই পিছু পিছু আমি এসেছিলাম। জাহাজে ত আমাকে উঠতে দেবে না, নইলে জাহাজেও আপনার পাশে পাশে থাকতাম।

একটু থেমে তারপরে বললে,—আপনার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি বাবুজী। আপনি বাঙালী।

—বাঙালী ত কী হয়েছে ?

উত্তর দিলে,—বাঙালীদের দিল আছে। তারা লোকের দুঃখ বুঝতে পারে।

একটু হাসলাম, বললাম,—এ খবর তোমায় কে দিলে ?

—শুনেছি সাব।

চলতে লাগলাম ওর সঙ্গে। চলতে চলতে বললাম, তোমার সেই ঝুপড়িতে তুমি কী দেখাতে চেয়েছিলে, পোতরাজ ?

—আসুন বাবুজী, দেখুন। আমি কি সত্যিই কোনো কসুর করেছি ? আপনিই বিচার করুন।

ওর সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের ঝুপড়ি অঞ্চলে এলাম। এদিক-ওদিক কয়েকটি স্ত্রীলোক নজরে পড়লো, কেউ কাপড় শুকোতে দিচ্ছে, কেউ অন্য টুকিটাকি কাজ করছে। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে তারা আবার যে যার কাজে মন দিলো।

পোতরাজু একটা ঝুপড়ির আগড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে আমাকে বললে, আসুন সাব।

মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। ছোট্ট একটা ঝুপড়ি ; একটা বেড়ার কাছে মাথা রেখে টান টান হয়ে শুলে পা গিয়ে আর এক বেড়ার গায়ে ঠেকবে। জানালা বলে কোনো পদার্থ নেই। একপাশে হাঁড়িকুড়ি, অন্য পাশে একটা চাটাই আর ময়লা কাঁথা পাতা। তার মধ্যে একটি বছর দেড়েকের রোগা ছেলে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সারা শরীরে কাঁথা চাপা দেওয়া, মুখখানি শুধু বেরিয়ে আছে। মাথায় চুল খুব কম। এক কথায় ছেলেটাকে দেখতে আদৌ সুন্দর নয়।

বললাম,—তোমার সব কথা আমি শুনেছি পোতরাজু, ছেলেটিকে মাদ্রাজ থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছো ?

পোতরাজু আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপরে মুখ নিচু করলে। থমথমে মুখ।

বললাম—উত্তর দিচ্ছ না যে ?

পোতরাজু মুখ তুললো। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই আগড় ঠেলে আরেকজন কে যেন ঢুকলো। মুখ ফেরাতেই দেখলাম একটি স্ত্রীলোক। বাইরে যারা কাজ-টাজ করছিল, তাদেরই একজন। আমাকে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়েই একপাশ ঘেঁষে ছেলেটার কাছে গিয়ে কোনক্রমে বসলো। হাতে একটা বাটি, বার্লিটার্লি কিছু হবে বোধহয়।

মেয়েটির পরণে একটা আধ ময়লা সবুজ শাড়ি, গায়ে বিবর্ণ হয়ে আসা কালো রঙের জামা, হাতে কয়েক গাছি করে কালো রঙের কাঁচের চুড়ি। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল এলোমেলো ক'রে বাঁধা। গায়ের রঙ কালো, মুখে একটা কমনীয় ভাব আছে। মাঝারী চেহারা। চোখের নিচে যেন কাজলের একটা সূক্ষ্ম রেখা চোখে পড়লো।

আমরা কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। হঠাৎ কানে এলো ওদের ভাষায় মেয়েটি পোতরাজুকে মৃদু গলায় কী যেন বললে।

পোতরাজু তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট চৌপায়া এগিয়ে এনে আমাকে বললে—বসুন সাব।

বললাম,—না পোতরাজ্। বরং বাইরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলে আর দাঁড়ালাম না, আগড় ঠেলে নিজেই আগেভাগে চলে এলাম বাইরে। আমি জানি, পোতরাজ্ আমার পিছন পিছন বেরিয়ে আসবে। আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম, আমার উদ্দেশ্য ওদের ঝুপড়ি এলাকা ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় উঠে পড়া। কিন্তু রাস্তায় পড়বার আগেই পোতরাজ্ ডেকে উঠলো,—সাব?

মুখ ফিরিয়ে বললাম,—ওপরে উঠে এসো, বলছি।

ও আর কথা বললো না, আমার পিছনে নিশ্চুপে আসতে লাগলো।

বড় রাস্তায় উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটি ছোট্ট 'কালভার্ট" বা সেতুর উপরিভাগ চোখে পড়লো। বললাম, এসো পোতরাজ্, এখানে বসা যাক, বলে ওকে নিয়ে সেই কালভার্টের ওপরে বসলাম। পাশেই গোটা তিনেক তালগাছ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে জটলার ভঙ্গিতে। রাস্তার ওপর দিয়ে সাইকেল, রিক্সা, মাঝে মাঝে দুটো-একটা মটোরও ছুটে যাচ্ছে। পথচারীর ভিড়ও আছে, তবে তারা যে-যার উদ্দেশে চলেছে, আমাদের দিকে তাকাবার অবকাশ তাদের নেই! পোতরাজ্ বসেনি, আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিনীত ভঙ্গিতে।

বললাম,—পোতরাজ্, ও ছেলেটাকে তুমি চুরি করে নিয়ে এসেছো কেন? ঐ মেয়েলোকটিই বা কে?

পোতরাজ্ বললে,—আমার কথা আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন? পোলাইয়া?

—হ্যাঁ।

পোতরাজ্ ভ্রূদুটো কুঞ্চিত করে বললে—কিন্তু ও তো কাউকে কোনো কথা বলে না।

বললাম,—বলবেই বা কী? কতটুকুই বা জানে? ছেলেটাকে মাদ্রাজ থেকে এনেছো, কে ঐ ছেলেটা, কার ছেলে, তুমি চুরি করলে কেন, এসব ত কিছুই তাকে বলোনি।

পোতরাজ্ বললে, বলবার উপায় ছিল না।

বললাম—বেশ। কিন্তু আমাকে না বললে আমি সব বুঝবো কী করে?

ও একটু চুপ করে রইলো। মুখ নিচু করে ভাবতে লাগলো।

বললাম, পোতরাজ্, ঐ মেয়েটি কে? তোমার সেই বউ?

ও একটু চমকে উঠলো, তারপরে তাড়াতাড়ি বললো,—না বাবু—না।

—তবে?

পোতরাজ্ বললো, সাব, আপনাকে আমি বলতে পারি, কিন্তু আর কাউকে বলবেন না, পোলাইয়াকেও না। ওরা জানে, আমি ছেলে চুরি করেছি, ব্যস, সেটুকুই জানুক।

বললাম,—তাতে ত তোমারই ক্ষতি। ও তোমাকে জাহাজে নেবে কেন, সব কথা না জানলে না বুঝলে?

ওর মুখে একটা ক্লিষ্ট ভাব ফুটে উঠলো, কাঁপা গলায় কোনক্রমে বললে—সাব, ব্যাপারটা এমন যে আমি কিছুতেই ওকে বলতে পারবো না। বললে বুড়োর বুকের এমন একটা জায়গায় গিয়ে ব্যথাটা বাজবে যে, বুড়ো হয়ত আর বাঁচবেই না!

ওর চোখের দিকে তাকালাম। এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পর বললাম—আচ্ছা, আগে বলো ত ঐ ঝুপড়ির মধ্যে যাকে দেখলাম সে মানুষটি কে? তোমার কেউ হয়?

—না সাব—পোতরাজু বললে,—আমার কেউ হয় না। বাচ্চাটার জ্বর হয়েছে বলে অত সেবাযত্ন করছে। তবে ঝুপড়িটা ওর নিজের।

বললাম,—তুমি কি ওরই সঙ্গে ঘর বেঁধেছো, জাহাজ ছাড়বার পর?

ও যেন মুহূর্তে শিউরে উঠলো কথাটা শুনে। বললে, না সাব, না। ঘর বাঁধা আমার নসীবে নেই।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তাহলে মেয়েটি কে?

পোতরাজু বললে, ঐ যে ঝুপড়িগুলো দেখছেন, ও পাড়াটা ভালো না। ওখানে যারা থাকে, দিনের বেলায় কেউ কেউ নানান কাজটাজ করলেও রাতে ওদের চেহারা হয়ে যায় এক। ওরা—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, থাক, বুঝেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় হলো কী করে?

বললে,—আমার সঙ্গে পরিচয় কখনো ছিল না। বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘুরছি, কোথায় ওকে রাখা যায়। এই মেয়েটির সঙ্গে হঠাৎ আলাপ—এই রাস্তাতেই। দিনের বেলা—কোথা থেকে কী যেন সওদা করে ফিরছিল, আমি সেদিন জাহাজ থেকে নামছি ঐ বাচ্চাটাকে কোলে করে। বাচ্চাটা সেই সময় কাঁদছিল, কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না। মেয়েটার বোধ হয় মায়া হলো, কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো, ছেলেটা কাঁদছে কেন, কী হয়েছে, ইত্যাদি। এরই জের টেনে সে আমাকে শুধু টেনে নিয়ে গেল তার ডেরায়। শেষ পর্যন্ত তাকে সব বললাম, সে ছেলেটার সব ভার নিয়েছে, আমার আর ভাবনা নেই। এখন আমি আবার জাহাজে ফিরে যেতে চাই।

বললাম, পোতরাজু, তবুও সব কথা বলা হলো না। বাচ্চাটাকে যদি এভাবে বিলিয়েই দেবে, তাহলে মাদ্রাজ থেকে ওকে চুরি করে আনলে কেন?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পোতরাজু বললো, পোলাইয়াকে আপনি বলবেন না, বা ওদের কাউকেই বলবেন না, এই সর্তেই আপনাকে বলবো।

বললাম, বড়ো শক্ত সর্ত পোতরাজু! সব কথা পোলাইয়াকে খুলে বলতে না পারলে ও তোমাকে জাহাজে নেবে কেন?

পোতরাজু বললো, সে আপনি একটু জোর করে বললেই হবে সাব।

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, মনে ত হয় না। তবু দেখা যাক, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

বললাম, যদি খুব তাড়া না থাকে ত চলো আমার ঘরে। রাস্তায় বসে কত বকবক করা যায় ? এসো।

বলে, ওকে নিয়ে সোজা চলে এলাম আমার হোটেলে। আমার ঘরটি খুলে দুজনে বসলাম। কফি আনিয়ে দুজনে খেতে লাগলাম। বললাম—এরপর বলো ত পোতরাজু, সত্যিকার ব্যাপারটা কী ?

পোতরাজুর মুখখানা বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, যা সে কিছুকাল ধরে একা একা বহন করে আসছে। ওর বউ যখন বেরিয়ে যায়, তখন সে দুঃখ বহন করবার জন্য সহযোগী ছিল, সমব্যথী ছিল ওর হাহাকারকে অনুভব করার জন্য। কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে মাদ্রাজে জাহাজে ওঠবার পর থেকে ওর যা সহ্য করবার তা একা একাই করে গেছে, কারুর কাছে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি।

ওর মনের ভাব দেখে আমার এসব কথা মনে জাগছিল।

পোতরাজু বলতে লাগলো.—আমার বউয়ের কথা কতটুকু আপনি শুনেছেন জানি না। সে ছিল নেগাপট্টমের মেয়ে। তার আসল নাম বললে আপনার কানে খটোমটো লাগতে পারে, তাই আমি তাকে সখ করে যে নামে ডাকতাম, সে নামটাই বলবো ! আশা। আশা নেগাপট্টমের নামও নয়, আমাদের দিককারও নাম নয়। আমার এক জাহাজী বন্ধু কোথায় এক হিন্দি সিনেমা দেখেছিল, নায়িকার নাম ছিল,—আশা। তার মুখে সিনেমার 'কাহিনীটা' শুনতে গিয়ে ঐ নামটা খুব নতুন লেগেছিল। তাই আমি ভুলিনি নামটা। সেই নাম ধরেই শেষ পর্যন্ত বউকে আমি ডাকতে শুরু করেছিলাম। ভালো মেয়ে ছিল আশা, আমাদের জাহাজের সবাই ওকে পছন্দ করতো। ওর ছেলেমানুষীটা, ওর হাসির ধরন, ওর কথা বলার ভঙ্গি শুধু আমার কেন, জাহাজের সবারই ভালো লাগতো। কিন্তু একবার টিউটিকোরিনে এসে ও হারিয়ে গেল। ওকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

পোতরাজু এখানে একটু থামলো। তারপরে উদ্গত আবেগটাকে কোনক্রমে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগলো, সাব, তাকে হারিয়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। কী করে সে হারালো, কেমন করে হারালো, তা আমি কিছুই জানতে পারলাম না। আমাকে সে ভালবাসতো খুব, আমাকে ছেড়ে যে সে অমন করে একদিন চলে যাবে, আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি। কিছুদিন পরে মনটা স্থির হতে ভাবতে লাগলাম,—কিন্তু গেল কার সঙ্গে ? জাহাজের মাল্লা যতজন ছিল ততজনই আছে, কেউ নেমে যায়নি। তাহলে ? সাব, এর পরে সবকিছু নসীবের খেলা বলে ছেড়ে আমি নিজের মনটাকে বাঁধলাম, কিন্তু বুড়ো পোলাইয়ার অবস্থা দেখে আমার আরও কষ্ট হতো। বুড়ো পোলাইয়া বউকে খুব স্নেহ করতো। ও-ই ত নিজের পছন্দ করা মেয়ে এনে আমার বিয়ে দিয়েছিল, সবার অমতে আমার বউকে ও জোর করে জাহাজে রেখে দিয়েছিল।

পোতরাজ্ থামলো। ওর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে ছিলাম, বললাম,—তারপর ?

পোতরাজ্ বললো,—তারপরেই অবাক কাণ্ড সাব। বউকে হারানোর পর দু বছর কেটে গেছে, হঠাৎ আমরা গেলাম মাদ্রাজে। আমি জাহাজ থেকে কখনো নামতাম না, মাল্লাবন্ধুদের টানাটানিতে সেবার নামলাম মাটির ওপর। কী খেয়াল হলো কে জানে, ওদের সঙ্গে গেলাম হৈ হৈ করতে। সাব, এ ও নসীবের খেলা। একটা খুপরির মধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আশার সঙ্গে। কঙ্কালসার চেহারা, চোখের নিচে কালি, কোলে একটা বাচ্চা। আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড সাব, আমার চোখে জল এলো না। আমার মনটা তখন কেমন অসাড় হয়ে গেছে। কোন রকমে একবার মাত্র পুছ করেছিলাম, শেষকালে তুই এই খারাপ জীবন বেছে নিলি আশা ?

আশার কান্না আরও বেড়ে গেল। তারপরে একটু শান্ত হবার পর বললে, আমি আর বাঁচবো না। রোজ রাত্রে আমার জ্বর হয়। কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে। একজন হাসপাতাল থেকে দাওয়াই এনে দেয়, দু একদিন কাশি কম পড়ে, তারপরে আবার যেই কে সেই।

বললাম, তুই আমার সঙ্গে চল আশা।

—কোথায়, জাহাজে ? আশা বললে, জাহাজে ফেরার উপায় থাকলে জাহাজ থেকে অমন করে পালিয়ে আসি সবার চোখ এড়িয়ে ?

—লেকিন, কেন ?

আশা বললে, তোমার সব কথা জানার দরকার নেই। আমি যখন টিউটিকোরিনে জাহাজ থেকে পালাই, তখন আমার পেটের ঐ বাচ্চাটা চার মাসের।

বাচ্চাটাকে ঘরের কোণে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেছিল, সেইদিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠলো, বললাম, তবে ত ও আমার ছেলে ?

আশা আমার চোখের দিকে তাকালো, তারপরে বললে,—না। তোমার ছেলে ও নয়।

মানে !

আশা বললে, সব জানতে চেয়ো না, দুনিয়ার সব কিছু জানা ঠিক নয়, কিছু কিছু আঁধারে থাকাই ভালো। আমি তোমাকে ছেড়ে জাহাজ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম কি সাধে ? অথচ বিশ্বাস করো, তোমাকে ভালবাসতাম সারা মন দিয়ে। কিন্তু শেষের দিকে এক মাস কী যে যন্ত্রণা পেয়েছি ! আমিও যন্ত্রণা পেয়েছি, সে লোকটাও যন্ত্রণা পেয়েছে। তবুও সে জানতো না যে, তারই সন্তান আমার পেটে।

— বলছো কী !

আশা বললে, টিউটিকোরিনে একাই পালিয়েছিলাম। তারপর পড়লাম

বদমাসের হাতে। তারা আমাকে ওখান থেকে নিয়ে এলো মাদ্রাজে। এখানে দরিয়ার দিকে তাকাই, আর তোমার কথা ভাবি। আমি আর বাঁচবো না।

বলে আবার সে কাঁদতে লাগলো। আমি তার চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। বললাম, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবোই। তুমি ভেবো না। আমার জমানো টাকা আছে।

সাব, আমি পরদিনই গিয়ে তাকে অনেক করে এক হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলাম। গরীবদের হাসপাতাল। সেখানে আপনার মতো একজন বাঙালী বাবুর দয়া পেয়েছিলাম। তিনি আপনারই মতো জাহাজে আসতেন। আপনারই মতো 'সাব' বলে আমি তাঁকে ডাকতাম। তিনি কোশিশ না করলে ওকে হাসপাতালে দিতে পারতাম না। গরীবদের হাসপাতাল, পয়সা লাগে না। তবু আমার জমানো টাকা আমি ও'র আঁচলে বেঁধে দিয়ে এসে-ছিলাম।

পোতরাজু থামলো।

বললাম,—ওর সেই বাচ্চাটাকে বুঝি তুমি নিয়ে এসেছিলে?

—হ্যাঁ।

বললাম,—তাহলে চুরি করেছো বলে রটলো কেন? সব খুলে বললেই পারতে পোলাইয়াকে।

—না সাব, পোতরাজু বললে—ছেলেটা পোলাইয়ার। আশা আমাকে শেষ পর্যন্ত সবই বলেছিল। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি পোলাইয়াকে।

আমি চমকে উঠলাম, বলছো কী?

তেমনি শান্ত কণ্ঠে পোতরাজু বলতে লাগলো—হ্যাঁ সাব। কিন্তু এটা যে আমি টের পেয়েছি, জানলে বুড়ো নিজেকে আর জ্যান্ত রাখবে না, বিষ খেয়ে মরবে! তাই মার খেয়েও টুঁ শব্দ করি নি, তাড়িয়ে দিলেও মুখ ফুটে কিছু বলি নি, ছেলে কোলে রাস্তায় নেমে এসেছি।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

পোতরাজু বলতে লাগলো,—সাব বুড়োর দোষ নেই। সারা জাহাজে অতগুলো মরদ; ও একা মেয়েছেলে। আর তাছাড়া বুড়োর কাছে যেতো, বুড়োর সেবাযত্ন করতে আমিই বলেছিলাম। বুড়ো ওকে স্নেহ করতো, কিন্তু দরিয়ার বুকে জাহাজ, কোন সময় কী হয়ে যায় বলা যায় না। পোলাইয়া সারা জীবন শাদী করেনি—জাহাজ-জাহাজ করেই কাটিয়েছে, মাটিতে নেমে ফুর্তি করতে ওকে কখনো দেখিনি। লেকিন, নসীবের খেলা কে বলতে পারে? বুকের ভিতরটা পুড়ে গেলেও পোলাইয়ার ওপর আমি রাগ করিনি—তাকে দোষও দেই নি। আমি তার মনটাকে বুঝতে পারি সাব। বেশ বুঝতে পারি, আশার সঙ্গে ঐ ঘটনা ঘটবার পর পোলাইয়া মনে মনে কী যন্ত্রণাই না পেয়েছে! সে ত সাব শয়তান ছিল না, সে ছিল সাচ্চা মানুষ; কাউকে কিছু বলতেও পারতো না, নিজের কাজের অনুতাপে নিজেই পুড়ে মরতো। চার-চারটা মাস

তার এইভাবে কেটেছে। আশা তাকে টিউটিকোরিনে মুক্তি না দিলে এ যন্ত্রণা সে আর কতদিন সহ্য করতে পারতো কে জানে।

ও থামলো। বললাম,—বুড়োর ছেলেকে বুড়োর হাতে তুলে দিলেই তো পারতে।

পোতরাজু আমার চোখের দিকে তাকালো, বললো,—না সাব, তা হয় না। আমি জানতে পেরেছি বুঝলেই ও বিষ খাবে। আর তাছাড়া ছেলেকে নিয়ে ও রাখবে কোথায়? কে আছে ওর?

পোতরাজু ম্লান একটু হেসে বললে,—নসীবের খেলা দেখুন, নিজের ছেলেকে নিজের জাহাজে ও রাখতে পারলো না।

বললাম,—তাহলে আমি গিয়ে ওকে সব কথা খুলে বলবো?

আমার হাত দুটো চেপে ধরলো পোতরাজু, বললো,—না সাব না, আমাকে আপনি কথা দিয়েছেন। আমাকে শুধু ওর জাহাজে নিতে বলুন।

বললাম,—আচ্ছা পোতরাজু, আশার যখন খোঁজ পেয়েছো তখন জাহাজে যেতে চাইছো কেন?

পোতরাজুর মুখখানা থমথমে হয়ে উঠলো, চোখের পাতা বুঝি ভিজে উঠলো। কাঁপা গলায় বললে,—সাব আশা আর নেই। হাসপাতাল থেকে খৎ এসেছে। সে যখন নেই, তখন জাহাজ ছাড়া আমার আর জায়গা কোথায় বলুন? ছেলের ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। ঐ মেয়েটির দারুণ ছেলের শখ, ও ছেলেটাকে ঠিক ভালবাসবে। যত্ন করবে, মানুষ করে তুলবে। যখন কাকিনাদায় আসবো তখন ওকে দেখে যাবো, টাকা দিয়ে যাবো।

বলা বাহুল্য, পোতরাজুর শর্ত অনুযায়ী পোলাইয়াকে আমি সবকিছু খুলে বলতে পারি নি। আমার প্রস্তাবে সে কিছুতেই রাজী হয় না, অনেক বলা-কওয়ার পর জাহাজ ছাড়ার আগের দিন সে রাজী হলো। পোতরাজু উঠলো গিয়ে তার জাহাজে।

পরদিন মিঃ রামলুর অফিসে আমাকে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা দুজন জেটিতে যখন গিয়ে পৌঁছিলাম, তখন দেখি জাহাজটা তীর ছেড়ে অনেকদূর চলে গেছে। দূরে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে একটি পালতোলা কাঠের জাহাজ চলেছে।

মিঃ রামলু বললো—ঐ দেখুন পোলাইয়ার জাহাজ।

বললাম,—হ্যাঁ। পোলাইয়া আর পোতরাজুর জাহাজ।

মিঃ রামলু আমার কথাটা খেয়াল করেনি! করলেও আমি কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না। ওর মতো নিঃসীম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শুধু ঐ সারস পাখীর মতো পালতোলা জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার আর করবার বা বলবারই বা ছিল কী?

জাহাজটা তখন ছুটে চলেছে সিংহল বা শ্রীলঙ্কার দিকে, আমি জানতাম

ওদের জাহাজ গিয়ে ভিড়বে 'গ্রিন্-কো-মাল্যো'তে—যার নাম সাহেবদের আমলে ছিল 'টিন্‌কো মাল্লি!'

॥ ৮ ॥

আমার মূল কেন্দ্র ছিল বিশাখাপত্তন বা ওয়ালটেয়ার। সমুদ্রতীরে একটি সুন্দর বাড়ির ততোধিক সুন্দর ঘরে তখন ছিল আমার আস্তানা। পাঁচটি বড়ো বড়ো জানালা। সমুদ্রশিয়রী জানালার দিকে যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে দৃকপাত করতাম, দেখে মনে হতো জানালায় বুঝি নীল পর্দা ঝুলছে।

অর্থাৎ শুয়ে শুয়েই হতো আমার সমুদ্র দর্শন। সমুদ্র দেখতে দেখতে সমুদ্র ভ্রমণের ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক, তার ওপর যখন এক জাহাজী ঠিকাদার কোম্পানীর স্থানীয় কর্ণধার হয়ে কাজকর্ম করছি।

বলা বাহুল্য, আর একটি সুযোগ বছরখানেকের মধ্যেই এসে গেল। এবার রওনা হলাম বোম্বাই বন্দর থেকে। বিশাখাপত্তনে তখন অন্তত মাস দুয়েক আমাদের কাজের জাহাজ আসার সম্ভাবনা ছিল না, তাই 'গোয়াতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি,' এই ধুয়ো তুলে বোম্বের বন্দরে একটি মালবাহী জাহাজে উঠে বসলাম কনিষ্ঠ কেরানীর সাময়িক চাকরি স্বীকার করে। জাহাজটি ছোট এবং একটি পরিচিত ইংরেজ কোম্পানীর।

জাহাজ ছিল বিলেতগামী। তা না হলে এরকম করে হেডঅফিসে প্রকৃত কথা না জানিয়ে ছুটে আসি? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিলেত বা ইয়োরোপ যাওয়া আমার ভাগ্যে নেই। সেক্সপিয়রের স্টাটফোর্ড-অন-অ্যাভন দেখার স্বপ্ন নিয়ে যখনই দেশের বন্দর থেকে নোঙর তুলেছি, তখনি শুনতে পেয়েছি জাহাজটি গতিপথ বদল করে কোন এক অখ্যাত দ্বীপের দিকে যাত্রার আদেশ পেয়েছে। জাহাজের যেবার বেলজিয়াম যাবার কথা, সেবার সে বড়ো জোর আলেকজান্দ্রিয়া, কি পোর্ট সৈদ, অথবা এডেন পর্যন্ত গিয়ে তার যাত্রা শেষ করতে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে হতাশ হয়েছি, দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু আজ মনে কোনো খেদ নেই। আজ জীবন সায়াহ্নের তটরেখায় দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছি, যা পেয়েছি তা-ই কি কম? যে যে-টুকু দিয়েছে, তা-ই আমার কাছে বিপুল সম্পদ!

যেমন ধরা যাক এডেনের কথা। এডেনের সেই ফুলওয়ালী মেয়েটিকেই কি ভুলতে পেরেছি? এডেন বলতেই প্রথমে যার মুখ ভেসে ওঠে, সে হচ্ছে সেই ফুলওয়ালী মেয়েটি! আমার কাছে সে এডেনের অন্যতম প্রতীক, রুক্ষ পর্বত আর মরুর বুকে অবিশ্বাস্যরূপে ফুটে ওঠা একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল!

এডেন যাবার পথে আরব সাগরে জাহাজের দোলানি ছিল সাংঘাতিক। প্রথম দিন অস্থির অস্থির করলেও পরে শরীর আমার ঠিকই ছিল। এডেনের খাড়ি বা 'গাল্‌ফ অফ এডেনে'র মুখের কাছে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা

'সকোত্রা'-দ্বীপের 'হাদিবা' বন্দরকে পাশে রেখে যখন এডেনের কাছাকাছি এসেছিলাম, সমুদ্র তখন শান্ত রূপ ধারণ করেছিল।

এই এডেনের সঙ্গে দুঃখময় একটি স্মৃতি বিজড়িত যা ভারতবাসী মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত। ১৮৫৭-র সিপাহী-জাগরণের পরের কথা। মহারাষ্ট্রের এক তরুণের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা দুর্বার হয়ে জেগে উঠেছিল। পাহাড়ীদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে সেই তরুণ এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে ইংরেজ শাসককে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। এঁর নাম বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। লোকে বলতো, দ্বিতীয় শিবাজী। ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসে এঁকে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করলো ব্রিটিশ সরকার। বিচারে লাভ করলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। নির্ভীক বীর দ্বিতীয় শিবাজীকে হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে এই এডেনেই নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল কারাগারের কোনো নিভৃত কক্ষে। সেখানেই শেষ নয়, অমানুষিক নির্যাতন চলতো তাঁর উপর। অমন অটুট শরীর তাঁর ভেঙে পড়লো, কোনো চিকিৎসাও হলো না। তাঁর দেশবাসী, আত্মীয় স্বজন কেউ জানতে পারলো না তাঁর কথা, ১৮৮০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি দেহত্যাগ করলেন দ্বিতীয় শিবাজী।

আমাদের জাহাজ এসে বয়ার সঙ্গে বাঁধা পড়ে রইলো নীল জলরাশির ওপর। দূরে রুক্ষ পর্বতশ্রেণী দেখা যায়, তার পায়ের কাছে কোথাও কোথাও বালিয়াড়ির স্তূপ চোখে পড়ে। এই মরুসদৃশ বালুবেলারই ওপর গড়ে উঠেছে এডেন বন্দর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে জাহাজে এডেন পেঁছেছিলেন ভোরবেলায়। তাই তিনি দেখেছিলেন, 'পর্বতের উপর রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।'

অবসন্ন আমরাও হয়ে পড়েছিলাম। আমরা পেঁছেছিলাম বেলা দশটা নাগাদ। কিন্তু আমার কাজকর্ম যখন চুকলো, তখন একটা বেজে গিয়েছিল।

ততক্ষণে চলে গেছে এজেন্টের প্রতিনিধি, পুলিশ ও কাস্টমস্। ওদের লঞ্চে করে আমাদের চীফ স্টুয়ার্ড আর কে কে যেন শহরে চলে গেছে।

সাদা সাদা সী-গাল পাখীগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল, আর একটি ছোট্ট মোটর-বোট নীল জলের মধ্য দিয়ে শুভ্ররেখা কেটে কেটে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলেছে। রেলিং ধরে সেই দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ চমক ভাঙলো একটা তীক্ষ্ন শিস দেওয়ার শব্দে। লক্ষ্য করে দেখলাম, পাঁচ নম্বর 'ফল্কা'র (জাহাজের গহ্বর, যাতে মাল থাকে) কাছ থেকে একটি লস্কর সমুদ্রের বুকে কী দেখে সজোরে শিস দিয়ে উঠলো। তার দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, জাহাজের পিছন দিক থেকে একটি ছোট পানসি করে জাহাজের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটি মেয়ে। দিনের পড়ন্ত আলোয় দৃশ্যটা অদ্ভুত লাগছিল। পরণে নীল ওড়নার নিচে গোলাপী লম্বা জামা, টকটকে লাল রঙের সালোয়ার-জাতীয় পায়জামা। পানসিটার পিছন দিকে

দাঁড়িয়ে সে হাল চালনা করছিল দু'হাতে ধরে। পানসিটা গতিবেগ পেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, আর সেই এগিয়ে চলার ছন্দে তার শরীরটা দুলছে।

দেখতে দেখতে সেই শিস দেওয়া লস্করটির কাছে জুটে গেল আরও লস্কর। সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো মেয়েটিকে। কারণ, অভিজ্ঞরা পরে আমাকে বলেছিল, এডেনে এ-রকম 'মেয়ে' দেখা একেবারে অভাবিত এবং বিস্ময়কর !

যাই হোক, পাঁচ নম্বর ফল্‌কাটা হচ্ছে পিছন দিককার সর্বশেষ ফল্‌কা। সুতরাং ওখান থেকে লস্কররা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মেয়েটিকে। ওদের সঙ্গে একটি সমান্তরাল রেখায় মেয়েটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, আমরা দোতলায় জাহাজের ষ্টারবোর্ড সাইডের রেলিং-ধরে যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, তার নিচে।

বলা বাহুল্য, রেলিং-এ আমি ততক্ষণে আর একা নই, আরও দু-চারজন অফিসার এসে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে তরুণ ফোর্থ অফিসারটিও ছিল। সে মেয়েটিকে দেখতে দেখতে একসময় অস্ফুট জড়িত গলায় বলে উঠলো, নাইস ষ্টাফ !

আমি তখন ফুল দেখছিলাম। কয়েকটা চুবড়ি বোঝাই ফুল। এখান থেকে গোলাপ বলে মনে হচ্ছে। ভারী সুন্দর ফুলগুলি, বেশ বড়ো। ঘোর লালও আছে, অপেক্ষাকৃত হালকা লালও আছে।

ফুল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেয়েটির মুখের ওপর রাখলাম। মেয়েটি অবশ্যই তরুণী, মুখখানিতে প্রসাধনের প্রলেপ হয়ত একটু আছে, কিন্তু আরক্তিম দেহ-বর্ণ, তীক্ষ্ম নাসিকা, আর বড়ো বড়ো দুটি চোখের দৃষ্টি, সব মিলিয়ে সেই গোধূলি লগ্নে মেয়েটিকে অপূর্ব সুন্দরীই মনে হয়েছিল !

কিন্তু অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মেয়েটি জাহাজে আসছে কেন ? জাহাজের সাধারণ সিঁড়ি অর্থাৎ গ্যাঙ-ওয়ে ফেলা ছিল না, ফেলা ছিল পাইলট্‌স ল্যাডার বা দড়ির সিঁড়ি।

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম, মেয়েটি দড়ির সিঁড়ির সঙ্গে তার পানসিটা বেঁধে দু-হাতে দড়ির প্রান্ত ধরে ঝুলতে ঝুলতে, দুলতে দুলতে ওপরে উঠতে লাগলো।

জাহাজশুদ্ধ তখন রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। এমন কি ইঞ্জিন-রুম আর স্টোক-হোল্ডে যারা ডিউটিতে ছিল, তারাও খবর পেয়ে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় একে একে ওপরে উঠে আসতে লাগলো। কারুর মুখে কোনো কথা নেই, সবাই এদিক ওদিক থেকে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে দেখতে লাগলো বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে।

মেয়েটি আমাদের অদূরেই তিন নম্বর হ্যাচ বা ফলকার নিকটবর্তী জাহাজের রেলিং বা বুলওয়ার্কের কাছে সিঁড়ির সাহায্যে উঠে এলো। ওখানকার ডেকে দাঁড়িয়ে বোধহয় একটু দম নিলো। তারপরে আমাদের দিকে ফিরে অল্প একটু হাসলো, বললো, – হ্যালো !

আশ্চর্য ! গলার স্বরটিও অদ্ভুত মিষ্টি ! ফোর্থ প্রত্যুত্তরে 'হ্যালো' বলে

হাসতে গিয়েও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তার পরে একটু সময় নিয়ে গলার স্বর গম্ভীর করে বললো,—হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট ? কী চাও ?

মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করে বললে,—ফ্লাওয়ার। ডোণ্ট লাইক ফ্লাওয়ার ?

ফোর্থ এবার হেসে ফেললো। সেই হাসিতে প্রশ্রয় পেয়ে মেয়েটি তার ঠোঁটের হাসিকে আরও বিস্তৃত করলো। ফোর্থ আবার গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো। বললে,—কই, কোথায় তোমার ফুল !

মেয়েটি তির্যক দৃষ্টিপাতে ওকে যেন বিদ্ধ করতে চাইছিল। বললে,—নৌকা করে যখন আসছিলাম, তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখোনি ?

ফোর্থ ওর কাছে যায়নি, একটু দূর থেকেই কথা বলছিল। একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলো ক্যাপ্টেনকে দেখা যাচ্ছে কি না। ক্যাপ্টেন ব্রিজে বা ডেকে কোথাও নেই, নিশ্চয় তাঁর ঘরের কোটরে বসে আছেন।

ফোর্থ তার পরে তাকালো জাহাজটির সামনে, পিছনে। এখানে ওখানে জটলা, যেন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেছে লস্কররা। কেউ কোনো কথা বলছে না, কিন্তু সবারই লক্ষ্য ওই তরুণী ফুলওয়ালীর উপর। ফোর্থ সবার দিকেই একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, তার পরে আবার তাকালো মেয়েটির দিকে। একটা হাত কোমরে রেখে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি।

আমাদের কাছে ততক্ষণে আরও কয়েকজন অফিসার এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তারা দর্শক মাত্র, ফোর্থ অফিসারের মতো এগিয়ে গিয়ে কথা বলার উৎসাহ তাদের মনে তখনো সঞ্চারিত হয় নি।

মেয়েটি বললে, আমাকে একটু সাহায্য করবে ?

ফোর্থ বললে, কী সাহায্য ?

—একটা দড়ি দেবে ?

—দড়ি ? দড়ি দিয়ে কী করবে ?

মুচকি হাসলো মেয়েটি, বললে, দেখো না কী করি !

বলতে বলতে মেয়েটি আবার রেলিং ধরে 'রোপ ল্যাডার' বেয়ে নিচে নামবার উপক্রম করলো। নিজের দেহটাকে রেলিং-এর উপর ন্যস্ত করে মুখ বাড়িয়ে আবার তাকালো ফোর্থ অফিসারের দিকে। বললে, আমি নিচে নেমে যাচ্ছি। তুমি একটি লম্বা দড়ি নিয়ে তার একটি প্রান্ত নিচে—আমার কাছে নামিয়ে দাও, আর অন্য প্রান্তটা শক্ত করে ধরে থাকো। কেমন ?

মেয়েটি কথা শেষ করে আর অপেক্ষা করলো না, তর তর করে নিচে নেমে গেল। আর একজন অফিসারের উৎসাহ ততক্ষণে বেড়ে গেছে। ফোর্থ অফিসারকে জাহাজে সবাই 'জনি' বলে ডাকে। একটু লম্বাটে চেহারা, গালের পাশ দিয়ে বড়ো জুলপি রেখেছে, তার সঙ্গে মানানসই গোঁফ। একটু বেপরোয়া ধরনের হৈ-হৈ করা মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব। মাথার চুল, গোঁফ, সবই একটু লালচে ধরনের। চাপা গলায় সে ডেকে উঠলো,—বসুন ! (লসকরদের সর্দারকে বলে, বসুন)

ঈষৎ স্থূলকায় সে ব্যক্তি অদূরেই দাঁড়িয়েছিল কোমরে হাত দিয়ে। গায়ে হাত কাটা সাদা গেঞ্জি, পরনে আঁটোসাঁটো নীল প্যান্ট। জনির ডাকে সাড়া দিয়ে সে বললে, বুঝতে পেরেছি, আনছি।

জাহাজে বসন্ত-এর কাছে সরু অথচ খুব শক্ত একরকম দড়ি থাকে, গুটিয়ে গুটিয়ে গুলি করে রাখা। সেরকম একটা গুলি-করা দড়ি এনে বসন্ত জনির হাতে দিতে গিয়েও দিলো না, নিজে রেলিং-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে দড়ির একটা প্রান্ত নিজের কাছে রেখে গুলিটা ছুঁড়ে দিলো নৌকোর দিকে।

মেয়েটি প্রায় লুফেই নিলো গুলিটা। তারপরে ক্ষিপ্র হাতে একটা ফুলের চুবড়ির হাতলে সেটা বেঁধে আমাদের দিকে ইশারা করলো সেটা উঠিয়ে নিতে।

উৎসাহ আমাদের কারুরই মনে কম ছিল না, কিন্তু বসন্ত কারুর হাতেই দিল না দড়ির প্রান্ত, নিজে টেনে টেনে উঠিয়ে নিলো চুবড়িটা।

ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বড়ো বড়ো গোলাপ, টকটকে লাল আছে, ফিকে লালও আছে। যাকে বলে, 'বসরাই গোলাপ।' এছাড়া টিউলিপ, হলিহক, ক্রিসেনথিমাম বা ঐ ধরনের ফুলও ছিল। আমরা কজন ঝুঁকে পড়ে ফুলগুলি দেখছিলাম।

ইতিমধ্যে বসন্ত দড়ির সাহায্যে আরও তিন ঝুড়ি ফুল তুলে আনলো। শেষ ঝুড়িটি তোলা হয়ে গেছে, মেয়েটিও দড়ির মই বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে দুলতে দুলতে ওপরে উঠে সবে রেলিং টপকেছে, এমন সময় ওপর থেকে একটা গম্ভীর অথচ ধারালো কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হোয়াট্‌স আপ ?

চাপা স্বরে জনি বলে উঠলো, এই রে, সর্বনাশ হয়েছে ! ওল্ডম্যান !

ক্যাপ্টেনের নামে সব মুখগুলোই একে একে অন্তরালে অপসৃত হতে লাগলো। শুধু বসন্ত একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে দু-নম্বর হ্যাচের কাছে তাড়াতাড়ি সরে গেল। তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে হেঁকে বললে, স্যার, ফুল। ভারী সুন্দর সুন্দর ফুল।

বসন্ত-এর কাছেই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সেই মেয়েটা। ওপর থেকে ক্যাপ্টেন ভারী গলায় কী যেন বললে আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বুঝলো বসন্ত, সে উত্তরে 'যে আজ্ঞে' গোছের কী একটা কথা উচ্চারণ করে মেয়েটিকে কী যেন নিচু গলায় বললো। মেয়েটি মুখ কালো করে ফুলের ঝুড়িটি হাতে নিয়ে আমাদের থেকে আরও দূরে,—এক নম্বর হ্যাচ ছাড়িয়ে জাহাজের প্রায় মুখের কাছে ডেক্-এর উপরে গিয়ে বসলো।

বসন্ত আমাদের কাছে ছুটে এসে অন্য ঝুড়িগুলো হাতে নিলো। বললে, ফুলের দোকান ওখানে বসবে, যার দরকার, ওখানে হেঁটে গিয়ে কিনে নিয়ে আসবে, কর্তার হুকুম।

জাহাজের ক্যাপ্টেন বড়ো কড়া লোক, তার ভয়ে সবাই অস্থির। তবু যে তিনি দোকান বসাবার হুকুম দিয়েছেন, এতেই যেন একটু স্বস্তি পেল সবাই।

দেখা গেল বসন্ত নিজেই একটি ঝুড়ির ক্রেতা। দর-দস্তুর করে একটি ঝুড়ি

সে নিয়ে উঠে এলো আমাদের কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কী হে, কিনলে নাকি ?

বসন্ একটু হেসে বললে, আমি না, কর্তা।

বলেই ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে।

আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্বয়ং কর্তা অর্থাৎ ক্যাপ্টেন যখন এক ঝুড়ি কিনেছে, তখন আর আমাদের পায় কে ?

বোধ হয় মিনিট পনেরোর মধ্যে ফুল-ওয়ালীর সব ফুল বিক্রি হয়ে গেল। ওর খোঁপায় ছিল একটি ফুলের কুঁড়ি। ফিকে লাল গোলাপের কুঁড়ি। সেটিকে বার করে আনলো অবশেষে। ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, জাহাজের সব আলো জ্বলে গেছে। কোথায় কে যেন কোথাকার ষ্টেশন ধরেছে রেডিওতে, গীটারের বিলম্বিত মৃদু ঝংকার ভেসে ভেসে আসছে বিরহীর বিলাপের মতো।

মেয়েটির মুখের ওপর মাস্তুলের আলোর রেখা এসে পড়েছে। মেয়েটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। চোখে বিদ্যুতের বহ্নি, আমাদের দিকে কুঁড়িটি মেলে ধরলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কতো দাম ?

সে এমন একটা দাম বললে, যা চার ঝুড়ি ফুলের দামের চেয়েও বেশি। আমি অবাক হয়ে বললাম, সামান্য কুঁড়ির এত দাম কেন ?

সে মুচকি হাসলো, আর কিছু বললো না। জনির বুকখানা উত্তেজনায় ওঠানামা করছে, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললে, বুঝলে না ? মেয়েটা নিজেকেই দিতে চাইছে। কুঁড়িটা তার নিজের দেহের প্রতীক।

দেখতে দেখতে সারা জাহাজে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। আবার এদিকে ওদিকে সবার মুখগুলোকে উঁকি দিতে দেখা গেল। টাকা অনেকের কাছেই আছে, কুঁড়িও সহজলভ্য, কিন্তু কিনবে কে ? ক্যাপ্টেন এসব বিষয়ে বড়ো কড়া লোক, কারুর এতটুকু বে-চাল সহ্য করবেন না। বিশেষ করে জাহাজের ওপরে ? সর্বনাশ ! তাছাড়া, ওল্ডম্যানকে লুকিয়ে ?

জনি মুখ ফিরিয়ে বললো, ব্রীজের কোণের দিকে তাকিয়ে দেখো, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা একে একে যে যার জায়গায় ফিরে এলাম। জনিই ছটফট করতে লাগলো বেশি। মেয়েটি কিন্তু চুপ করে বসে রয়েছে ডেকে। বসন্ একসময় এসে ওর শূন্য ঝুড়িগুলো দড়িতে বেঁধে নিচে নৌকোয় নামিয়ে দিলো। এখন নৌকোয় নেমে দড়ির গিঁট ঝুড়ি থেকে খুলে নিলেই হয়। কিন্তু মেয়েটি তখনো নড়ে না, ঠায় বসে রইলো গোলাপের কুঁড়িটি হাতে করে।

আমি গিয়ে বসন্‌কে সব বললাম। বসন্ বললে, আমি জানি। কর্তাও জানে। ঠিক ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটিকে আনা অসম্ভব। এটা যদি না জানতাম, তাহলে আমিই কি ছেড়ে দিতাম নাকি ?

বললাম, তোমার কথা ছেড়ে দাও, জনি যে ওদিকে পাগল হয়ে উঠলো।

বস্‌নে বললে, পাগল হয়ে আত্মহত্যা করলেও কর্তাকে টলাতে পারবে না।

বস্‌নে চলে গেল। আমি, জনি এবং আরও দুজন অফিসার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখনো সে বসে আছে, হাতে তার সেই ফুলের কুঁড়ি।

শেষ পর্যন্ত জনি আর থাকতে পারলো না, বললে,—যা থাকে কপালে, ঐ 'কুঁড়ি' আমি কিনবোই!

বলে, পাগলের মতো ছুটে গেল মেয়েটির দিকে।

বলা বাহুল্য, জনির দোষ নেই, পাগল-করা রূপই বটে মেয়েটির! কিন্তু সে ছুটে মেয়েটির কাছে পৌঁছবার আগেই ওপর থেকে ধারালো কণ্ঠ ভেসে এলো, জ-নি!

জনির গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে, সে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ইয়েস স্যর?

ওপর থেকে ক্যাপ্টেন হেঁকে বললেন, শুনে যাও?

অগত্যা কী আর করা যায়, জনি ভালো ছেলেটির মতো ধীর পায়ে হেঁটে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। কী কথা হয়, না হয়, জানবার জন্য নিচে আমরা ক'জন উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। একটি করে সেকেণ্ডের কাঁটা সরে যাচ্ছে ঘড়িতে, আর আমরা তত অধৈর্য হয়ে উঠছি!

অবশেষে, একসময় সেই মহা-প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এসে উপস্থিত হলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, জনি উত্তেজিত পদক্ষেপে নেমে এলো। আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হলো?

জনি একটু দম নিয়ে বললে, ওল্ডম্যানের সঙ্গে চটাচটি হয়ে গেল। আমি বললাম, যদি ওকে আমি বিয়ে করি?

—বিয়ে!—আমরা সবিস্ময়ে বলে উঠলাম।

জনি বললে, কেন নয়? দেশে, আমার কে আছে? ছন্নছাড়া আমার জীবন। আমি বিয়ে করে যদি এখানেই থেকে যাই, ত, কার কী ক্ষতি? একে ত প্রথম বিস্ময়, এডেনে মেয়ে! তার ওপরে এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখেছি! ইয়োরোপিয়ান ফিগার আর ওরিয়েণ্টাল কালো চোখের তারা আর রেশমি নরম কালো মাথার চুল! আমি এখুনি যাচ্ছি মেয়েটির কাছে প্রপোজ করতে!

—মেয়েটি না হয় আকাশের চাঁদ পাবে হাতে,—আমি বললাম,—কিন্তু ওল্ডম্যান কি এতে রাজি হয়েছে?

—রাজী!—চোখদুটো কপালে তুলে জনি বললে,—ক্যাপ্টেন বলেছে, ওসব পাগলামী যদি করতে চাও, এখুনি জাহাজ থেকে নেমে যাও। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি এখখুনি যাচ্ছি।

বলে আমার হাত ধরে ফেললো জনি, তুমি মেয়েটিকে বলো আমার কথা। আমি আমার স্যুটকেশটা গুছিয়ে নিচ্ছি এক মিনিটের মধ্যে।

আর দাঁড়ালো না, গট গট করে চলে গেল নিজের কেবিনের দিকে। আমরা সবিস্ময়ে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কে একজন

বললো, চলো মেয়েটির কাছে আমরা সবাই যাই। একা গেলে ক্যাপ্টেন ধমকাবে, দল বেঁধে গেলে কিছু বলবে না।

—তাই চলো।

মেয়েটা তেমনি ব'সে আছে ফুলের কুঁড়ি হাতে, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,— আচ্ছা, তুমি কি বিবাহিতা?

সে ভ্রু কুঞ্চিত করে বললে, কেন বলো ত?

—না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

মুচকি হাসলো সে। বললো—তাহলে খোঁপায় এই কুঁড়িটি রাখতাম না, রাখতাম ফোটা ফুল।

—বিয়ে করবে?

সে সবিস্ময়ে বললে, কাকে!

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সে। আমাদের মধ্যেকার একজন একটু দম নিয়ে বললে, আমরা কেউ নই। সে আসছে তার জিনিষপত্র আর টাকাকড়ি নিয়ে। তোমাকে বিয়ে করবে বলে পাগল হয়ে গেছে।

মেয়েটির মুখখানা রাঙা হয়ে উঠলো। মুখ নিচু করলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে সে-ই দেখতে সব থেকে সুন্দর। তোমার পছন্দ হবে।

মেয়েটি মুখ তুললো, বললে, সরো, আমি যাই।

—সে কী! যাবে কেন?

মেয়েটি আর কিছু বললো না, এগিয়ে গেল রেলিং-এর কাছে। বললাম, বিয়েতে তোমার মত নেই?

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গোলাপের কুঁড়িটি তার খোঁপায় গুঁজে রাখলো, তারপর রেলিং টপকে দড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামবার উপক্রম করতে করতে বলে উঠলো, তাকে বোলো, আমি তাকে বলেছি, ইডিয়ট্। আহম্মক। বোকা।

আর তাকে দেখা গেল না। সে জাহাজের গা বেয়ে তর তর করে নামতে লাগলো। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ব্রীজের উপর ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন চুপ চাপ।

আমি তখন ছুটে গেলাম জনির কেবিনে। জনি সত্যি সত্যি ক্ষিপ্র হাতে সুটকেশ গোছাচ্ছিল। আমরা তাকে 'দেখে যাও' বলে টেনে আনলাম রেলিং-এর ধারে।

ছোট পানসি-নৌকোয় ছোট একটি হারিকেন জ্বলছে। সমুদ্রের বুকে সে একা নৌকো চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তীরের দিকে। অন্ধকারে তাকে আর দেখা যায় না, শুধু আলোটাকে লক্ষ্য করা যায়, একটি বিন্দুর মতো সরে সরে যাচ্ছে বন্দরের দিকে। জনি প্রায় চিৎকার করে উঠলো, ওকে তাড়ালো কে?

আমরা বললাম, কেউ ওকে তাড়ায়নি। একাই ও চলে গেল।

—তোমরা আমার কথা বলেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কী উত্তর দিলে?

আমরা চুপ করে রইলাম। জনি আবার তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, বলেছিলে কী, আমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম? মুহূর্তের বিলাস-সঙ্গিনী নয়, চিরদিনের জীবন-সঙ্গিনী করতে চেয়েছিলাম?

—বলেছিলাম।

—তবু চলে গেল!

—হ্যাঁ।

জনি লোহার রেলিং দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো, ইডিয়ট্! আহাম্মক! বোকা!

আলোর বিন্দুটি তখন তীরে গিয়ে পেঁছেছে।

শুধু জনি বা সেই ফুলওয়ালীই বা কেন, এডেনের সঙ্গে আরও একটি মানুষের স্মৃতি বিজড়িত। সে-রাত্রে আমাদের কারুরই তীরে যাবার হুকুম ছিল না। ভোরে জাহাজ জেটিতে গিয়ে ভিড়লো কয়লা নেবার জন্য। পরদিন সকাল দশটা নাগাদ আমাকে জাহাজের কাজেই এজেণ্টের অফিসে যেতে হবে, ফেরবার সময় একটু ঘুরে ঘুরে শহর দেখে ফিরবো, এই ইচ্ছে। চীফ কুক্‌কে বললাম, আজ দুপুরে আমি জাহাজে খাবো না, বাইরে লাঞ্চ সেরে নেবো।

কুক্ মুচকি হেসে বললে, লাকি ডগ!

—কেন?

কুক্ বললে, তুমি যেতে পারলে, আমরা যেতে পারছি না, আমাদের ছুটি নেই! তার মানে শহর দেখা আর হবে না, কাল ভোরেই তো জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে।

বললাম, একা একা শহরে যাবো? জনিকে সঙ্গে নেই, কেমন?

কুক ঠোঁট উল্টে বললে, তোমার খুশি!

কিন্তু জনিকে তার কেবিন থেকে বার করা গেল না। রেডিও খুলে কোন্ দূর দেশের যন্ত্রসঙ্গীত শুনছিল সে। বললাম, চলোই না, সেই ফুলওয়ালীর সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে!

জনি বিরক্ত হয়ে বললে, কী হবে দেখা হয়ে?

একটু হেসে বললাম, আবার বলা-কওয়া করে দেখো না, তোমার প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত সে রাজী হয়েও যেতে পারে।

জনি এবার আমাকে বলে উঠলো, ইডিয়ট্।

অগত্যা একাই গেলাম। এডেন শহরটা ছোট, কিন্তু অদ্ভুত দেখতে! দুই পাহাড়ের মাঝখানে শহর। মাঝখানে শহরটাকে রেখে দুপাশে ঠেলে উঠেছে

পাহাড়। পাহাড়গুলো ন্যাড়া, গাছপালা নেই বললেই হয়। আমি যতো এগোচ্ছি, ততই দেখছি সবুজের চিহ্ন মাত্র কোথাও নেই। হলদে, গেরুয়া আর কালো, এই তিনটি রঙ দিয়ে খেয়ালী শিল্পী যেন এক বিচিত্র ছবি এঁকে রেখেছে। সেই ছবির রেখাগুলিতে কোনো মাপ-জোখ নেই। অসমান, ছোট বড়ো, এলোমেলো।

কিন্তু শহরে নামবার পর খুব একটা তাড়া অনুভব করছিলাম না। হাতের পোর্টফোলিও ব্যাগটা নিয়ে আস্তে আস্তেই হেঁটে চলছিলাম। আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আচ্ছা, যদি দেখা হয়ে যায় সেই ফুলওয়ালীর সঙ্গে?

কিন্তু দুটি চোখ উন্মুখ হয়ে এধারে ওধারে দৃষ্টিপাত করলেও তার দেখা মিললো না। শহরের মূল রাস্তাটা পাথর বাঁধানো, এমন কিছু চওড়া নয়, দুপাশে দোকানের সারি। আমি দু-একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এজেন্টের অফিস খুঁজে বার করলাম। বড়ো রাস্তা দিয়ে কিছুটা হেঁটে যাবার পর একটা ছোট গলি। গলিটা আবার একটু উঁচু হয়ে গেছে শেষের দিকে।

এজেন্টের অফিসে আমার কাজকর্ম মিটে গেল মিনিট কুড়ির মধ্যেই। এখন আমি মুক্ত। শহরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারি। বড়ো রাস্তাটা ধরে অলস গতিতে এগিয়ে চলেছি, আর দুপাশের দোকান থেকে আহ্বান আসতে লাগলো, কাম স্যর। হ্যাভ এ লুক।

আমাকে শাঁসালো খদ্দের বলে ঠাউরেছে আর কী! আমি মাথা নেড়ে 'না' বলতে বলতে চলতে লাগলাম, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম হিন্দুস্থানী কথা শুনে। একটি দোকান থেকে ভেসে এলো, আইয়ে?

আমি বাঙালী, কিন্তু হিন্দীওতো আমার দেশের ভাষা, বিদেশে সেটাই কানে মধু বর্ষণ করলো। আমি সে ডাক উপেক্ষা করতে পারলাম না, দোকানের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

বেশ সাজানো গোছানো দোকান। যাকে বলে 'কিউরিও শপ': হেন জিনিস নেই যা সেখানে পাওয়া যাবে না। কাশ্মীরী কার্পেট থেকে শুরু করে তিব্বতী চামর পর্যন্ত সবই সাজানো রয়েছে।

ক্রেতা তখন দোকানে ছিল মাত্র একটি। মানুষটি আরব দেশেরই হবে। বেশ লম্বা চেহারা, খাড়া নাক। তামাটে দেহের বর্ণ। মাথার ওপরে কাপড় বাঁধা। কপালের ওপর দিয়ে লাল মোটা সুতো দিয়ে টান করা! সুতো না বলে দড়ি বলাই ভালো।

লোকটি কী একটা কাপড়ের টুকরো দেখছিল, আমার দিকে একবার ফিরে তাকালো মাত্র। দাড়ি গোঁফ কামানো, চেহারায় রুক্ষতা থাকলেও বয়স বেশি বলে মনে হয় না। সম্ভবত তিরিশের নিচে অর্থাৎ আমারই বয়সী। আমি এগিয়ে গিয়ে একজন দোকানীর সামনে দাঁড়ালাম, বললাম, আপনারা ইণ্ডিয়ান?

লোকটির মুখখানা খুশিতে ভরে গেল। বললে, আপনিও নিশ্চয় ইণ্ডিয়ান। আমরা দেখেই বুঝতে পারি।

বললাম, আপনারা কোন্ প্রদেশের ?

—আমরা সিন্ধী। আপনি ?

—বাঙালী।

কথাটায় ওদের বিস্মিত হবার কিছু নেই, কিন্তু বিস্মিত হয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালো সেই উন্নত নাসা আরব তরুণটি।

আমি দোকানীদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম, আর লোকটি কী একটা কাপড়ের টুকরো কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। দোকানে আমি ছাড়া আর ক্রেতা রইলো না তখন। ওরাও যে আমাকে কোনো কিছু বিক্রি করবার জন্য ব্যস্ত, তা নয়। ওরা দেশের কথা নিয়েই গল্প করতে লাগলো। অথচ, কোথায় সিন্ধু প্রদেশ, আর কোথায় বাংলা !

জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন দেশে যান না আপনারা ?

ওঁদের মধ্যে যে ভদ্রলোক বর্ষীয়ান, বয়স হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, একটু ম্লান হেসে বললেন, দেশ আর কোথায় বাবুজী ? আমাদের দেশ চলে গেছে পাকিস্তানে। বোম্বাইতে আমাদের কিছু জ্ঞাতি আছে, আমরা ছোট থেকেই এই দেশে আছি। ম্যাপে দেশের চেহারা দেখি এই পর্যন্ত।

আর একজন, ভদ্রলোকের ছোটভাই, বললেন,—আমার বাবা এ দেশে এসেছিলেন ব্যবসা করতে তাঁর যৌবন কালে। আমার দাদা তখন মায়ের কোলে, আট-ন-মাস বয়স, আমরা তখনো জন্মাই নি। বুঝুন বাবুজী, সেই থেকে এদেশে রয়ে গেছি। মা এখনো বেঁচে আছেন, বাবা নেই।

এই ধরনের সুখদুঃখের গল্প কিছুক্ষণ করবার পর বেরিয়ে আসছি, বর্ষীয়ান ভদ্রলোক ডেকে বললেন, শহর দেখতে বেরিয়েছেন ? দেখবেন বাবুজী, হুঁশিয়ার ! ঠগের পাল্লায় পড়বেন না যেন !

—না-না-সাবধানেই থাকবো,—বলে বেরিয়ে এসে হাঁটতে আরম্ভ করেছি, হঠাৎ একসময় খেয়াল হলো, কখন থেকে একটি লোক ঠিক আমার পিছন পিছন হেঁটে আসছে ভারী জুতোর শব্দ তুলে। আমি থামছি, তো, সেও থামছে।

দু-তিনবার এই থেমে পড়ার ব্যাপারটা চলবার পর আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি সিন্ধীদের দোকানে দেখা সেই আরব মানুষটি। আমি তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে একটু হাসলো। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে কী আশ্চর্য, বাংলা ভাষায় বললে, হামি আপনার জন্যই ডাঁড়িয়ে ছিলম। চলেন।

পরিষ্কার বাংলা নয়, থেমে থেমে উচ্চারণ করা, তাও একটু জড়িতস্বরে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে বললে, হামি বাংলা বলতে পারে। আপনে বাঙালী, এই কথা শোনা অবধি হামার দিলটা থির হচ্ছে না, আপনের সাথে বাৎচিৎ ইয়ানে কথাবার্তা বলতেই হবে। চলেন। ঠিক যাচ্ছেন, হামিও ওইদিকে যাবে।

সত্যি বলতে কী, কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না, আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো সে, বললে, কী হলো, চলেন ?

যন্ত্রবৎ চলতে আরম্ভ করলাম। তখনো পর্যন্ত আমি কোনো কথা বলতে পারি নি। আশ্চর্য, মানুষটি হাঁটতে হাঁটতে আমার পাশে এলো, বললে, বহুত অবাক হয়ে গেছেন, না ?

আমি আবার দাঁড়িয়ে পড়েছি। মনের উত্তেজনা তখনো শান্ত হয়নি। কোনো রকমে তাই বলে উঠলাম, বাংলা শিখলেন কী করে! আমাদের দেশে গিয়েছিলেন নাকি ?

সে বললে, না মশা, এই দেশ ছেড়ে আওর কিধরভি যাই নি। তবভি আপনের ভাষা শিখেছি। আসেন হামার সাথ, আপনেকে সব বলবো।

বলে, মূল রাস্তাটা ছেড়ে সে আমাকে নিয়ে একটা গলিপথে ঢুকলো। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। একটু দূরে পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি উঠে গেছে দেখা যাচ্ছে। আর তার পাশ দিয়ে ঘোরানো রাস্তা, জীপ-টিপ উঠতে পারে। ওপরের দিকে, তাকিয়ে দেখা যায়, পাহাড় কেটে গুহা বানানো হয়েছে। এ-দৃশ্য জাহাজ থেকেই অবশ্য চোখে পড়ে। পাহাড়ের গুহা সারি সারি। এর কাছ থেকে জানলাম, ওটা নাকি ফৌজী ব্যারাক, সৈন্যদের ছাউনি।

সিঁড়ির নিচে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে কয়েকটা উট বসে আর দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে বড়ো বড়ো ছাগল, যাকে ওরা দুম্বা বলে, তারই হাট বোধ হয়। কপালে অনুরূপ দড়ি বাঁধা অনেক লোক, কেউ বিক্রি করছে, কেউ কিনছে। তবে ছাগল যারা বিক্রি করছে, তাদের পোশাক একটু অন্যরকম। তাদের মাথায় গোল মিশরি টুপি।

আমরা দুম্বা-হাট ছাড়িয়ে অন্যদিকে এগোলাম। ওদিকে কিছু দোকান-পাট আছে, সরাইখানা আছে। এরই একটি সরাইখানায় আমাকে নিয়ে ঢুকলো আমার সঙ্গী।

লক্ষ্য করে দেখলাম, আমার সঙ্গীকে অল্পবিস্তর সবাই চেনে এবং বেশ সমীহ করে। তার সঙ্গে আমার মতো ভিনদেশীকে দেখে সরাইয়ের লোকেরা একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাকাতে লাগলো।

আমি কিন্তু মোহগ্রস্তের মতো লোকটিকে অনুসরণ করে চলেছি। সেই সিন্ধী দোকানদারটি বলেছিল, ঠগ থেকে সাবধানে থাকবেন।

অথচ আমার সে-কথা মনেই ছিল না।

সরাইখানার ছাদটা নিচু। আমার বন্ধুটি যদি মাথা উঁচু করে, তাহলে তার মাথা ঠেকে যাবে ছাদে। আর দেওয়ালগুলো পাথরের। আমার বন্ধুটি আমাকে নিয়ে বসালো একটা কোণে। বললে, আপনে আমার মেহমান। কী খাবেন, বলেন।

বললাম, কিছু খাবো না এখন। আপাতত একটু চা, কী কফি।

—ঠিক আছে, বলে সে কফির অর্ডার দিলো।

আমরা বসেছিলাম একটা ছোট টেবিলের মুখোমুখি। ও বললে, আপনে তো জাহাজী, না ?

—হাঁ।

—দোস্ত, হামার বাড়ি আপনেকে নিয়ে যেতে চাই, যাবেন কী ?

—তা যেতে পারি, কিন্তু বেলা চারটের বেশি যেন না হয় জাহাজে ফিরতে।

খুশি হয়ে সে বললে, ঠিক আছে। ঠিক সময়ে আপনেকে ফিরিয়ে দেবে।

—কতো দূরে আপনার বাসা ?

—সে একটু দূর আছে, করিব আট-মিল।

বললাম, অনেক দূর। তার থেকে এখানেই গল্প করা যাক না! বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছেন কেন ?

বন্ধুটি আমার চোখের দিকে তাকালো, বললে, দুসরা কুছু না, আপনেকে একটো কবরের কাছে নিয়ে যাবে, এক বাঙালী মেয়ের কবর।

অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম। রুক্ষ মুখখানা থমথমে হয়ে এলো, আর আশ্চর্য, চোখদুটি ভরে উঠলো জলে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নিলো নিজেকে। ইতিমধ্যে দুটি পাথরের গেলাসে কফি দিয়ে গেল। ধীরে ধীরে চুমুক দিলাম।

এ জীবনে বহু বন্দরে বহু ঘাটেই ঘুরতে হয়েছে, বহু মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, কিন্তু কজনের কথা মনে রাখতে পেরেছি ? মাঝে মাঝে দেখি, কেউ হারায়নি, ঠিক তারা রয়ে গেছে স্মৃতির ভাণ্ডারে।

আমার এই আরবী বন্ধুটির নাম মেহমুদ। মেহমুদ তার গ্রামের মধ্যে বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি। সরাইখানার বাইরে এসে তার উটের উপর আমাকে চড়ালো। তার নিজস্ব উট। উটের পিঠে ছোট হাওদার মতো আছে, তার ওপরে আমরা দুজনে উঠে পাহাড়ের পিছন দিককার বাজারে এলাম। এখানে লোক আরও বেশি, তাদের নানা বর্ণের পোষাকে এক বিচিত্র পরিবেশেরই সৃষ্টি হয়েছে বটে !

এইখানে নেমে সে একটা মোটর গাড়ি ভাড়া করলো। ধূলিধূসরিত একটা কালো রঙের সেকেলে মোটর। এতক্ষণে আমরা চওড়া রাস্তার হদিস পেলাম।

কিসের মোহে যে সেদিন তার সঙ্গে আট মাইল মরুভূমির মতো অঞ্চল পার হয়েছিলাম কে জানে। শহর পার হতে গিয়ে নাতিবৃহৎ একটি কারখানার মতো বস্তু আমার চোখে পড়েছিল। উঁচু ট্যাঙ্ক, মোটা মোটা পাইপ, পাশ দিয়ে যেতে যেতেই একটা এলাহি ব্যাপার বলে বোধ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি মেহমুদ ভাই ?

সে বললে, পানি, ইয়ানে জলের ট্যাঙ্ক। তামাম এডেন শহরে পানি যায় ইখান থেকে।

বলে, সে যা ব্যাখ্যা করলো, তাতে অবাক হলাম এই পানীয় আহরণের

উপায় শুনে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল পাইপে টেনে পাম্প করে ফেলা হয়, সেই জলের বাষ্প থেকে সংগ্রহ করা হয় মিঠে জল। মরুভূমি অঞ্চলে জলের কষ্ট সহজেই অনুমান করা যায়। এই মহার্ঘ উপায়ে অন্তত ধনী সম্প্রদায়কে জল যোগাবার ব্যবস্থা করা গেছে, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের জন্য? মেহমুদ দেখালো সে ব্যবস্থাও, আর খানিকক্ষণ পরে। এই যে পাহাড়ের শ্রেণীর পাশ দিয়ে চলেছি, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালো মেহমুদ। বললে, আপনে ইখান থেকে ঠিক সমঝতে পারবেন না, ওর ভিতরে সব বড়ো বড়ো গর্ত কাটা আছে। আর কোথাও আছে বাঁধানো ক্যানাল। তাতে বর্ষার পানি জমে থাকে। সেইখান থেকে পাইপে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তার উপর ইঁদারা আছে খোড়া বহুৎ।

কথা বলতে বলতেই চলছিলাম। বললাম, এডেন ছেড়ে আর কোথাও আপনি যাননি?

—তা গেছি,—মেহমুদ বললে,—কায়রোতে কলেজে পড়তে গেছি। লেকিন মন বসলো না, বরষ দু' পরেই পালিয়ে এলম।

একটু সম্ভ্রমের সুরেই বলে উঠলাম,—তাহলে আপনি তো লেখাপড়া জানা লোক!

—দূর দূর! লেখাপড়া আর শিখলাম কোথায়?

—কলেজে কী পড়তেন?

—হিন্দুস্থানী ভাষা আর ইতিহাস। এই ছিল স্পেশাল সাবজেক্ট!

—ইংরেজী জানেন তাহলে!

—দূর দূর! থোড়া বহুৎ জানি শুধু। হামাদের দেশে আংরেজি নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। ফ্রেঞ্চ শিখলে, কি রাশিয়ান শিখলে কদর পাওয়া যায়।

পাহাড়গুলো তখনো আমাদের দৃষ্টির আড়ালে যায় নি। পাহাড়ের কোনো এক জায়গায় কতগুলি খেজুর গাছের জটলা, কয়েকটা মাটির বাড়িও দেখতে পেলাম। দূর থেকে ভারি ভালো লাগলো দেখতে। মেহমুদকে জিজ্ঞাসা করতেই বললে,—ও একটা ছোট গাঁও। ওর কাছেই পাহাড়ের বড়ো গর্তটা, ওখানেই বৃষ্টির জল জমে সব থেকে বেশি। আরবী ভাষায় ও গাঁয়ের যে নাম, তাকে হিন্দুস্থানীতে বলতে গেলে বলতে হবে ঠাণ্ডী তলাও।

বললাম, আচ্ছা, ওসব বিরাট বিরাট গর্ত করেছে পাথর কেটে তো?

—জী হাঁ।

—খুব খরচ পড়েছে নিশ্চয়?

মেহমুদ হেসে বললে,—কে তার হিসাব রাখে? ওকি আজকের? ইরাণের 'সামানিড' বাদশারা করে দিয়েছিলো ঐ সব গর্ত। কয়েকটা সেঞ্চুরী কেটে গেছে তারপর।

—এডেন কি খুব প্রাচীন জায়গা?

মেহমুদ বললে,—বহুৎ প্রাচীন। 'ইরিপ্লাস অফ দি ইথিরীয়ান সী' কেতাবটার নাম শুনেছেন ?

একটু ভেবে বললাম, শুনেছি বলেই তো মনে হয়।

মেহমুদ বললে, আসলে ওটা লেখা হয়েছিল গ্রীক ভাষায়। সেই আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ? তাঁর এক সেনাপতি লিখেছিলেন। শুনেছি সেই কেতাবে এই এডেনের কথা আছে। এখন সমঝতে পারছেন, কত পুরোনো এই এডেন ?

আজ কথাগুলো মনে করে করে বলছি, কিন্তু হলফ করে বলতে পারবো না, যে, হুবহু কথাগুলো এই ভাষাতেই বলেছিল মেহমুদ। সে বাংলা, হিন্দি, আর কিছু ইংরেজী,—এইসব মিশিয়েই আমাকে বলেছিল কথাগুলো। মোট কথা আমি বুঝতে পারছিলাম, তার কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি।

সে বলেছিল, প্রাচীন রোম সম্রাট কন্‌স্‌ট্যাণ্টিউস এডেনে প্রথম ক্রীশ্চান ধর্ম প্রচার করতে লোক পাঠিয়েছিলেন। এই ক্রীশ্চান পাদ্রীরা পরে তখনকার আরবদের হাতে মারা পড়ে। মানে, আরবরা খেপে গিয়ে তাদের মেরে ফেলেছিল আর কী! এ খবর শুনে সম্রাট কনস্‌ট্যাণ্টিউস ভীষণ চটে যান। রেড সী তো শুরু হলো এডেনের পর থেকে ? রেড সীর অন্য তীরে ছিল হাবসী রাজ্য। এই হাবসীদের এক বড়ো অংশ ছিল ক্রীশ্চান। রোম সম্রাট তাদের সুলতানকে চিঠিতে নির্দেশ দেন আরব-হত্যাকারীদের শায়েস্তা করতে। সুলতান সেইমত ফৌজ পাঠালেন এডেনে। লাগলো আবার মারামারি, কাটাকাটি। তার ফলে কত আরবী যে মারা পড়লো তার ইয়ত্তা নেই। অনেকে আবার পালিয়েও গেল। যাই হোক, শান্তি প্রতিষ্ঠা হবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপরে এডেন এলো ইরানের সামানিড সুলতানদের হাতে। এরপর যখন ইসলাম ধর্ম এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এডেন আবার ফিরে আসে আরবদের হাতে। তারপর কত ঝড়—কতো ঝাপটা ! পর্তুগীজরা বারবার এসে আক্রমণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তুরস্কের সুলতান এখানে বন্দর তৈরি করলেন পর্তুগীজদের 'ইণ্ডিয়ান ওস্যান-এরিয়া' থেকে তাড়াবার জন্য। তারপর আবার ওটা ফিরে আসে আরবদের হাতে। তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল ইংরেজরা। এখন ইংরেজরাও চলে যাচ্ছে, ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রণ্ট তৈরি হয়েছে, শীগগির বদলে যাবে এখানকার চেহারা। বিশেষ করে যুদ্ধের ঝরতি-পরতি 'পাপ' আর কিছুই থাকবে না। এডেন এবং আরও সব জায়গা জুড়ে তৈরি হবে একটি মিলিত রাষ্ট্র। আপনি দেখে নেবেন, আমার কথা মিথ্যে হবার নয় ! (তাই হয়েছিল, অনেক পরে ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ইয়েমেনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক' এর মধ্যে চলে এসেছিল এডেন।)

গল্পে গল্পে কখন যে পথ কেটে গেছে খেয়াল করিনি। ধুলিধুসরিত মোটর গাড়িটা এসে থেমে গেল একটা অতিকায় মাটির দুর্গের কাছে। খেজুর গাছের জটলার মধ্যে দুর্গের মতো বাড়িটি অবস্থিত। মেহমুদ সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,—এসে গেছি।

প্রচণ্ড দাবদাহের কথা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু ওদের সেই দুর্গের মতো বাড়ির কার্পেট বিছানো একটি ঘরে গিয়ে যখন বসলাম, তখন মনে হল শরীর জুড়িয়ে গেল।

আজ এতদিন পর সব খুঁটিনাটির বর্ণনা দিতে পারছি না। কিন্তু একজন শুভ্রকেশ ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, তিনি মেহমুদের ঠাকুর্দা। তাঁর চেহারা কখনো ভুলতে পারবো না। যেন ছবি থেকে একেবারে সশরীরে নেমে এসেছেন কোন স্থবির অথচ মহিমাময় মোগল সম্রাট।

বলা বাহুল্য, মধ্যাহ্ন ভোজন ওদের ওখানেই সেরেছিলাম। কার্পেটের ওপর টানটান করে পাতা চাদর। তার ওপর বড় সানকিতে করে দিয়ে গেল ধূমায়িত গরম বিরিয়ানি, দুম্বার মাংসে প্রস্তুত।

অবশ্য, আরবদের আতিথেয়তা জগৎ বিখ্যাত। ওসব পর্ব মেটবার পরে ঘরের আর সবাই চলে গেল, রইলাম মেহমুদ আর আমি। একটা নরম তাকিয়ায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ গল্প করছি, হঠাৎ চোখ গেল ঘরের কোণের দিকে। দেখি ঝুড়ির ওপর ঝুড়ি বসানো। সবার ওপরে যেটি রয়েছে, সেটির মাথায় চটের থলি চাপা দেওয়া। ও-গুলো আগেই চোখে পড়েছিল, এখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ওর মধ্যে থেকে যেন ফুল উঁকি দিচ্ছে, টকটকে লাল ফুল।

ফুল নিয়ে যে অভিজ্ঞতা গতকাল জাহাজে হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় আমার এ অনুমানের ক্রিয়াটা তরান্বিত হলো বলা চলে। ওকে প্রশ্ন করলাম, ঝুড়িতে কী ভাই, ফুল? গোলাপ?

ও ঝুড়ির দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, জী হ্যাঁ, আমার এক চাচার ফুলের ব্যবসা আছে, বিকেলেই শহরে চলে যাবে ও ফুলগুলো।

—তারপর?

—শহরে বিক্রি হয়ে যাবে।

—কারা কেনে?

ও একটু হেসে বললে, এই আপনের মতো জাহাজীরাই কেনে থোড়া বহুৎ।

সোজা হয়ে উঠে বসলাম, বললাম, জাহাজে বিক্রি করতে যায় কারা? আপনাদের লোক?

মেহমুদ বললে, না, ঠিক আমাদের লোক নয়। ওগুলো আমাদের কাছ থেকে কিনে নেয় ব্যাপারীরা। তারা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসে।

আমি বললাম, মেহমুদ, কাল আমাদের জাহাজে গিয়েছিল একটি মেয়ে মানুষ।

মেহমুদ কথাটার ওপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললে, তা হবে।

—ওই মেয়ে মানুষগুলো কারা?

—শহরে থাকে, ওদেরও ফুল বেচা বেওসা।

—শুধু কি ফুল বেচে ?

মেহমুদ হেসে বলল, সে তো বুঝতেই পারছেন। লেকিন, আপনে দোস্ত কারো মহব্বতীতে পড়েছেন নাকি ?

বললাম,—না, আমি নই, আমাদের জাহাজের একটা লোক ওকে দেখে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, ওকে একেবারে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

মেহমুদ বললে, তাজ্জব হবার কী আছে ? অনেক জাহাজীরাই অনেক মেয়েকে অমন বলেছে, লেকিন মেয়েরা কভী রাজী হয়েছে বলে শুনি নি।

—কেন বলুন তো ? রাজী হয় না কেন ?

মেহমুদও একটা তাকিয়া আশ্রয় করেছিল। এবার সেও সোজা হয়ে বসে বললো, ওরা এডেনের মেয়ে নয়, এমন কী, মুসলিমও নয়। গত যুদ্ধের সময় নানা দেশ থেকে ঐ সব মেয়েরা আমদানী হয়েছিল। এখন তাদের অনেকেই চলে গেছে, কিছু রয়ে গেছে। ওরা আসলে ভিনদেশী, কিন্তু এদেশকে পেয়ার করে এখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। ওরা নিজেদের গোষ্ঠীর আদমিকে, আর এখানকার স্থানীয় লোকদের এত পছন্দ করে যে, বিদেশী কাউকে কভী শাদী করতে চায় না। ওরা চায় এখানকার লোকের মহব্বত। আর তার জন্য জান পর্যন্ত কোরবানি দিতে পারে। আশ্চর্য নয় ?

আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম নিশ্চুপে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ও-ও বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। চমক ভেঙে বলে উঠলো,—চলেন দোস্ত, দুটো প্রায় বাজে। ইখন না উঠলে দেরি হয়ে যাবে আপনের।

—চলুন।

আমাকে মোটরে চাপিয়ে মাইল খানেক দূরে নিয়ে গেল মেহমুদ। একটি ভাঙাচোরা মসজিদ। কয়েকটা খেজুর গাছ, আর একটি ছোটখাটো বাবলা গাছের বন। তারই এককোণে একটি কবর। ও সেখানে হাঁটু মুড়ে বসে কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে রইলো। তারপর বললে, ইনি জিন্দা থাকলে আপনে বহুৎ খাতির টাতির পেতেন। ওর সময়ে একটি বাঙালী আদমীরও দেখা পাইনি, কী আফশোষ বলেন তো ?

—কে ইনি ?

মেহমুদ বললে, একটি বাঙালী মেয়ে। কোথায় বাড়ি কোথায় তার বাপ-মা কোনদিন কিছু বাতায় নি। আপনেদের দেশের গুণ্ডারা ধরে এনে বেচে দিয়েছিল করাচি, না কোথায়, সেখান থেকে হামার এক দাদা সাদী করে এনেছিল। যখন সে হামাদের বাড়িতে আসে, তখন হামার উমর করীব দশ বরষ। আমাকে খুব ভালোবাসতো! আপনেকে বলবো কী, ভাবীজী হামাকে ছেড়ে থাকতে পারতো না, আমিও পারতাম না তাকে ছেড়ে থাকতে। ওরই জন্য হামি কায়রোয় বেশিদিন থাকতে পারিনি।

—কী নাম ছিল ?

এক মুহূর্ত থেমে থেকে তার পরে মেহমুদ বললে, এরা নাম দিয়েছিল ফরিদা। লেকিন তার আসল নাম ছিল, লক্ষ্মী। লছমী নয়, লখকী। আমাকে এই ভাবীজীই কষ্ট করে বাংলা শিখিয়েছিল।

—কোনো ছেলে পিলে ছিল না ?

মেহমুদ হঠাৎ দুটি হাত জড়ো করে তাতে ওর মুখ ঢাকলো। তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, না। হামিই ছিলাম তার ছেলের মতো। হামার ঐ দাদার সাথ্ হামার উমরের ছিল বহুত বহুত ফারাক !

বলতে বলতে আবার ওর চোখ ভরে উঠলো জলে। জোব্বার পকেট থেকে একটি পাতাশুদ্ধ লাল টকটকে গোলাপ বার করে ও সেই সমাধির উপরে রাখলো। বাবলার পাতায় পাতায় হাওয়া তখন কাঁপছিল হাহাকারের মতো।

ফিরে এসেছিলাম যথাসময়ে। মেহমুদ বললে, আজ হামি যে কী শান্তি পেলাম, আপনে জানেন না দোস্ত ! চলেন, আপনার দেরি হয়ে যাবে।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হেঁটে আসছি, সেই সিন্ধী দোকানদারদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। তাদের দোকানের সামনে দিয়েই তখন আসছিলাম। একজন বললে, এই ফিরছেন বুঝি ? কোথায় গিয়েছিলেন ?

ওদের দোকানে একটু বসলাম, মেহমুদের কথা বললাম।

ওরা একেবারে চমকে উঠলো। বললে, আপনার টাকাপয়সা কিছু খোয়া যায় নি তো ?

অবাক হয়ে বললাম, কেন !

দোকানী বললে, লোকটি ডাকাত, ঠগ, লোক ঠকিয়ে বেড়ানোই ওর ব্যবসা। এ অঞ্চলের সবাই ওকে চেনে। জেল টেলও বুঝি খেটে এসেছে এর মধ্যে।

কিছু বলিনি। নীরবেই ফিরে এসেছিলাম জাহাজে।

পরদিন জাহাজ চলা শুরু করলো। বিদায় এডেন ! বিদায় সেই দুর্গের মতো বাড়ি। বিদায় সেই নির্জন সমাধি ! লক্ষ্মী দেবীকে কখনও দেখি নি, চিনি না। মনে মনে প্রণাম জানালাম তাঁর উদ্দেশে। মেহমুদ তাঁরই সৃষ্টি ! সে কাকে ঠকিয়েছে, কোথায় ডাকাতি করেছে জানিনা, কিন্তু আমাকে সে ঠকায় নি, আমাকে দিয়ে গেছে এমন এক স্মৃতি, যা কখনো ভুলতে পারা যায় না।

॥ ৯ ॥

জলপথে এডেনকে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপের প্রথম প্রহরী বলা যেতে পারে। শহরকে কজন জেনেছেন, দেখেছেন জানিনা, তবে নাম শুনেছেন অনেকেই। আর জলপথে যেতে আসতে এডেনের চেহারাও অনেকে প্রত্যক্ষ করে-

ছেন। কিন্তু সচরাচর চোখে পড়েনা এমন অখ্যাত অজ্ঞাত বন্দরও আছে, যার বিবরণ কোথাও লিপিবন্ধ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমার অভিজ্ঞতা সীমাবন্ধ। সেবার বিলেত যাবো বলে বেরিয়ে বিলেত যাওয়া হয়নি, যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটায় জাহাজ সুয়েজ, ইসমাইলিয়া ও পোর্ট সৈয়দ পেরিয়ে গিয়েও ফিরে এসে মুখ ঘুরিয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এবং এর মালপত্র অন্য জাহাজ নিজের গহ্বরে তুলে নিয়ে এর বদলে বিলেত রওনা হয়েছিল। আমি ছুটি পেয়েছিলাম। অন্য এক ভারতগামী জাহাজে ঘটনাচক্রে কাজ পেয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল।

তোমার কাছে এসব কথা বলা বাহুল্য মাত্র, তবু বলছি,—আমি নিউ ইয়র্ক বা ইংল্যাণ্ডের কোনো বন্দরের বিবরণ দিতে পারবো না, দিতে পারবো না জাপান, ফিলিপাইনের বন্দরের খবর। আমার জল-জীবনের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল ঘরের আশপাশ ঘিরেই। পৃথিবীর মানচিত্রটি যদি একবার স্মরণ করি, যদি স্মরণ করি বর্তমানের বায়ুযানগুলির উর্ধ্বশ্বাস গতির কথা, যার কল্যাণে সুদূর নিকট হয়ে যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যেই, তাহলে আফ্রিকার উপকূল কিংবা ভূমধ্যসাগরের একটি-দুটি বন্দর, এবং ওদিকে আন্দামান কিংবা মরিসাস ইত্যাদি, এই সবই এসে যায় ঘরের আশেপাশে।

আমার সেই বন্ধু ইংরেজ ক্যাপ্টেনের কথা মনে পড়ে? তারায় ভরা রাত্রির আকাশের নিচে জাহাজের 'ডাঙ্কি ডেক'-এর ক্ষুদ্র পরিসরে দাঁড়িয়ে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ-ই মুখ তুলে আকাশের উপর দিয়ে শব্দের তরঙ্গ তুলে ছুটে-যাওয়া একটি বায়ুযানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন, তারপরে তীব্র অথচ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, দি ডেভিল!

এই ক্যাপটেনের কথা ভোলা যাবে না। এঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা হয়েছিল, অর্থাৎ উনি আমাকে একটু পছন্দ করতেন, কেন তা জানি না। হয়ত ওঁর জাহাজের অন্য কেউ আমার সঙ্গে তেমন মিশতো না লক্ষ্য করেই আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। নিশুতি রাত্রে যখন কর্মরত জনকয়েক ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সর্বোচ্চতলার উঁচু কেবিনের ওপরে রেলিং ঘেরা ছোট্ট ডাঙ্কি ডেক-এ আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন। আবছা আবছা আলো যেন এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছিল সেদিন। একটি ক্যামপ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন উনি, ক্যাপ্টেন কেনেডি। আর আমি বসেছিলাম ওঁর কাছাকাছি একটি মোড়ায়। হঠাৎ এক সময় যেন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বললেন, ইয়ংম্যান তুমি কি বিবাহিত?

—না-না।

সোজা হয়ে বসে আমার দিকে তাকালেন, গলা একটু নামিয়ে যেন বিশ্ব-চরাচরের কেউ শুনতে না পায়, এমনি ভাবে বলতে লাগলেন,—কোনো মেয়েকে হঠাৎ দেখে তোমার কি কোনোদিন দারুণ ভালো লেগে গিয়েছিল, মানে দেখা মাত্রই তোমার রক্তে প্রবল ঝড় ঢেউ তুলে দিয়েছিল?

আমি একটু অবাক হয়েই কথাগুলো শুনছিলাম, মাথা নেড়ে নীরবে জানালাম,—না।

—আমার জীবনে এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল,—বৃদ্ধ বলতে লাগলেন,—কোথায় জানো? যে আলেকজান্দ্রিয়ায় তুমি গিয়েছিলে বলেছিলে, সেই আলেকজান্দ্রিয়ায়। ওরা মিশরী, নারীর দিক থেকে ওরা প্রচণ্ড রক্ষণশীল, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়া বলতে গেলে একটি কসমোপলিটান শহর, ওখানে সব জাতের সব লোকই আছে। ওদের সেই 'হাফ লেগুনের মতো' সী-বিচটা দেখেছিলে? একটা গোল চক্রকে আধাআধি করলে পরিধিরেখাকে যেমন দেখতে হয়, ওদের সমুদ্র তীরের ঐ খ্যাতনামা বিচটি ঐ রকমই দেখতে। সেইখানে ছুটির দিনে গেলে দেখতে পাবে সুইমিং কস্টিয়ুম পরে হরেক জাতের হরেক রকম মেয়েদের স্নান করার দৃশ্য।

ক্যাপ্টেন বলতে লাগলেন, এতদিনে নিশ্চয় এটুকু বুঝেছো, সাধারণ নাবিকরা দেহবাদী। অভ্যাসে দেহ আর দেহের চাহিদাটাই বড়ো হবে দেখা দেয়, মন নয়। যখনকার কথা বলছি, তখন আমি থার্ড অফিসার। থার্ড অফিসার জানো ত? যার ওপর থাকে জাহাজের নেভিগেশনের গুরুভার। চার্টরুম থেকে হুইল, হুইল থেকে চার্টরুম, এ-দুয়ের মধ্যে আমার তখন গতিবিধি, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতে হতো আমাকে। এভাবে থাকতে থাকতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রীতিমত ভাব হয়ে গিয়েছিল আমার। খুব অন্তরঙ্গ গল্প হতো আমাদের মধ্যে। এই রকম অবস্থায় আমাদের সেই জাহাজ এসে ভিড়লো আলেকজান্দ্রিয়ায়। শহরটাকে তো দেখেছো, পুরানো আর নতুনের বিচিত্র সমাহার। এখানে বোরখা-পরা রমণীও আছে, আবার নাইট-ক্লাবের বেলি-ডান্সারও আছে। এখানে এসে সেই জাহাজের নাবিকদের মধ্যে যেন উৎসবের ঘটা পড়ে গেল। সন্ধ্যা হতে-না হতেই ডিউটিবিহীন সব নাবিকই সেজেগুজে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লো। প্রথম দিনে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন সব লক্ষ্য করলো, দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যা হতে না হতেই আমাকে ডেকে পাঠালো কেবিনে. বললে, আই সে কেনেডি, এই আলেকজান্দ্রিয়ায় তুমি আগে কখনো এসেছো?

—এসেছি।

বললে, বটে? আমার এই প্রথম আসা।

তারপরে ক্যাপ্টেন বেরুলো আমাকে নিয়ে, গেটের কাছে এসে দেখি, জাহাজের কাপড়চোপড় যে কাচে, সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে একটু অন্ধকার অন্তরাল খুঁজে নিয়ে, বোকা মুখখানার মধ্যে দুটি ধূর্ত চোখ। বুঝলাম এটিই আমাদের আপাতত পথপ্রদর্শক।

বলতে বলতে কেনেডি এখানে একটু থামলেন, তার পরে বললেন, না, ক্যাপ্টেন সেই লোকটির সঙ্গে আধুনিক শহর-অঞ্চলের যে গলিতে ঢুকলে, আমি সে পথে গেলাম না। তাদের বিদায় দিয়ে আমি অন্যদিকে চলে এলাম। একটা

সিগারেট ধরিয়ে ছোট একটা ফোয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে সেটা শেষ করে একটা বড়ো রাস্তা ধ'রে সোজা চলতে লাগলাম।

আসল কথা,—কেনেডি বলতে লাগলেন,—আলেকজান্দ্রিয়ায় সত্যিই আমি নতুন নই। একবার একটি কাফেতে একটি তরুণ বন্ধু লাভ হয়েছিল আমার। আমার মধ্যে সে কী দেখেছিল জানি না, আলাপ-পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনেই আমাকে একেবারে তার বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলো। প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যতদূর জানতাম ওখানকার লোকেরা বিদেশীদের যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখে। তরুণ বন্ধুটি বললো, দ্যাখো, আমি গল্প লিখিয়ে, আমি তোমাদের কথা শুনতে চাই। তোমাদের নিয়ে গল্প লিখবো।

হেসে বলেছিলাম, বেশ, চলো, তোমার বাসায়, গল্পের ঝুলি খুলে বসবো, যত খুশি তুলে নিয়ো।

একটা অপরিষ্কার গলি, আধুনিক এলাকার মধ্যেই। তার প্রান্তে ওদের বাসা। পরিচ্ছন্নতার প্রয়াস আছে ঘরে, কিন্তু দারিদ্র্যের ছাপ তাতে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। বসবার ঘরের এক কোণে চকচকে পিতলের একটি ক্রশ ঝুলছে, তার নিচে কুলুঙ্গিতে গোটাকয়েক জ্বলন্ত মোমবাতি ক্ষীণ শিখা বিস্তার করেছে। বুঝলাম, ছেলেটি মুসলিম নয়। নামও তার প্রমাণ,—আর্থার।

বললে, বন্ধু এসেছেন গরিবের বাড়ি, যোগ্য অভ্যর্থনা হবে না।

হেসে বলেছিলাম, ভনিতা করলে বন্ধুত্ব জমবে'না, ওসব ছাড়ো।

একটু পরেই একটি ক্ষুদে চাকর নিয়ে এলো চায়ের ট্রে, আর তার পিছনে পিছনে এসে ঢুকলো সেই মেয়েটি, যার কথা বলবো বলে আজ তোমাকে কাছে ডেকে এনেছি। ঘন নীল ফ্রক পরা, অসাধারণ সুগঠিত দেহ, মুহূর্তে রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়েটি আর কেউ নয়, আর্থারের বোন।

যথারীতি শিষ্টাচার বিনিময়ের পর আবহাওয়া ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করে বিদায় নিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু জাহাজে ফিরে এসে চোখে আর ঘুম নেই। মেয়ে অনেক দেখেছি, সুন্দরী তরুণীও কম দেখিনি, তবে এ মেয়েটি আমাকে এমন করে পাগল করে তুললো কী করে? জাহাজ যে ক'দিন বন্দরে থাকবে, সেই ক'দিন আলেকজান্দ্রিয়ায় আছি, কিন্তু তারপরে? তোমাকে বলতে বাধা নেই, পরদিনও বেরিয়েছিলাম কামুক অফিসারদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে বিশেষ অন্ধকার গলিতে না ঢুকলেও সংস্পর্শ দোষে মনটা লোভাতুর ছিল, তাই ফেরার পথে মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে লোভ দাঁড়ালো চরমে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, যত টাকা লাগে লাগুক ওকে আমার চাই-ই! গিয়ে দেখি মেয়েটি একাই বসে আছে ড্রইংরুমে, পরনে হলদে জ্যাকেট, আর গাঢ় খয়েরি স্কার্ট। বললে, আসুন, আর্থার বাইরে গেছে একটি কাজের চেষ্টায়, এখুনি ফিরবে।

আমি উত্তরে কোনো কথা বলতে পারছিলাম না, অথচ ভিতরটা উত্তেজনায়

চুরমার হয়ে যাচ্ছিল! অতি কষ্টে নিজেকে সামলে মুখের ওপর এক ভদ্র ব্যক্তির মুখোস টেনে এনে বললাম, এলাম আপনাদের বিরক্ত করতে।

মেয়েটি একটু হেসে বললে, মোটেই না। আপনি আসেন, মনে হয় সাত সমুদ্র তেরো নদীর স্পর্শ আপনার গায়ে। সত্যি! কতো বেড়ান আপনারা!

উত্তরে বললাম, তা বেড়াই। চিরকালের ছন্নছাড়া আমরা। চাল নেই, চুলো নেই, ঘর নেই।

মেয়েটি মুখ ফেরালো আমার দিকে, বললে, বিয়ে করেন নি?

বললাম,—না। আমাদের বিয়ে করবে কে বলুন? সামুদ্রিক যাযাবর! পোঁছে কে!

মেয়েটি উত্তরে কিছু বললো না, মুখ নিচু করে কী যেন ভাবলো। সেই সময় ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। কেমন একটা লজ্জানম্র ভাব, কেমন একটা মাধুর্যের বিকিরণ। একটুক্ষণ থেমে থেকে আমি বললাম, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমরা একটু খোলাখুলি প্রকৃতির লোক, মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে এমন সব কথা বেরিয়ে যায়, যা হয়ত ঠিক শিষ্টাচার সম্মত নয়।

মেয়েটি বললে, তা নয়, আমি ভাবছিলাম আপনার কালকের কথাগুলো। ঐ যে আপনি অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলছিলেন? সারা পৃথিবী জুড়েই বোধ হয় এই অবস্থা এখন। পণ্য আছে, বাজার নেই, কারখানা আছে, কাজ নেই। হু হু করে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। আর একটা ব্যাপার কী, জানেন? আজকাল সবার সহানুভূতি সাধারণ শ্রমিকদের ওপর গিয়ে পড়েছে। ফলে ধনীরা আর শ্রমিকরা কাল কাটাচ্ছে একরকম। কিন্তু মধ্যবিত্তের অবস্থা শোচনীয়, বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এদের দিকে কেউ তাকায় না!

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বললাম, দারুণ চিন্তা ভাবনা করেন তো? নিশ্চয়ই পড়াশুনা অনেক করেছেন—হয়ত গ্রাজুয়েট,—কিম্বা তারও বেশি—!

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি বললে, না বেশি নয়। কিন্তু গ্রাজুয়েট হয়েও তো কিছু হলো না, বসে আছি।

বলতে পারিনা, হয়ত এই সময়েই এসেছিল শুভ লগ্ন আমার মনের কথা বলার, কিন্তু প্রসঙ্গটি এমন, নিজেকে ভদ্র এবং শিক্ষিত বলে জাহির করবার জন্য অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দারুণ সুষ্ঠু এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। ফলে মেয়েটি আমাকে ঝানু অর্থনীতিবিদই ঠাউরে বসলো বোধহয়।

ইতিমধ্যে এলো আর্থার। বেচারা কাজের জন্য ঘুরছে, কিন্তু পাচ্ছে না। অবশ্য তাতে সে কি দমে? তার ধারণা, শিগগিরই নামজাদা লেখক হয়ে উঠবে সে, অচিরেই পত্রিকা প্রসাদাৎ তার ঘরে ইজিপ্সিয়ান পাউণ্ডের এমন বৃষ্টি হবে যে, অভাবের উত্তাপ আর একটুও থাকবে না। মেয়েটি ভাইয়ের কথা শুনে বলে উঠলো—দয়াময় যীশু যেন তাই করেন।

আমি হাত-ঘড়িতে দেখলাম রাত তখন অনেক। এর পরে কোনো ভদ্র বাড়িতে থাকা উচিত নয়। সুতরাং সভা ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু জাহাজে ফিরে আবার সেই মনোযন্ত্রণা! মেয়েটির চোখের দৃষ্টি, কথা বলার ভঙ্গিমা, যতো ভাবতে লাগলাম, ততই যেন পাগল হয়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু পরের দিন আবার যখন গেলাম, তখন জামার ওপর ভদ্রতা আর শালীনতার সুদৃশ্য 'টাই' পরেই যেতে হয়েছিল। টাকা সেদিনও পকেটে। সেদিনও আর্থার বাড়ি ছিল না, এবং সেদিনও সে বসবার ঘরে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। আমি ঘরে ঢুকে অভিবাদনের পালা শেষ করে বললাম, আজ কীরকম ঠান্ডা হাওয়া বইছে দেখছেন?

—হ্যাঁ।

বললাম, দেখুন একটা কথা।

মেয়েটি হাতের বইটি মুড়ে হাসিমুখখানা আমার দিকে তুলে বললে, কী?

হয়ত জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম তার নামটা কী, কিন্তু তা আর হলো না, তার মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল, বলে ফেললাম, কী বই পড়ছেন ওটা?

সে হেসে বইটি আবার খুললো, একটা অর্থনীতির বই।

বললাম, বাঃ! বাঃ! পড়াশুনো এখনো বেশ বজায় রেখেছেন আপনি! দেখুন আসলে দুনিয়ার অর্থবণ্টন-ব্যবস্থাই বড়ো জটিল। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে ঠিক পাউণ্ডগুলো জমে যায়, আর তাদের আরামে রাখতে গিয়ে মরে সব সাধারণ লোক!

এইভাবে অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বক্তৃতা অনর্গল চলতে লাগলো, ফিরে এলো আর্থার, বলা বাহুল্য সেদিনও বিরস মুখে। সেদিনও হয়ে গেল অনেক রাত, পকেটের টাকা পকেটে নিয়ে ফিরে এলাম জাহাজে। বলতে বাধা নেই, জাহাজে শুয়ে আবার সেই জ্বালায় জ্বলেছি, এবং তারও পরে যে দুদিন জাহাজ ছিল, গেছি ওদের বাড়িতে, একদিনও সে-সময় আর্থার ছিল না, আমি মেয়েটিকে মনের কথা কিছুই বলতে পারিনি, তার সান্নিধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে ভদ্র থেকে ভদ্রতর হয়ে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিবিধ আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেছি! পরে চমক ভেঙেছে, যখন আর্থার এসেছে অনেক রাত্রে শুকনো মুখে সারা শরীরে দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির বোঝা নিয়ে।

তার পরে জাহাজ ছেড়ে গেল আলেকজান্দ্রিয়া পূর্ব নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগেই। নইলে দুই ভাই-বোনকে ঠিক দেখতে পেতাম তীরভূমিতে। এবং আশ্চর্য! চেষ্টা করেও ভুলতে পারছিলাম না তাকে। বোধ হয় চেষ্টা করলে তার অনবদ্য দেহ সৌষ্ঠব আর লাবণ্যময় মুখখানির ছবি এখুনি এঁকে দিতে পারি।

এই সময়ে ক্যাপ্টেন কেনেডি একটু থামলেন। একটুক্ষণ পরে আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম, বললাম,—তারপর?

ক্যাপ্টেন বললেন, তারপর? এতক্ষণ বললাম পুরানো কথা, এবার সেদিনকার কথা শোনো। আলেকজান্দ্রিয়ার পথ হেঁটে আমি খুঁজে খুঁজে তাদেরই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বছর তিন পরের ঘটনা মাত্র, দেখলে কি আমাকে ওরা চিনতে পারবে না? ঐ ত সেই বসবার ঘরখানি! আলো জ্বলছে। সিঁড়ির ধাপে পায়ের শব্দ বেজে উঠতেই খোলা দরজা দিয়ে একটা কুকুর ছুটে এলো। পিছনে পিছনে এক বৃদ্ধা মহিলা। নমস্কার জানিয়ে আর্থারের নামটা বললাম, সৌভাগ্যক্রমে আর্থারের পুরো নামই জানতাম আমি। মহিলা একটু চিন্তা করে তাকে চিনতে পারলেন মনে হলো। বললেন, ওরা তো এখানে থাকে না!

—কোথায় থাকে?

—তা জানি না, তবে আর্থার মারা গেছে এই মাস ছয়েক হলো।

—মারা গেছে!

—হ্যাঁ! গ্যালপিং টি-বি। অপারেশান করেও কিছু করা গেল না,—বৃদ্ধা বললেন,—আসলে ভেতরে ভেতরে সারা শরীরটা ক্ষয়ে গিয়েছিল, জীবনী শক্তি বলে কিছু ছিল না।

—আর, ওর বোন?

বৃদ্ধা বললেন, না। সে কোথায় আছে জানি না।

পথে নামলাম। এবং বেশ রাত করেই ফিরলাম জাহাজে। জাহাজে তখন চাপা একটা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে! ক্যাপ্টেন ফিরে এসেছে মাতাল এবং আহত অবস্থায়। আমাদেরই একজন সাধারণ নাবিক মেরেছে ক্যাপ্টেনকে। তার যুক্তি, ক্যাপ্টেন তার গার্লকে ছিনিয়ে নেবে কেন? মত্ততা ও উত্তেজনাভরে সে তার গার্ল-এর একখানা ছবিও পকেট থেকে বার করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলো। ছবিটা দেখে আমি চমকে উঠলাম। দু-একজন ছবিটি দেখে বলে উঠলেন, বাঃ! বাঃ! খাসা!

কিন্তু আমি জানি, ছবিতে যা উঠেছে সে তার কঙ্কাল, তার সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দেহসৌষ্ঠব, না, কিছুই ফোটেনি ওতে!

আবার শুরু হলো অনেকদিন পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই বৃশ্চিক যন্ত্রণা! সকাল হতে-না-হতেই সেই নাবিকটিকে অনেক জাপিয়ে সেই অন্ধকার গলিতে ঢুকলাম। করাঘাত করলাম দরজায়। একটু পরেই দরজা খুলে সে আমাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন কেনেডি থামলেন। বললাম, তারপর?

ক্যাপ্টেন কেনেডি বললেন,—তারপর অনেক কথা। এমন সব ঘটনা ঘটলো যার ফলে আমি তিন বছরের জন্য সাসপেণ্ডেড হলাম। আমার সিনিয়রিটি পিছিয়ে গিয়েছিল তিন বছরের জন্য। নইলে আরও অনেক আগেই ক্যাপ্টেন হতে পারতাম।

—কিন্তু কী সে ঘটনা?

ক্যাপ্টেন বললেন, ভোর হয়ে আসছে। যা বলার তোমাকে সংক্ষেপে বলবো। তুমি আলেকজান্দ্রিয়ার ইতিহাস জানো? আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরির সংবাদ শুনেছো? শুনেছো টলেমির কথা? আলেকজান্দ্রিয়া একসময় বিবিধ বিদ্যা-অনুশীলনে সত্যিকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো? কতগুলো মূর্খের হাতে পড়ে এই আলেকজান্দ্রিয়া সেদিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। লাইব্রেরি পুড়িয়ে ছারখার করে সেদিন সে এক দানবীয় নৃত্যই হয়েছিল বটে! তখনকার বিদুষী মহিলা তরুণী হাইপেশিঁয়াকে তারা নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলে তার উলঙ্গ দেহটাকে রাস্তায় রাস্তায় টেনে বেড়িয়ে চূড়ান্ত অপমানের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিল। আমি যে তিন বছর আলেকজান্দ্রিয়ায় আসতে পারিনি, সেই তিন বছর আলেকজান্দ্রিয়া ও মিশর নিয়ে পড়াশুনা করেছি, আমার সেই স্বপ্নের রাণীকে আমি বিদুষী হাইপেশিয়া বলে মনে মনে ধ্যান করেছি! আর সেদিন, সেই কুখ্যাত গলির কুখ্যাত বাড়ির একটি ঘরে তাকে দেখে মনে হলো আমার হাইপেশিয়াকে নিয়ে এই মূর্খের দল বিবস্ত্র করে, হত্যা করে, চরম অপমান করেছে! তোমাকে বলবো কী, আমি জাহাজ ছাড়লাম, দুনিয়া ভুললাম, আমার হাইপেশিয়াকে অপমান থেকে মৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্য জীবনপণ করলাম! হাতে তখন অনেক পাউণ্ডই ছিল, ওকে ভর্তি করে দিলাম এক নার্সিং হোমে, কারণ শরীরে আর ওর কিছু ছিল না! আমি পাগলের মতো ওকে বলেছিলাম, তোমার দেহ তোমার লাবণ্য সব আবার আমি ফিরিয়ে দেবো! তুমি বলো, সেদিন তুমি আমার হবে! আমার হাইপেশিয়া কেঁদে উঠে বলেছিল, যেদিন প্রথম তুমি ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে দাঁড়ালে, সেদিন তোমার চোখ মুখের ভঙ্গি দেখেই আন্দাজ করেছিলাম তুমি কী চাও! আমি ভাইকে বাইরে পাঠিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় বসবার ঘরে এসে বসে থাকতাম তোমার জন্য। আমার কি কিছু অদেয় ছিল সেদিন তোমার কাছে?

বলতে বলতে কী আশ্চর্য, ক্যাপ্টেনের নিজেরই গলা কেঁপে উঠলো, বললেন,—দিনের আলো ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চিক চিক করে উঠছে, আর কথা বলার সময় নেই, সবাই উঠে পড়বে। শুধু এটুকু শুনে রাখো, আমার জমানো পাউণ্ড শেষ হয়ে গেল, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়লাম, তবু লড়াই করতে ছাড়িনি, গতর খাটিয়ে শারীরিক পরিশ্রম করে টাকা এনেছি, কিন্তু তবু আমার হাইপেশিয়াকে বাঁচাতে পারলাম না, অদৃশ্য পাখির মতো সে উড়ে চলে গেল আকাশ পথে, তার নাগাল আর পেলাম না!

চুপ করলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজের সবাই একে একে জাগতে আরম্ভ করেছে।

আমি বললাম, আজও ভুলতে পারেননি তো, তাকে?

—কী করে ভুলবো,—উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন, বললেন,—তার জন্য আমি আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি, মিশিনিও কারও সঙ্গে।

—বিয়ে করেন নি ?

—না—বলে, ক্যাপ্টেন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

এই ক্যাপ্টেনের কথার জের আর একটু টেনে বলতে হবে, ও'র জাতক্রোধ ছিল এরোপ্লেনের ওপর। মাথার ওপর উড়ে যেতে দেখলে এদেরই তিনি বলতেন, 'দি ডেভিল'! বলতেন—দেশ-দেশান্তরে যাওয়ার একমাত্র বাহন ছিল এই জাহাজ। আজ ঐ ডেভিলগুলো উড়ে বেড়ানোর জন্য জাহাজের প্রয়োজনও কমে গেছে, আকর্ষণও আর নেই বললে হয়! ইউলিসিস আর কলম্বাসেরা এখন আকাশ-পথে ছুটবে, জলের পথে নয়!

তবু জাহাজ আছে, আর জাহাজ থাকবেও। কী বলো ? অন্তত অখ্যাত বন্দরগুলিতে মাল বওয়ার কাজ করার জন্য জাহাজের দরকার পড়বেই। কিন্তু এই কথাটা ক্যাপ্টেন কেনেডিকে বলতে গিয়ে সেদিন ধমক খেয়েছিলাম মনে আছে। আমার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেছিলেন, শিপস্ হ্যাভ্ গন টু ডগ্স্!

॥ ১০ ॥

ক্যাপ্টেন খাঁটি সমুদ্র-মানব, ওঁর পক্ষে এ ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু আমি এমন সমুদ্র-মানব না হলেও অন্তত একজন মানবের খবর জানি, যে এসব প্রতিযোগিতার কথা মনেও আনে নি। সে জাহাজী নয়, বাষ্পচালিত ওই সব বড়ো জাহাজের সঙ্গে তার কোনো সংযোগই নেই। তার সঙ্গে যে জাহাজের সংযোগ, সে হচ্ছে ছোট্ট কাঠের তৈরি সাবেকী পাল-তোলা জাহাজ। এই জাহাজের ঝাঁক আমি কোকনদ-বন্দরে দেখেছিলাম। যার একটির কথা আগেই বলেছি। এখন যার কথা বলবো, তার নাম ইয়ুসুফ। আমি তাকে ভারতের মূল মাটিতে দেখিনি, দেখেছিলাম এক অজ্ঞাত দ্বীপের অখ্যাত বন্দরে।

ভারতের ম্যাপটি সামনে মেলে ধরলে একেবারে নিচের দিকে পড়বে কেপ কমোরিন বা কন্যাকুমারী। সেখান থেকে মনে মনে সোজা একটি রেখা টানতে হবে বাঁ-দিকে। সব ম্যাপে দ্বীপটির উল্লেখ নেই, কোনো কোনো ম্যাপে আছে। ছোট্ট একটি বিন্দুর মতো দ্বীপ। কন্যাকুমারী থেকে একই অক্ষাংশে অবস্থান করছে আরব সাগরের বুকে, মালাবার উপকূল থেকে এর দূরত্ব প্রায় দুশো তিরিশ মাইল। ম্যাপে বিন্দু চিহ্নিত থাকলেও দ্বীপটা দেখতে চন্দ্রকলার মতো। ঈদের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, আবার ঘরোয়া উপমাকে টেনে আনতে পারা যায়, কুমড়োর ফালি। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য ছয় মাইল হলেও এর সব থেকে চওড়া অংশটাও আধ মাইলের বেশি চওড়া নয়।

এহেন কুমড়োর ফালির মাঝামাঝি অংশকে লক্ষ্য করে জাহাজ খানিকটা এগিয়ে লঙ্গর করলো তটরেখা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। সময় তখন বিকেল বেলা। আমরা জানতাম কোচিন বন্দর থেকে আফ্রিকার উপকূলের একটি

নামকরা বন্দর 'মোম্বাসা'য় যাচ্ছি, কিন্তু পথের মধ্যে হঠাৎ গতি একটু বদল করে জাহাজ এসে পৌঁছলো এই চন্দ্রকলাটির কোলে। শুনলাম এখান থেকে কোপরা বা নারকেল খণ্ডের কিছু বস্তা জাহাজ তুলে নেবে। অর্থাৎ জাহাজ রাত্রে আর নড়বে না, নড়বে পরদিন। সারা রাত ধরে হয়ত কোপরা উঠবে জাহাজের কোলে, ঘড়র ঘড়র শব্দে 'ডেরিক' চলবে, তার মানে ঘুমের দফা গয়া। চীফ ষ্টুয়ার্ড সাহেব ত বিড়বিড় করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়েই পড়লো। অন্যান্য নাবিকেরা মাটি দেখলেই জাহাজের পোর্ট-সাইডে গিয়ে রেলিং এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কিন্তু এবার তা হলো না, যে যার কাজে চলে গেল, অথবা, যাদের ছুটি হয়েছে, তারা যার যার ঘরে গিয়ে বসলো।

অর্থাৎ বোঝা গেল, বন্দরে নামবার তাড়া কারোরই নেই। অথচ আমার উপায় নেই, আমাকে নামতেই হবে। আমি জাহাজের কেরানী (অবশ্য অস্থায়ী), এজেন্টের অফিসে যাতায়াত, কাগজপত্রে সই, এসব আমাকেই করতে হয়। ক্যাপ্টেন আমাকে ডেকে বললেন,—নামবে নাকি? না নামলেও পারো, ওদের লোক একটু পরেই আসবে।

—কিন্তু কেন স্যার, এখানে দেখছি কেউই নামতে চাইছে না?

ক্যাপ্টেন একটু হেসে বললেন,—সেলাররা ইন্টারেস্ট পেতে পারে এমন কিছু এখানে নেই যে! এই দ্বীপে শহর বলে কিছু নেই। গ্রাম বলতে যা বোঝায়, তা-ও আছে মাত্র একটা। ভালো করে তীরের দিকে তাকিয়ে দেখো, বন্দর বলতে ঐ একটা পুরানো বাতিঘর। আর অজস্র 'জ্যাঙ্ক' অর্থাৎ কাঠের জাহাজ।

—আমার কিন্তু যাবারই ইচ্ছে,—বললাম,—কিন্তু কী করে যাবো স্যার?

ক্যাপ্টেন বললেন—ওদের লঞ্চ এখনই আসবে। ওদের সঙ্গে যেয়ো।

জিজ্ঞাসা করলাম,—দ্বীপটার নাম কী?

—মিনিকয়।

মিনিকয় বলে যে কোনো দ্বীপ আছে ভারতের আশেপাশে, এ আমি জানতাম না। কারা এ দ্বীপে থাকে, কী ধরনের লোক, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার ছিল না।

ওদের লঞ্চ অবশ্য এলো একটু পরেই, জন তিনেক লোক ছিল লঞ্চে, তার মধ্যে যিনি আমাদের জাহাজের প্রতিনিধি, আমার কাজকর্ম তাঁরই সঙ্গে। তিনি প্রবীণ, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, এবং প্রায়শই সাদা হয়ে গেছে! আত্মপরিচয় দিলেন মিঃ রাও বলে। দরকারী কাগজপত্র সবই সঙ্গে এনেছিলেন, যার ফলে আমার আর তীরে নামবার দরকার করে না। ক্যাপ্টেন তবু আমাকে দেখিয়ে ওঁকে বললেন, ইনি তীরে নামবার জন্য উৎসুক, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।

ভদ্রলোকের চোখে ছিল পুরু চশমা, তার মধ্য দিয়ে চোখটা আরও বিস্ফারিত দেখালো, বললেন, কী আশ্চর্য! দ্বীপে নামতে চান, আছে কী দ্বীপে দেখবার?

বললাম, আপনার যদি অসুবিধে হয় তো—

বাধা দিয়ে মিঃ রাও বলে উঠলেন, না-না অসুবিধে আমার আর কী! অসুবিধে আপনার! আচ্ছা, ঠিক আছে, চলুন।

ক্যাপ্টেন অল্প একটু হেসে বললেন, রাত বারোটার মধ্যে ও যাতে ফিরতে পারে সেই ব্যবস্থাই করবেন যেন!

মিঃ রাও উত্তর দিলেন,—রাত বারোটা! ঘণ্টা দু-তিন উনি ওখানে থাকতে পারবেন কিনা সন্দেহ! বোরিং-বোরিং! এমন একঘেয়ে, ক্লান্তিকর এখানে থাকা যে কী বলবো! আমার আর বছর খানেক আছে রিটায়ার করবার, তারপর দেশে ফিরে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করতে পারলে বাঁচি।•

ক্যাপ্টেন আগ্রহ ভরেই ওর কথাগুলো শুনছিলেন, বললেন, এখানে ক-বছর কাটলো মিঃ রাও?

রাও বললেন, স্যার, বারো বছর—টুয়েলভ্ ইয়ারস্—ভাবতে পারেন!

—দেশে যান নি একবারও?

মিঃ রাও বললেন,—মাত্র তিনবার। প্রতি ক্ষেপে মাস খানেক কাটিয়ে এসেছি। টাকা বেশি পাবো বলে ট্রান্সফার নিয়ে এখানে এসেছিলাম, কিন্তু একঘেয়েমির শাস্তি যে এত প্রচণ্ড হতে পারে, তা কি তখন জানতাম?

ক্যাপ্টেন বললেন,—এখানে ফ্যামিলি নিয়েই আছেন আশা করি?

—ফ্যামিলি? মিঃ রাও বললেন, অবশ্য এখানে একটা বিয়ে করেছি, কিন্তু মন তো পড়ে আছে দেশের আনাচে কানাচে। দেশে আমার তিন-তিনটে সন্তান, দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। মেয়ে দুটিরই বিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, নাতি-নাতনীও হয়ে গেছে। যদিও তাদের মুখ দেখিনি এখনো। আমার ছেলে ম্যাড্রাসে চাকরি পেয়েছে একটা ফার্মে। একাউণ্টেণ্টের চাকরি। ভালোই আছে তারা। চিঠিপত্র নিয়মিত লেখে। স্ত্রী আছে দেশের বাড়িতে।

ক্যাপ্টেন বললেন, আর এখানকার ফ্যামিলি?

—ওনলি ওয়ান সন,—মিঃ রাও বললেন,—বছর ছয়েক হলো এখানকার সংসার করেছি। ছেলেটা বছর চারেকের মাত্র। আমার একটি স্টেপ সনও আছে। বিলেতে পড়ছে।

—ভেরি গুড।

রাও বললেন,—তার খরচ-খরচা সব ওর মায়ের। ওর মা এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির একজন সক্রিয় সভ্যা। মহিলা সমিতির প্রেসিডেণ্ট। খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল।

বলে আমার দিকে ফিরলেন, তারপরে বললেন—চলুন মিস্টার, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

লঞ্চে করে আমরা এগিয়ে চলছিলাম, স্থির জলরাশির বুকে শুভ্র রেখা এঁকে এঁকে। বিশেষ কোনো কথা হয় নি লঞ্চে বসে। ভদ্রলোকের মন আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হয়ত দেশের মাটিতে ফিরে গেছে। হয়ত প্রৌঢ়া স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। হয়ত চোখের সামনে ভাসছে নাতি-নাতনীদের কাল্পত মুখগুলো।

ভাবছিলাম আমিও। ভারতের মানুষ এই দ্বীপে এসে দ্বিতীয় সংসার করছে। ছেলেও হয়েছে বছর চারেক হলো। কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে, স্ত্রীর আছে আগের পক্ষের সন্তান, সে গেছে বিলেতে পড়তে।

মাটিতে পা দেওয়া মাত্র আমার কিন্তু চোখ পড়েছিল তীরের কাছ ঘেঁষা নোঙর ফেলা কাঠের জাহাজগুলোর দিকে। মাল ওঠানো নামানোর পালা চলছে। রীতিমত লোকের ভিড়। আমাদের দিকে কয়েকজন মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বিদেশী বলে বুঝতে পেরে কৌতূহলে তারা ফেটে পড়ছে, কিন্তু কোনো কথা বলছে না। তাদের মধ্যে একটি মানুষকেই বিশেষ করে নজরে পড়ে। খালি গা, পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, বয়স আমারই মতো। রীতিমত স্বাস্থ্যবান, নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল, রঙ কালো হলেও শরীরে একটা ঝকঝকে ভাব আছে। মুখখানি পরিষ্কার কামানো, একটা ছেলেমানুষি ধরন আছে, যা অনতিদূর থেকেও আমি অনুভব করতে পারছিলাম। চোখ দুটি বড়ো বড়ো, এবং সেই বড়ো চোখে বিস্ময় নেই, আছে অদ্ভুত একটা কৌতুকের দ্যুতি।

রাও তার দিকে তাকিয়ে এই এতক্ষণ পরে কথা বললেন, ইয়ুসুফ, একবার আমার বাড়িতে এসো, কথা আছে।

একটু জড়িত হিন্দীতে কথাগুলো বললেন রাও, সুস্পষ্ট না হলেও আমি ওঁর বক্তব্যের তাৎপর্য অনুভব করলাম। লোকটি মাথা হেলিয়ে তার কথার উত্তর দিলো এবং একটা খাতায় কী লিখছিল, বোধহয় মালের হিসাব—সঙ্গে সঙ্গে তাতে মন লাগালো, যাতে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে আমাদের কাছে আসতে পারে।

খুব একটা কৌতূহল যে হয়েছিল এমন নয়। আমার মন তখন আচ্ছন্ন করেছিল দ্বীপের রূপ। চন্দ্রকলার মতো এই দ্বীপ। কোলে তার সুনীল জলরাশি ছোট ছোট শুভ্রমুখ-ঢেউয়ে বিভক্ত হয়ে তীরভূমিকে গিয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে। আর তীরের কাছাকাছি নোঙর করে আছে বহু ছোট ছোট কাঠের জাহাজ। এছাড়া আছে সোনালী বালুবেলার ওপরে-ওঠানো অসংখ্য জেলে-ডিঙি। কিন্তু এর থেকে যে চিত্র আমাকে আকর্ষণ করছিল বেশি, সেটি হচ্ছে দ্বীপের নিজস্ব রূপ। লঞ্চে করে যত এর কাছাকাছি হচ্ছিলাম, ততই মনে হচ্ছিল আমরা যেন কোনো গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছি। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ একটু উঁচু, তার ওপর সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে নারিকেল বীথি, তার পিছনে ঝাকড়ামাথা আরও বনস্পতি। ফাঁকে ফাঁকে কিছু কুটির, কিছু লাল টালি-ছাওয়া বাংলো-বাড়ি নজরে পড়লেও অরণ্য যেন সবাইকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে মনে হচ্ছিল। অরণ্য-মেখলা ঘেরা দ্বীপও বহু দেখেছি, কিন্তু এ দ্বীপের আরণ্যক বিস্তৃতির এক বৈশিষ্ট্য আছে। আমার মনে হচ্ছিল দ্বীপটি যেন একক, যেন এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার পাশে ছিলেন মিঃ রাও। কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল আমি নিঃসঙ্গ। দ্বীপের সমগ্র পরিবেশের মধ্যে যেন একটা নিঃসঙ্গতার ভাব মিশে আছে।

বেশি দূর হাঁটতে হয়নি। বাংলো ধরনের মাথায় লাল টালি বসানো বাড়ি, সামনের দিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। গৃহকর্ত্রী বোধহয় দূর থেকেই আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। আমরা বাড়ির খুব কাছাকাছি হবার আগেই তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পিছনে আরও দুটি স্ত্রীলোক, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের। গৃহকর্ত্রীর পরনে সবুজ একটি লুঙ্গি, গায়ে পাতলা অর্গান্ডির সাদা ব্লাউজ, তার নিচে বক্ষ-বন্ধনীটা পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করা যায়। মাথার চুলে কোন বিশেষ কারুকার্য নেই, টান করে পিছন দিকে খোঁপা বাঁধা। দেখলে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স বলে মনে হয়, নাতিস্থূল এবং নাতিদীর্ঘ চেহারা, গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল না হলেও রঙটা ফর্সার দিকে। এক নজরে হলেও মনে হলো, পিছনের তরুণী দুজনের গায়ের রঙও অনুরূপ।

মিঃ রাও এগিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিতেই ভদ্রমহিলা আমাদের মতো করজোড়ে নমস্কার জানালেন, তারপরে বললেন, প্লীজ কাম ইন।

আমরা বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। ভদ্রমহিলা ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন নি, আমাদের একটু কফি পানে আপ্যায়িত করেই চলে গেলেন। কথা-বার্তা বললেন পরিষ্কার ইংরেজীতে। যা বললেন তার অর্থ হলো, মিউনিসি-প্যালিটির বৈঠক বা মিটিং আছে, উনি কাউন্সিলার, ওঁকে যেতেই হবে, আমি যেন কিছু মনে না করি, ঘরে ওঁর এক বোনকে রেখে গেলেন আমাদের 'সঙ্গ' দেবার জন্য।

বুঝলাম, সেই তরুণী দুটি ওঁর বোন। তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়োটিকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন, ছোটটির বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়, কালো লুঙ্গির ওপরে চিকনের কাজ করা, সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরা, কেশ-বন্ধনে কিছু পারিপাট্য আছে, নিঃসংকোচে এসে আমাদের সামনে বসলেন। আর তিনি বসামাত্রই মিঃ রাও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—আমি একটু পোষাক-আশাক বদলে আসছি, কিছু মনে করবেন না।

এই ভদ্রমহিলাও ইংরেজীতে বাক্যালাপ করতে লাগলেন। বললাম, আপনারা সবাই বেশ ভালো ইংরেজী বলেন তো?

উত্তরে অল্প একটু হাসলেন, বললেন, আমাদের এখানে মেয়েদের একটা কনভেন্ট আছে, সেখানে আগে একজন ইংরেজ সন্ন্যাসিনী থাকতেন, সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করায় এখানকারই একটি মহিলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ চালাচ্ছেন।

বললাম, মাপ করবেন, আপনারা কি ক্রিশ্চান?

মহিলাটি আবার একটু হেসে বললেন, না, না, ক্রিশ্চান নই। ধর্মের কোনো গোঁড়ামি আমাদের নেই। তবে ধর্মের কথা যদি বলতে হয়, ত, আমাদের মুসলিম বলতে পারেন।

একটু অবাক হয়েই তাকালাম ওঁর মুখের দিকে। ভদ্রমহিলা আমার মুখের

দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার অল্প একটু হাসলেন, বললেন, মিঃ রাও অবশ্য হিন্দু, ধর্ম নিয়ে আমাদের এখানে কোনো বিরোধ নেই।

খুব নিঃসংকোচেই ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলেন। আরও কিছু সাধারণ কথাবার্তার পর তিনি বললেন, মিঃ রাও শীগগিরই রিটায়ার করবেন, দেশে ফিরে যাবেন।

বললাম, আমার কৌতূহলের জন্য মাপ করবেন। আপনার দিদি—

ভদ্রমহিলা আভাষেই আমার প্রশ্ন বুঝতে পারলেন বলে মনে হলো, বললেন, আমার দিদি যাবে না, বাচ্চাটাকেও ছাড়বে না।

তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এতে অবাক হচ্ছেন কেন? এরকম কতো হয়! আপনাদের দেশ থেকে দু'চারজন আসেন চাকরি-বাকরির ব্যাপারে। পিছন দিকে যে লাইট হাউসটি আছে, যদি খানিকটা হাঁটেন তো দেখতে পাবেন, সেখানেও এক ভদ্রলোক আছেন আপনাদের দেশের। তিনিও এখানে বিয়ে করেছেন। তিনি যখন আবার বদলি হবেন বা রিটায়ার করবেন, তাঁর স্ত্রী এখানেই থেকে যাবেন।

বললাম, কিন্তু মহিলারা জেনেশুনেই তো—

—নিশ্চয়ই,—বাধা দিয়ে উনি বলে উঠলেন, জেনেশুনেই মেয়েরা বিয়ে করে।

—স্বামী দেশে ফিরে গেলে ওঁদের কী অবস্থা হবে?

—কী আবার হবে? —ভদ্রমহিলা বললেন, দরকার হলে আর একটি বিয়ে করবে। এসবে কোনো দোষ নেই।

আমি একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বলে উঠলাম, আপনারা আমাদের দেশের লোকদের খুব খারাপ মনে করেন তো? এইভাবে দেশে স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও এখানে এসে আবার বিবাহ?

ভদ্রমহিলা স্পষ্টতই হেসে ফেললেন, বললেন, কে জানে আপনাদের দেশের লোকেরা কী রকম! যেই আসে সেই এখানে দুদিন কাটাতে না কাটাতেই বদলির জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, অথবা এত একা একা অনুভব করে যে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে। অবশ্য সবাই যে স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে এমন নয়। এখানে বিয়ে হয় মেয়েদের পছন্দে, ছেলেদের নয়।

আমার আরও অবাক হবার পালা। বললাম, তাহলে আপনার দিদি—

হ্যাঁ,—উনি উত্তর দিলেন—মিঃ রাওকে আমার দিদিই পছন্দ করে বিয়ে করেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেল। উনিই ভঙ্গ করলেন সেই নীরবতা। বললেন, আপনাদের দেশের খবর আমরা পাই রেডিওর মারফৎ। দৈনিক পত্র-টত্রও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে, তা থেকে আপনাদের দেশ সম্বন্ধে যা বুঝতে পারি, তাতে আমরা অবাকই হই। অথচ, রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের দ্বীপ কিন্তু ভারতেরই অন্তর্গত।

বললাম, এখানে মনে হয় মেয়েদেরই প্রাধান্য বেশি।

উত্তর পেলাম,—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। মেয়েরাই মিউনিসিপ্যালিটি চালায়, মেয়েরাই লেখাপড়া শেখার চেষ্টা করে বেশি।

আর ছেলেরা?

মেয়েটি বললে,—ছেলেরা অধিকাংশই তো বাইরে, জাহাজে জাহাজে নাবিক হয়ে বেড়ায়। আর যারা একটু ধনী, তারা ইংল্যান্ড কিম্বা ফ্রান্সে পড়তে যায়। পড়াশেষের পর অনেকে ওসব জায়গাতেই চাকরি-বাকরি নিয়ে বসে যায়, দেশে আর ফেরে না।

—আর যারা এখানে থাকে?

মেয়েটি বললে,—এখানে যারা থাকে তারাও ঐ জাহাজ সংক্রান্ত কাজেই নিযুক্ত। হয় কলের জাহাজ, নয় কাঠের জাহাজ। দেখলেন না কতো কাঠের জাহাজ তীরের কাছে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে?

—হ্যাঁ, তা দেখেছি বটে!

আমরা এই ধরনেরই আলাপে মগ্ন হয়ে আছি,—এমন সময় ভিতর থেকে এলেন মিঃ রাও। দেখেই মনে হয় স্নান-টান সেরে এলেন একেবারে। বললেন,—এক্সকিউজ মি, একটু দেরি হয়ে গেল। কিন্তু সে ছোকরাই বা গেল কোথায়! তাকে যে আসতে বললাম—

হঠাৎ-ই এই সময় বাইরের বারান্দা থেকে আওয়াজ ভেসে এলো,—এই যে আমি এখানে।

তার উত্তরের ভাষা অবশ্যই ভাঙা ভাঙা হিন্দী।

মিঃ রাও একটু অবাক হয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, ওখানে কেন? কতক্ষণ এসেছো?

সে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। বললে,—অনেকক্ষণ। ওঁরা কথা বলছিলেন, তাই—

আমি ততক্ষণে মেয়েটির দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। চোখদুটি পরিপূর্ণ মেলে দিয়ে মেয়েটি তাকিয়ে আছে ছেলেটির দিকে, অদ্ভুত খুশিতে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে!

মিঃ রাও বললেন,—ঠিক আছে, আর দেরি করো না, ভদ্রলোককে নিয়ে একটু ঘুরে-টুরে দেখাও, তারপরে লঞ্চে করে ওঁকে জাহাজে পেঁৗছে দিয়ে এসো, বুঝলে?

সে মাথা হেলিয়ে জানালো,—আচ্ছা।

তারপরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—আইয়ে জী।

আমি উঠলাম। আনুষ্ঠানিক ভাবে মিঃ রাও ও মেয়েটির কাছে বিদায় নিতে গেছি, মেয়েটি বললে,—চলুন আমিও সঙ্গে যাই। ও আপনাকে কী বোঝাতে কী বোঝাবে কে জানে! যেমন জানে হিন্দী, তেমন ইংরেজী! আসুন।

আমরা বাংলো বাড়িটার গেট খুলে পথে এলাম। চলতে-চলতে মেয়েটিকে ইংরেজীতেই প্রশ্ন করলাম,—এ ছেলেটি কে? তখন দেখেছিলাম কাঠের জাহাজের মাল খালাসের হিসাব কষছে। মিঃ রাওয়ের কোনো কর্মচারী হবে, তাই না? যেভাবে মিঃ রাও ওকে হুকুম করছিলেন!

মেয়েটি আমার কথা শুনে হেসে ফেললো। বললে,—না না, মিঃ রাওয়ের কোনো কর্মচারী ও নয়, ও নিজের ইচ্ছেমত কাজ-কর্ম করে। যেদিন ইচ্ছে যায়, মালের হিসাব শুধু নয়, নিজের পিঠে পর্যন্ত মাল বয়ে খালাস করে, আর নয়ত কারুর নারকেল বাগানে ফরমাশ মতো নারকেল পাড়ার ঠিকা নেয়। মিঃ রাও যে ওকে হুকুম করেন, আর ও যে তাকে সমীহ করে চলে, তার কারণ অন্য।

ছেলেটি আগে আগে চলছিল, আমরা পিছনে পিছনে, কিন্তু পাশাপাশি। একটি নারকেল বাগানের মধ্য দিয়ে আমরা চলছিলাম। লোকজন ছিল। এক জায়গায় দেখি খানিকটা অংশ ফাঁকা, আর মাটি লেপে ঝকঝকে তকতকে করা। একটি বাংলো বাড়ির বিস্তৃত উঠোন। গ্রামের ভিতরে রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। আমাদেরই গ্রাম-অঞ্চলের মতো এক বাড়ির উঠোনের ধার দিয়ে কিংবা বাগান পেরিয়ে সরু পায়ে চলা পথ এঁকে-বেঁকে গেছে। কোনো বাড়ির চৌহদ্দি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে চিহ্নিত করা, আবার কোনো বাড়ির তা-ও নেই।

যাই হোক, সেই উঠোনে পুরু নারকেলখণ্ড টুকরো টুকরো করে কেটে রোদ্দুরে শুকুতে দিয়েছিল। এখন বিকেল পড়ে আসছে বলে বড়ো বড়ো টুকরিতে তোলা হচ্ছে। এ-ব্যাপারটা আমি আগেও দেখেছি অন্য দ্বীপে। নিশ্চয় লাভের ব্যবসা। এক পলকের জন্য ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কিছু মনে না করেন, কারণটা জানতে পারি কী?

মেয়েটি বললো, স্বচ্ছন্দে! ও এখন ট্রায়ালে আছে কি না, তাই আমাদের বাড়ির বড়োদের সবাইকেই ও সমীহ করে চলে। নইলে সমীহ করে চলবার মানুষ ও নয়। ভীষণ বেপরোয়া স্বভাবের লোক ও। বাবা-মার সঙ্গে পর্যন্ত বনে না, তাই একা থাকে। যাবেন ওর বাড়িতে?

—তা যেতে পারি।

পেছন থেকে হেঁকে মেয়েটি ওকে সেই নির্দেশই দিলো। ছেলেটি একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে সোজা পা বাড়িয়ে দিয়ে ডান দিকের একটা পথ ধরলো, একটু উঁচুতে উঠতে হয়, তবে এও নারকেলের বাগান। বললাম, ট্রায়াল কথাটা বুঝলাম না কিন্তু। কিসের ট্রায়াল?

মেয়েটির মুখখানা চাপা হাসিতে আবার ভরে গেল। বললে, সে সব শুনতে গেলে আপনার মিউনিসিপ্যালিটির সভা, হাসপাতাল, স্কুল এসব কিছুই দেখা হবে না।

বললাম, সে সব কে দেখতে চায়? আপনি বলুন।

মেয়েটি বললে, আমরা লাইট হাউসের দিকে চলেছি, জানেন? লাইট হাউসের কাছেই ওর বাড়ি।

তা হোক, বলুন।

মেয়েটি বললে, লোকটা কী করেছে জানেন? আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি ততক্ষণে। মেয়েটি বললে, দাঁড়ালেন কেন, চলুন? চলতে চলতেই কথা হোক। বেশি দূর নয়, এখুনি পে'ছে যাবো।

তারপর চলা শুরু করে পাশাপাশি চলতে চলতে বললে, আমি 'না' করিনি, আবার 'হ্যাঁ'ও করিনি, তাই ও ট্রায়ালে আছে। যদি বুঝি ওকে বিয়ে করা চলে, তাহলেই করবো, নইলে নয়।

কিন্তু একটা কথা—

বলুন?

বললাম, আপনি শিক্ষিতা, ইংরেজীতে বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন, আর ও হচ্ছে একজন সাধারণ মজদুর, তাই—

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। আমাদের পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে দূরত্ব কিন্তু ততক্ষণে বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে। সে লোকটিও আশ্চর্য, পিছনে মুখ না ফিরিয়ে নিজের মনেই হে'টে চলেছে।

মেয়েটি বললে—সাধারণ শ্রমিক বা মজদুর বলে আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই। আসল কথা কী জানেন? আমি আমার এই ছোট্ট দ্বীপটিকে ভীষণ ভালবাসি। কেউ যখন বলে, এখানে তেমন ক্লাব নেই, সিনেমা নেই, অমুক নেই, তমুক নেই, আমার খুব আশ্চর্য লাগে! তেমনি, কেউ যখন বলে, জায়গাটা খুব বোরিং—একঘে'য়ে, তখনও খুব অবাক হয়ে যাই। তারা কি সমুদ্রের ঐ ছোট ছোট ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না? সারাদিনের পর যখন জেলেরা ডিঙিগুলোকে নিয়ে ঝাঁক বে'ধে ফিরে আসে, তখন কি খারাপ লাগে দেখতে? সন্ধ্যের পর লাইট হাউসের আলোক-রেখা যখন নিঃসীম অন্ধকারের বুক চিরে কাউকে খ'ুজে বেড়ায়, তখন আমার যে কী ভীষণ ভাল লাগে, তা আপনাকে আর কী বলবো?

এসব কথা হাঁটতে হাঁটতেই হচ্ছিল। আমরা উ'চুতে উঠছিলাম, একথা আগেই বলেছি। কথা বলতে বলতে ঠিক এই সময় আমরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালাম, যেখান থেকে জায়গাটা আবার নিচে নেমে গেছে এবং নারকেল-বাগানের আড়াল দিয়ে সমুদ্রকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটা দ্বীপের আর একটি দিক। জেলেডিঙিগুলো পাল তুলে হাঁসের মতো ঝাঁক বে'ধে তীরের দিকে ফিরে আসছে। সমুদ্রের বুকে এখন ঘোর বেগুনী রঙ লেগেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলোর মাথায় হীরের মতো শুভ্র ফেনাপুঞ্জ ঝিকমিক করছে! দিগন্তে সার বে'ধে দাঁড়ানো সাদা মেঘের ওপরে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা! আমি থমকে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, মেয়েটি বললে,—একটু বাঁদিকে তাকান, ঐ দেখুন লাইট-হাউস!

সত্যি, লাইট হাউসটিও দেখবার মতো। ছোট খাটো একটা দুর্গ যেন!

পাথর গেঁথে তৈরি। সোজা গম্বুজের মতো না উঠে অনেকটা পিরামিডের মতো আকার নিয়ে উঠেছে। ঠিক মাথার ওপরে কাঁচ-ঘেরা আলো-ঘর।

লাইট হাউসের দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই একটা কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি ঘর পাওয়া গেল। শুনলাম, এটাই হচ্ছে ইয়ুসুফের ঘর। ইয়ুসুফ তালা খুলে আমাদের ভিতরে বসতে দিলো দুটি মোড়ায়। মেয়েটির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, সে নিজেও এই প্রথম এলো ওর ঘরে!

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। ইয়ুসুফ ঘরের জানালাগুলো খুলছে, আমি সেই অবকাশে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম,—আমার কথার উত্তর কিন্তু এখনো পাইনি।

মেয়েটি একটু অবাক হয়েই ঘরের চারদিক দেখছিল। সাধারণ শ্রমিক, আসবাবপত্র বলতে একটা তক্তোপোষ ছাড়া আর কিছু নেই। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে মেয়েটি বললে,—এখানকার লেখাপড়া-জানা মেয়েরা শিক্ষিত ছেলেদেরই বিয়ে করতে চায়। বিদেশী যারা চাকরি করতে আসে, তাদের দিকেও মাঝে মাঝে এই কারণেই ঝোঁকে। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন। আমাদের শিক্ষিত ছেলেরা বাইরে যেতে চায়, নিদেন পক্ষে জাহাজে। আমার এটা ভালো লাগে না। কিন্তু ঐ ওকে দেখুন, মাটি ছেড়ে কখনো কোথাও যেতে দেখি না।

—তাহলে আর ট্রায়াল কেন? ওকেই বিয়ে ক'রে ফেলুন না!

মেয়েটি ততক্ষণে দেওয়ালের কুলুঙ্গির দিকে তাকিয়ে কী দেখে যেন নিদারুণ বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছে! ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও দেখলাম। কুলুঙ্গিতে ছোট একটি বিষ্ণুমূর্তি। নিকষ ক্যালো কষ্টিপাথরের। কী অপূর্ব সুষমা!

—এটা কী?—মেয়েটি কাছে গিয়ে ওকে প্রশ্ন করলো।

ছেলেটি উত্তর দিলো হিন্দীতে। তার অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়: বহুকাল থেকে এটি ওদের বাড়িতে আছে। ওর বাবাও বলতে পারেন না কবে থেকে আছে। পুরুষানুক্রমে এটি রয়ে গেছে ওদের ঘরে। মূর্তিটি ভালো লাগায় ইয়ুসুফ মা-বাবার কাছ থেকে জোর করে এটি নিয়ে এসেছে নিজের ঘরে। ওর মুখ দেখে রোজ বাইরে বেরোয়, তাই কোনো বিপদ হয় না!

বললাম,—এটা কিন্তু হিন্দুদের মূর্তি।

—না, মেয়েটি বললে,—এটি এই দ্বীপের মূর্তি। এ-রকম মূর্তি আরও দু-একজন পেয়েছে। যাঁরা এই মূর্তি পুজো করতেন, হয়ত তাঁদেরই বংশধর আমরা।

বলতে বলতে উজ্জ্বল দুটি চোখে আমার দিকে তাকালো। বললে,—বুঝতে পেরেছেন? এর জন্যই ও মাটি ছেড়ে যেতে পারে না। মূর্তিটাকে ও ভালোবেসে ফেলেছে!

বলে, ইয়ুসুফের দিকে এগিয়ে এলো, গায়ে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো,—যাও, সাহেবকে সঙ্গে করে জাহাজে পেঁছে দিয়ে এসো। আজ থেকে আমি এ-ঘরেই থাকবো, কোথাও যাবো না।

ফিরে এলাম যথারীতি জাহাজে। ছেলেটি সর্বক্ষণ নির্বাক ছিল লঞ্চের মধ্যে বসে। আমিও কোনো কথা বলি নি। জাহাজে ওঠবার ঠিক আগে ওকে বলেছিলাম,—তোমরা মুসলিম না?

ও বলেছিল,—হ্যাঁ। কিন্তু তার থেকে বড়ো কথা, আমরা দ্বীপের লোক, দ্বীপ আমাদের মা-বাপ, এ-ছাড়া আর কিছু আমাদের বিশেষ করে ভাববার নেই।

বললাম,—এটা তোমার নিজের কথা? না, ঐ মেয়েটির কথা?

উত্তর দিয়েছিল,—আমাদের দুজনেরই কথা।

॥ ১১ ॥

হাল আর মাস্তুল ভাঙা বিধ্বস্ত জাহাজটা সেদিন বন্দরের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সমুদ্রে আসল ঘূর্ণিঝড় যে কী সাংঘাতিক বস্তু, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন। 'সেদিন' বলে আজও মনে হয়। মনে হয় একেবারে কালকের ঘটনা, চোখের সামনে যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। অথচ ঘটনাটা ঘটেছিল বহু বছর আগে। বহুদিনকার সেই জাহাজও আর নেই বলে শুনেছি, সেই বন্দরের চেহারাও গেছে বদল হয়ে, হয়ত বা পোশাক-আশাক-চরিত্রে সেই মানুষগুলিকেও আজ আর চেনা যাবে না।

জাহাজের কেরানী বলে ছোট থেকে বড়ো সবার সঙ্গেই আমার মোটামুটি যোগাযোগ ছিল। আমরা মিনিকয় দ্বীপ ছেড়ে আফ্রিকার উপকূলের দিকে চলছিলাম। অবশ্যই পূর্ব উপকূল। আমার জানা ছিল, জাহাজ পর পর দুটি বন্দরে গিয়ে থামবে, একটি জাঞ্জিবার, অপরটি মোম্বাসা। প্রথমে কোথায় যাবো আগে, তা জানা নেই। কিছুদূরে এগিয়ে যাবার পর রেডিও অফিসার মোম্বাসাকে বেতারে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে, কথা ছিল।

আমার মনটা আচ্ছন্ন ছিল মিনিকয়ের স্মৃতিতে, বারবার আমাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল মিনিকয়ের সেই লাইট হাউস আর সেই মেয়েটির মুখ। জাহাজের মধ্য অংশের বাঁ দিককার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম আমি আর ইঞ্জিন বিভাগের এক খালাসী। বেলা তখন ঠিক দুপুর। দিগন্তে সাদা মেঘেরা বলাকার মতো দল বেঁধে চললেও সারা আকাশটা একেবারে প্রগাঢ় নীলিমায় ঝকঝক করছে! বাতাসে জোর ছিল, আমাদের মাথায় এসে চুলগুলি এলোমেলো করে দিচ্ছিল, আর সমুদ্রে ভর্তি ছিল ছোট ছোট ঢেউ। সেই সংখ্যাতীত ঢেউগুলোর মাথায় জ্বলছিল ধবধবে সাদা ফেনা—হীরের টুকরোর মতো।

দুজনে দাঁড়িয়ে আছি নির্বাক, যে যার চিন্তায় নিবিষ্ট, হঠাৎ মনে হলো, দিগন্তের নিশ্চিন্ত মেঘের দলে একটা সাড়া পড়ে গেছে। কয়েকটা মেঘকে মুছে দিয়ে সমুদ্রে পর্যন্ত একটা ঝাপসা ধূসর বর্ণ সঞ্চারিত হয়ে পড়ছে। বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরেই ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করছিলাম। ক্রমে ক্রমে মনে হলো, দিগন্ত-রেখার কাছাকাছি প্রায় সব মেঘগুলোকেই গ্রাস করছে ঐ অদ্ভুত ধূসরতা,

হাওয়ায় তখন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব, দূরে বৃষ্টি হলে যে রকম স্পর্শ পাওয়া যায়, ঠিক সেই রকম।

দেখতে দেখতে সেই আদিগন্ত ধূসরতা আমাদের জাহাজের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আমার সঙ্গীটি হঠাৎ মুখ তুলে দিগন্তে ঐ নিঃশব্দ বিবর্ণতার আবির্ভাব লক্ষ্য করে রেলিং ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল ভিতরে, সম্ভবত তার ইঞ্জিন বিভাগে। আমি ওর দ্রুত ত্রস্ত ভাব দেখে একটু অবাক হলাম। দিগন্ত থেকে তখন কিন্তু সমুদ্রের নীলিমা পর্যন্ত ধূসর করে দিয়ে কী একটা ছুটে আসছে আমাদের দিকে। টের পেলাম, সারা জাহাজ জুড়ে একটা ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে! ওপরে হুইল হাউসে ঘন ঘন শব্দ হচ্ছে—ক্রি-রি-রিং—ক্রি-রি-রিং!

আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেও ভাবতে লাগলাম, ভয় পাচ্ছে কেন ওরা? এ নিশ্চয়ই বৃষ্টি! মেঘের কাজল ধুয়ে বৃষ্টি আসছে দিগ্বিদিক ঝাপসা করে দিয়ে।

কিন্তু না, একটু পরেই আমার ভুল ভাঙলো। অফিসারদের কে একজন যেন আমার কাছে ছুটে এসে আমার বাহু ধরে হ্যাঁচকা টানে একেবারে ভিতরে এনে ফেললো। তারপরে তাড়াতাড়ি এঁটে দিলো লোহার দরজা। অতর্কিতে অমন করে টান দেওয়ায় রীতিমত হাঁপাচ্ছিলাম, বললাম, কী ব্যাপার!

সে বললে, তোমার কেবিনে যাও।

বলে, সে ছুটে অন্য দিককার দরজা বন্ধ করতে শুরু করলো।

জাহাজটা ততক্ষণে কিসের ধাক্কা খেয়ে যেন প্রবলবেগে নড়ে উঠলো। তারপর প্রচণ্ড দোলা খেলে জাহাজের যা অবস্থা হয়, তা-ই হলো। ভিতরকার অপরিসর গলি দিয়ে নিজের কেবিনে যে হেঁটে যাবো, তা-ও পারছিলাম না। মাতালের মতো টলতে টলতে কেবিনে এলাম। কেবিনের জিনিসপত্র সব একাকার। গোলাকার ফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ডেকের উপর জল এসে প্রবলবেগে আছড়ে পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে! যেন কাঁচের টুকরো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ভয় পেয়ে ফোকরটা বন্ধ করলাম, তাও অতি কষ্টে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো জাহাজের কোনো অংশে। জাহাজটা হঠাৎ-ই কাত হয়ে জলের ওপর হুড়মুড় করে পড়বার মতো হলো। আমি বসেছিলাম চেয়ারে, মুহূর্তে ছিটকে গিয়ে আমার খাটের কিনারে পড়লাম। বুকের নিচের দিকে ভীষণ লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে বমি ছিটকে বেরুলো। তারপরে আর কিছু মনে নেই।

বুকের পাঁজরটায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে যখন চোখ মেললাম, তখন দেখি শুয়ে আছি বিছানায়, পাশে স্টুয়ার্ড। বুকের বাঁ পাশে পাঁজরার নিচের দিকে প্লাস্টার করা। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ডানদিকে মুখ ফেরালাম। ফোকরটা কেউ খুলে দিয়েছে, দেখলাম, আকাশটা কালো। অসংখ্য তারা। জাহাজটা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ার সেই দুরন্ত সোঁ সোঁ শব্দও আর নেই।

বুঝলাম, সেই অতর্কিতে-ওঠা ঝড়টা থেমে গেছে। স্টুয়ার্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। চল্লিশের মতো বয়স, বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা। আমার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে।

বললাম,—ঝড় থেমেছে ?

—হ্যাঁ।

অনেক রকম ঝড় দেখেছি, জাহাজে ঝড়ের অভিজ্ঞতা আমার কম নয়, কিন্তু ঠিক এ রকম ঝড় তো কখনো দেখিনি !

মনে আছে 'ঝড়' বলতে ইংরেজী 'সাইক্লোন' শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম।

স্টুয়ার্ড বললে,—একে ঠিক সাইক্লোন বলে না। এ হচ্ছে অনেকটা টাইফুনের মতো ঘূর্ণি-ঝড়। আরব সাগরের বিশেষত্ব। হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। তবে বড়ো হিংস্র ধরনের, সামনে যা পড়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। ভাগ্য খুব ভালো যে, জাহাজটা কাত হয়েও বেঁচে গেছে, ডুবে যায় নি।

বললাম,—একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনেছিলাম, ইঞ্জিন-টিঞ্জিনের কিছু হয় নিতো ?

স্টুয়ার্ড মুখ কালো করে বললে, হালটাই ভেঙে গেছে। জাহাজ আর চলতে পারবে না। চারদিকে এস-ও-এস পাঠিয়েছে রেডিও-অফিসার।

ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পাঁজরায় খচ করে লাগায় আবার কাতরাতে কাতরাতে শুয়ে পড়লাম। বললাম,—আমার পাঁজরার হাড় ভেঙে গেছে ?

ও বললে, ডাক্তার না আসা পর্যন্ত বলি কী করে ? আমরা ফার্স্ট-এড দিয়েছি, সে তো প্লাস্টার দেখেই বুঝতে পারছো।

মনটা দমে গেল। একটুক্ষণ থেমে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, আমার বমি হয়েছিল, সে গুলো—

বাধা দিয়ে স্টুয়ার্ড বলে উঠলো, পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বমি নয়। রক্ত !

আর্তনাদ করে উঠলাম,—রক্ত !

—ভয় পাবার কিছু নেই,—স্টুয়ার্ড বললে,—বুকের নিচে আচমকা চোট পেলে ব্লাড বেরিয়ে আসতে পারে মুখ থেকে। ক্যাপ্টেনের কাছে ওর ওষুধ ছিল, তোমার ঠোঁট ফাঁক করে মুখে ফেলে দিয়েছি। কাজ হয়েছে। নইলে, এত তাড়াতাড়ি চোখ মেলতে পারতে না, বা কথাও বলতে পারতে না।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে স্টুয়ার্ড উঠে গিয়েছিল। একজন কুক এসে আমাকে গরম দুধ খাইয়ে গিয়েছিল এক গেলাস। উঠতে পারছিলাম না। আমার কেবিনের ছোট্ট গোলাকার জানালাটুকুই ছিল আমার সম্বল। সেখান থেকে যতটুকু দেখছিলাম, তার অনুভূতির সাহায্যে বলতে পারি, জাহাজটি আবার নড়তে আরম্ভ করেছিল প্রায় তের-চোদ্দ ঘণ্টা পরে। ফোকর দিয়ে দেখলাম, দিনের আলো নিভে গিয়ে রাত্রি নেমে এলো। সুজি দিয়ে আমাদের দেশের পায়েসের মতো একটা কিছু তৈরি করে আমাকে দিয়ে গেল সেই কুকটি।

একবার আমাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল সেই ইঞ্জিন-খালাসী। স্টুয়ার্ড এসে একটা বড়ি খাইয়ে দিয়ে গেল। ফলে রাত্রে ঘুমোলাম মৃত মানুষ-এর মতো।

সকালে ঘুম ভেঙেছিল বেশ একটু দেরিতে। আস্তে আস্তে নিজেই উঠে বাথরুম থেকে ঘুরে এলাম। এসে চেয়ারটিতে বসা মাত্রই মনে হলো, জাহাজটা নড়ছে। ফোকর দিয়ে যতটুকু দেখতে পেলাম, তাতে মনে হলো, অন্য ছোট ষ্টিমার, যাকে জাহাজী ভাষায় টাগ বলে, সেইরকম দুটি টাগ এসে লোহার শক্ত রশি আমাদের জাহাজের সঙ্গে লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মনের অবস্থা এমন হলো যে, আর বসে থাকতে পারলাম না। ধীরে ধীরে উঠে অ্যালিওয়ে বা ভিতরকার গলিপথে এসে দেওয়াল ধরে ধরে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। স্টুয়ার্ড ওখানে দাঁড়িয়ে জলের দিকে ঝুঁকে কী যেন দেখছিল, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধমকে উঠলো,—পাগল হয়েছো নাকি, অ্যাঁ, অসুস্থ শরীরে উঠে এলে ?

বললাম, দেখতে এলাম। কোন বন্দরে যাচ্ছি জানো ?

—মোম্বাসা।

আমি তখন টাগ দেখছিলাম। এ-পাশে ও-পাশে দুটো টাগ জাহাজ-রূপ পথিককে যেন দুজনে দুদিক থেকে দু-হাতে সন্তর্পণে ধরে বন্দরের দিকে নিয়ে চলেছে।

দৃশ্যটি সেদিন বড়ো অদ্ভুত লেগেছিল আমার কাছে। যেন জাহাজকে নয়, আমারই ভাগ্যহত জীবনকে ধরে কেউ যেন তীরভূমিতে নিয়ে চলেছে। আমি রেলিং-এর ওপর একটু ঝুঁকে একটা টাগকে ভাল করে দেখতে গেছি হঠাৎ খচ্ করে বুকের প্রান্তে একটা প্রবল ব্যথা জেগে উঠলো! আর যাবে কোথায়! দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। জলে ডুবলে মানুষ যেমন একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে, আমার হলো ঠিক তেমনি অবস্থা। বাকিটা মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে, স্টুয়ার্ড দুটি হাত পেতে আমার অবশ দেহটাকে ধরে ফেলেছিল।

মোম্বাসার একটি ছোট হাসপাতালে চোখ মেললাম! জাহাজের স্টুয়ার্ড বা অন্য কেউ আমার আশে-পাশে ছিল না, একজন নার্স আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। নার্সটি নিগ্রো। সে বললে, (কথাবার্তা অবশ্য হয়েছিল ইংরেজীতেই) কেমন বোধ করছেন ?

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, আমি কোথায় ?

—হাসপাতালে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর একটু দম নিয়ে বললাম, আমার বুকে প্লাস্টার, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—পাঁজরার হাড় ভেঙে গিয়েছিল, না ?

নার্সটি তরুণী, বললে, সেট করে দেওয়া হয়েছে। একুশ দিন হাসপাতালে থাকলেই মোটামুটি সেরে উঠবেন।

—আমার জাহাজ কোথায় জানো ?

নার্স বললে, পোর্টে। মেরামত হচ্ছে।

আর কোনো কথা হয়নি তখন। নার্সটি আমাকে একটা ওষুধ খাইয়ে চলে গেল। শুনলাম 'ভিজিটিং আওয়াস'' হচ্ছে বিকেলে। সাগ্রহে সেই বৈকালিক অবকাশটুকুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু কেউ এলো না আমাকে দেখতে। পরদিন ? না, কেউ না। তারপর দিন ? কেউ না। শুয়ে শুয়ে বারবার মায়ের মুখখানা মনে পড়ছিল। সেই বোম্বে থেকে চিঠি দিয়েছিলাম, মাগো, বোম্বে এসেছি, এখান থেকে গোয়া যাবো। বুঝলে না ? এভাবে না ঘুরলে লেখার উপকরণ সংগ্রহ করবো কেমন করে ? এর উত্তর আশা করি নি, কারণ মাকে ঠিকানাই দেই নি, মা চিঠি দেবে কী করে ? মাকে যদি জাহাজের কথা জানাতাম, তাহলে ঠিক জানাজানি হতো, মা-ও কান্নাকাটি করতো, কারণ, তখনকার দিনে জাহাজে যাওয়া মানে নানান বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া,—এই-ই ছিল সাধারণ মায়েদের ধারণা। অন্তত আমার মায়ের তো বটেই। আগে আগে বিশাখাপত্তন থেকে চিঠিতে যখন লিখতাম, সমুদ্রে স্নান করছি, তখন উত্তরে মায়ের আশঙ্কা প্রকাশ পেতো,—খুব সাবধান। ঢেউয়ে না ভাসিয়ে নিয়ে যায়, পাঁড়ার বিন্দুদিদির ভাসুরের ছেলেকে পুরীতে অমনি করে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, ভাগ্যিস একটি নুলিয়া ধরে ফেলেছিল, তাই রক্ষে ! তোমার বাপু ও-সব চান-টান না করাই ভালো। মা তখনো আমার কর্মক্ষেত্র বিশাখাপত্তন বা ভাইজাগে আসে নি। সমুদ্রের ধারে বাসা, এটা শুনেই মার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। এ-অবস্থায় যদি চিঠি দেই যে, আমি মোম্বাসার হাসপাতালে শুয়ে আছি বুকের পাঁজরা ভেঙে তাহলে মা হয়ত নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেবে, আর ছুটবে আমার হেড-অফিসে। আমার কর্তারা সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই। ব্যস—তাহলে আর রক্ষে নেই—ঢাকে একেবারে কাঠি পড়বে !

অথচ মন তো চায়, অন্য সব রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের মতো আমাকেও কেউ দেখতে আসুক। কিন্তু বৃথাই তৃষ্ণার্ত চোখ মেলে দরজার দিকে তাকানো, —কেউ আসে না। এলো সেদিন সেই নার্সটি। বসলো আমার পাশে, টুলটা টেনে নিয়ে। বললো,—বানা, (ওদের ভাষায় সম্মানসূচক 'বাবু' বা 'মশাই'কে 'বানা' বলে) দেশে চিঠি লিখবেন ?

—কে লিখে দেবে ?

—আমি লিখছি। আপনি বলুন আমি টুকে নিচ্ছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—না।

নার্সটি আমার কপালে তার হাতখানা রাখলো। ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, আপনি তো ইণ্ডিয়ান ?

হ্যাঁ।

কোথাকার লোক আপনি? বম্বে না, ক্যালকাটা?

—কলকাতা।

মেয়েটি কালো, কিন্তু মুখখানিতে অদ্ভুত কোমলতা মেশানো। যেন আমার কত দিনের আত্মীয় এমনি অন্তরঙ্গতার সুরে বললো—আমারও তাই মনে হয়েছিল। তোমার খুব একা একা লাগে না?

আমার চোখ দুটো ছল ছল করে এলো ওর কথা শুনে। কোনক্রমে বললাম, না। ঠিক আছে।

বলতে বলতে মুখখানা পাশের দিকে ফিরিয়েছিলাম। ও আমার চিবুকের কাছটা ধরে মুখখানা ওর দিকে ফেরালো, বললে, আমি একজনকে পাঠিয়ে দিতে পারি। ভাব করবে?

কে?

ও একটু হাসলো, তোমার কথা সে শুনেছে। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

কে সে? অন্য কোনো নার্স?

ও বললে, না। হাসপাতালের সে কেউ নয়।

—তবে?

নার্সটি বললে,—কাল ভিজিটিং আওয়ার্সে তাকে নিয়ে আসবো।

বলা বাহুল্য, পরদিনও জাহাজের কেউ এলো না আমাকে দেখতে। হাসপাতালের সাধারণ বেডে এভাবে শুয়ে থাকা যে কী মর্মান্তিক, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে পারবে বলে মনে হয় না। আফ্রিকা কেমন দেশ জানা হলো না, জানা হলো না কেমন শহর—মোম্বাসা। অন্য অন্য রোগীরা (সবাই নিগ্রো) বিদেশী বলেই বোধ হয় কাছে আসতে চায় না। দ্বিতীয়ত ভাষাও অন্তরায়। ডাক্তার-নার্সরাই বা সময় কোথায় পাবেন আমার সঙ্গে গল্প করার? তারই মধ্যে সময় করে ঐ তরুণী নার্সটি যতটা সম্ভব আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে যায়। আমার কাছে কেউ আসে না বলেই বোধ হয় একটু বাড়তি স্নেহযত্ন সে করে আমাকে। কিন্তু তারই বা অবসর কোথায়?

সেদিন বিকেলে অবশ্য চারটে বাজামাত্রই তরুণী নার্সটি এলো আমার কাছে অপর একটি তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে। গাউন পরা, আমাদের কলকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মতো চেহারা। গায়ের রঙ কালো, কিন্তু আমাদের থেকে তেমন বেশি কালো নয়। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত, একটু কোঁকড়ানো। আফ্রিকাবাসিনী হলেও সাধারণ নিগ্রো-চেহারার থেকে কিছুটা তফাত আছে। দৈহিক গঠনে তম্বী, তরুণী। হাতে একটি কাগজের প্যাকেটে কিছু ফল। নার্সটি আলাপ করিয়ে দিলো,—আমার বান্ধবী। যার কথা তোমাকে বলেছিলাম, সেই তিনি। মিস্ তামা।

নার্সটি চলে যাবার আগে টুল টেনে এনে ওকে আমার কাছে বসিয়ে দিয়ে

গেল। মেয়েটি সপ্রতিভ, ফলগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন —খান।

আমি সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা একটি মানুষ, আমাকে যে এভাবে কেউ দেখতে আসতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। চোখের পাতা ভিজে উঠলো, মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করতে লাগলাম। উনি তা লক্ষ্য করলেন কিনা জানি না, উনি বলতে লাগলেন (ওর ভাষা ছিল ইংরেজী), —আপনার কথা আমার বান্ধবীর কাছ থেকেই শুনেছিলাম। কী আশ্চর্য ! আপনার সঙ্গে আপনার জাহাজের কেউ দেখা করতে আসে না !

কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম,—জাহাজীদের রকমই এই। যতক্ষণ জাহাজে আছি, ততক্ষণই তাদের মানুষ। বন্ধুত্বের অবধি নেই, কিন্তু চোখের বাইরে গেলেই কেউ কারুর নয় !

মেয়েটির মুখে অদ্ভুত একটা কোমল ভাব ফুটে উঠলো, আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, খুব কষ্ট হচ্ছিল তো একা একা ?

আমি মেয়েটির দিকে এবার সোজাসুজি তাকালাম। বললাম—মিস তামা, আপনারা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। আমাকে দেখেন নি কোন-দিনও—জানা নেই শোনা নেই—দেখা নেই—দেখা করতে এলেন কীভাবে ?

অল্প একটু হাসলেন মিস তামা, বললেন—আমার প্রফেশন কী জানেন ? নিঃসঙ্গকে সঙ্গ দান করা।

অবাক হয়ে বললাম—মানে ?

কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললেন, রোজ বিকেলে চারটে নাগাদ আমি বেরিয়ে পড়ি। ফিরতে রাত দশটা। মোম্বাসা টাউনটা আপনি দেখেননি বোধহয় ?

(কথাবার্তা সবই যে ইংরেজীতে। সুতরাং তুমি আপনির ব্যঞ্জনা এ-ভাষায় পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বলার ধরনে লক্ষ্য করছিলাম, এমন একটা সম্ভ্রমের সঙ্গে উনি কথা বলছিলেন, যাতে আপনি ভাবটি এসে পড়া স্বাভাবিক। তারই সূত্র ধরে আমি এখন আপনি'র প্রয়োগ করে চলেছি।) ওঁর কথার উত্তরে বললাম, না।

উনি বললেন,—শহরের কেন্দ্রে কতগুলি নামকরা হোটেল আর রেস্তোরাঁ আছে। একটি হোটেলের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট। অনেক অতিথিই আসেন নিঃসঙ্গ। তাঁদের সঙ্গদান অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে গল্প গুজব করাই আমার উপজীবিকা। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আপনাকে সঙ্গদান করে আমি আমার ডিউটিই করছি।

খুব অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সেই দৃষ্টিতে উনি বোধহয় একটু বিব্রতই বোধ করতে লাগলেন। চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য নত করে নিজের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ তুললেন, বললেন,—অত অবাক হচ্ছেন কেন ? জাহাজে জাহাজে ঘুরছেন, এসব কথা শোনেন নি কখনো ?

মেয়েটি আমার চোখের দিকে তাকালেন, কোমল কণ্ঠে বললেন,—কে কে আছেন দেশে ?

মা-বাবা—ভাই-বোন।

বিয়ে করেন নি?

উত্তর দিলাম,—না।

মেয়েটি মুখ টিপে একটু হেসে বললেন, দেশে এমন কোন মেয়ে নেই, যাকে আপনি ভালবাসেন—এমন কেউ নেই যার স্মৃতি—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, না মিস তামা···না।

উনি বললেন, বিয়ে করবেন না দেশে ফিরে?

বললাম, জানি না, বাপ-মা হয়ত—

এবার স্পষ্টতই একটু হেসে উঠলেন, বললেন, বাপ-মা দেখে শুনে কনে ঠিক করে দেন আপনাদের, তাই না?

হ্যাঁ।

উনি বললেন, আমাদেরও তাই ছিল। এখন আমরা বড্ড ওয়েস্টার্ণইজড হয়ে গেছি। আমি কিন্তু খৃষ্টান, আপনি নিশ্চয় হিন্দু?

হ্যাঁ।

বললেন, ঐ যাঃ! ফলগুলো রয়েই গেল। খাবেন না?

বললাম, নিশ্চয়ই খাবো, আপনি নিজে এনেছেন হাতে করে! কিন্তু এখন নয়, পরে। নার্স দেবে'খন। ও খুব যত্ন করে আমায়।

বললেন, হ্যাঁ, ও বড়ো ভালো মেয়ে।

উনি চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে। আমি বলে উঠলাম, মিস্ তামা?

হ্যাঁ?

বললাম, এই যে নিঃসঙ্গকে সঙ্গ দান করেন, এর জন্য ফি নেন তো? না, হোটেল থেকে—

উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না মশাই, হোটেলকেই উলটে কমিশন দিতে হয়। আমার উপার্জন ঐ অতিথিদের কাছ থেকেই।

বললাম, আচ্ছা, একটা কথা বলবো? মনে কিছু করবেন না?

মিস তামা মাথাটা একটু দুলিয়ে বলে উঠলেন, না না, বলুন না আপনি?

বললাম, আমার টাকাকড়ি সব জাহাজে। আপনি আমাকে সঙ্গ দান করছেন—

বাধা দিয়ে তামা বলে উঠলেন, বেশ তো ভালো হয়ে উঠে পরে দেবেন।

ওর আন্তরিক আলাপনের স্পর্শে ক্রমশ আমি সহজ হয়ে এলাম। সত্যি বলতে কী, কোনো একজনের সঙ্গ আমার সত্যিই কাম্য ছিল সেই সময়।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হতেই উনি বিদায় নিলেন। যাবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, আসি?

সাগ্রহে বলে উঠলাম, কাল আসছেন তো?

মুখ টিপে হেসে বললেন, আমার সঙ্গ ক্লান্তিকর লাগলো না তো?

মোটেই না।

উনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন, বললেন, আসবো।

এবং সত্যি, পরদিনও এলেন। হাতে এক বাক্স ভালো খেজুর। বললাম, এসব আনেন কেন বলুন তো?

তামা হেসে বললেন, বেশ তো, পরে দাম দেবেন।

সেদিন কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন, বললেন না তো?

তামার মুখখানা একটু ম্লান দেখালো। বললেন, আমার বাবা নেই, ভাই-বোন সব আছে দেশে। এখান থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে। এখানে আমি একাই থাকি।

বিয়ে-থা করেন নি কেন?

অল্প একটু হেসে বললেন, হয়ত পরে করবো। এখন সম্ভব নয়।

কেন?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল মুখখানা। তারপরে একটু ইতস্তত করবার পর বললেন, মিঃ ব্যানার্জী, আপনাকে আমি বলবো, কিন্তু এখন নয়, পরে! ভালো হয়ে উঠুন, তারপরে।

আমি ও'র হাতের ওপর হাতখানা রেখে বলে উঠলাম, কেন, এখন বলতে দোষ কী?

দোষ কিছু নেই, তামা বললেন, তবে সব দিকে চোখ রেখেই গোপন কথা বলা উচিত। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু হাসপাতালের মতো পাবলিক প্লেসে এ প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। অন্য কেউ শুনলে বিপদ হতে পারে।

আমার কৌতুহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু বারবার মিনতি করা সত্ত্বেও উনি সেদিন বলেন নি। যে একুশ দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম, তামা প্রতিদিন এসেছেন, হাসি-ঠাট্টা-গল্প-গুজব করেছেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ও প্রসঙ্গ তোলেন নি বা আমাকেও তুলতে দেন নি।

যেদিন ছুটি পাবো, তার আগের দিন সেই নার্সটি এসে বললে, তোমার জাহাজে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লোক মারফৎ। কাল বেলা দশটায় তোমাকে এসে নিয়ে যাবে।

বিকেলে তামা এলে বললাম আমার ছুটির কথা। বললাম, দেখা হবে কী করে?

একটা কার্ড তাঁর ছোট্ট ব্যাগটা থেকে বার করে আমার হাতে দিলেন, তাতে একটি হোটেলের নাম লেখা ছিল। বললাম, ওখানে গেলে দেখা হবে তো?

তামার উত্তর: নিশ্চয়।

বললাম, অনেক টাকা পাবেন আপনি আমার কাছ থেকে। এবার সব দিয়ে দেবো।

ওর সংক্ষিপ্ত উত্তর, বেশ। দেবেন।

পরদিন সকাল দশটায় চীফ অফিসার স্বয়ং এসেছিলেন আমাকে নিতে। অভিমান করে বললাম, এই একুশ দিনের মধ্যে আপনারা কেউ আমাকে একবার দেখতে এলেন না ?

চীফ উত্তর দিলেন,—কে আসবে ? জাহাজ মেরামত করা হচ্ছে। ড্রাই-ডকিং হচ্ছে, পেণ্টিং হচ্ছে। যে যার কাজে ব্যস্ত। আট ঘণ্টার জায়গায় বারো ঘণ্টার ডিউটি সবার। তারপরে আর বাইরে বেরুনোর সামর্থ্য থাকে !

বললাম, জাহাজ ছাড়তে আর কতদিন ?

চীফ বললেন, সপ্তাহ খানেক। তার বেশি দেরি হবে না। কাল 'ড্রাই-ডক' থেকে জাহাজ বেরুবে।

—মোম্বাসায় ড্রাই-ডক আছে ?

চীফ বললেন, নিশ্চয়। মোম্বাসা ছোট পোর্ট নয়। ভাবো কী ? বেশ বড় শহর এই মোম্বাসা। পূর্ব আফ্রিকার এই কেনিয়া দেশের সব থেকে বড়ো এবং খ্যাতনামা শহর নাইরোবি, তারপরেই এই মোম্বাসা।

আরব আর পারস্য দেশের লোক এককালে এখানে বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। এখন এই বন্দর ইয়োরোপীয়ানদের হাতে প'ড়ে একটা আধুনিক বন্দর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও ভীষণ গরম এখানে, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কেনিয়ার পর্বতের দিকে তাকিয়ো, সারা আফ্রিকার মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী, 'সতেরো হাজার চল্লিশ ফিট'। চূড়োগুলি বরফে ঢাকা। বললাম,—আপনি তো অনেক খবর রাখেন !

চীফ বললেন,—ওটা আমার স্বভাব, যেখানে যাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানবার চেষ্টা করি। যদি নাইরোবিতে যেতে পারতাম, তাহলে একটা দারুণ সফর করা যেতো। ওখানকার ন্যাশনাল পার্কে গিয়ে জন্তুজানোয়ার দেখা একটা বিরাট অভিজ্ঞতা।

—আর জাঞ্জিবার ?

চীফ বললেন,—হ্যাঁ, জাঞ্জিবারও দেখবার মতো। ওটা একটা দ্বীপ। ওখানকার লবঙ্গ বিখ্যাত। লোকে বলে, হাওয়া বইতে থাকলে, এক মাইল দূরে দিয়ে জাহাজ যখন যায়, তখনও লবঙ্গের গন্ধ পাওয়া যায়।

বললাম,—বাঃ ! পরে কিন্তু আরও শুনবো আপনার কাছ থেকে। জাহাজের আর সবাই কেমন আছে তাই বলুন। স্টুয়ার্ড কেমন আছে ?

চীফ বললেন,—শোনো নি ? ওকেও হাসপাতালে পাঠাবার কথা হয়েছিল। বাইরে জীপে করে বেড়াতে গিয়েছিল, কী ভাবে যেন 'জিট্সি ফ্লাই' কামড়ে দেয় ওকে। প্রবল জ্বর। বেশ ভুগলো বেচারী।

—'জিট্সি ফ্লাই' কী ?

চীফ বললেন,—মোম্বাসায় এসেছো, 'জিট্সি ফ্লাই'-এর নাম শোনো নি ? বিষাক্ত মাছি। কামড়ালেই হলো আর কী ! তবে হ্যাঁ, টাউনে নেই, আছে জঙ্গলের দিকে। তুমি যেন তালে পড়ে বেড়াতে যেয়ো না।

বললাম,—ওরে বাবা! এই শরীর নিয়ে বেড়াবো কোথায়?

চীফ বললেন,—বাজে বকোনা! দিব্যি নাদুস-নুদুস চেহারাটি হয়েছে! অসুখ আর তোমার কোথায়?

জাহাজে ফিরে এসব গল্পই হতে লাগলো। ক্যাপ্টেন এ আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন, কেনিয়ার পাশের রাজ্যই হচ্ছে ট্যাঙ্গানাইকা, স্থানীয় লোকেরা বলে, তানজানিয়া। বেড়াবার সুযোগ পেলে আমি প্রথমেই মোটর নিয়ে ঐ রাজ্যে চলে যেতাম। দেখে আসতাম আফ্রিকার সব থেকে উঁচু পাহাড়—কিলিম্যানজারো, উনিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি ফিট। কী হে চীফ, ঠিক বলেছি না?

চীফ অফিসার বললেন, বিলকুল ঠিক। কিন্তু আমি টাঙ্গানাইকায় বেড়াতে হলে 'দার-এস-সালাম'-এ চলে যেতাম, তারপর সেখান থেকে রেলে চড়ে একেবারে টাঙ্গানাইকা হ্রদ! সে নাকি দারুণ দৃশ্য!

ক্যাপ্টেন বললেন, তাহলে নাইরোবি হয়ে উগান্ডা রাজ্যে পেঁছিতে পারলে আরও মজা হতো। ভিক্টোরিয়া হ্রদ আর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের নাম কী নতুন করে তোমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে?

এই রকম গল্প খুব চলতে লাগলো। সেদিন কেন, তার পরদিনও বেরুনো হয়নি, জাহাজ ড্রাই ডক ছেড়ে জেটিতে এসে লাগলো। মোম্বাসা বোম্বাইয়ের তুলনায় বড়ো বন্দর নয়, তবে বোম্বাইয়ের মতো এটিকেও অনেকটা দ্বীপ বলে ধরা যেতে পারে। পোর্টের কাছেই শহরের ফ্যাশানেবল পাড়া, অর্থাৎ কলকাতার চৌরঙ্গী আর কী! শুধু তা-ই নয়, একটা জায়গা দেখতে অবিকল আমাদের সেই ছেলেবেলায় দেখা পুরানো এসপ্ল্যানেডের মতো। তেমনি ঝাঁকড়া-মাথা গাছ, আর তার তলা দিয়ে ঘুরছে ট্রামগুলো।

সঙ্গে ছিল এই জাহাজের আর এক অফিসার সাহানী। একটি হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছি, ও বললে, ওখানে ঢুকতে দেবে না, 'ইউরোপীয়ানদের জন্য' লেখা রয়েছে দেখছো না?

আমি বলছি ১৯৪৮ সালের গোড়ার কথা, তখনো আফ্রিকার জাগরণ শুরু হয় নি। ইয়োরোপীয়ানদের হাতে তখন সমস্ত ভালো ভালো জমি, সেই জমি ছিনিয়ে নেবার জন্য কোথাও কোথাও গোপন সংস্থা গড়ে উঠলেও ১৯৫০-এর আগে সেই বিদ্রোহ, যাকে 'মাউ মাউ বিদ্রোহ' বলা হতো, তা আত্মপ্রকাশ করেনি।

যাই হোক, সাহানীর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কার্ডটা বার করে হোটেলের নামটা পড়ে নিয়ে ওকে বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, চেনো?

—নিশ্চয়—সাহানী বললে, ওখানেই তো যাচ্ছিলাম। জানো, একজন বন্ধু পেয়েছি ওখানে।

ঠাট্টা করে বললাম,—বন্ধু না, বান্ধবী?

ও বললে, অবশ্যই বান্ধবী। এসো।

কাছেই একটা ছোট রাস্তার ওপরে, একদিকে বার—অন্যদিকে ছোট ছোট টেবিল পাতা। তারই একটির দিকে এগিয়ে গেল সাহানী। কার উদ্দেশে যেন বলে উঠলো, হ্যালো!

এগিয়ে গিয়ে দেখি, আর কেউ নয়, সেই তিনি—মিস তামা। একটা গাঢ় নীল সিল্কের গাউন পরে বসে আছেন একটি খালি টেবিলের প্রান্তে। পূর্ব-ব্যবস্থা মতো এটা নাকি আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখে গিয়েছিল সাহানী।

তামা হাসি মুখে ওকে স্বাগত জানালেন। সাহানী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে যখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, তখন তামা চোখের ইশারায় আমাকে জানালেন, খবরদার, চেনা দিয়ো না।

আমিও তাই নব পরিচিতের মতো ওঁর সঙ্গে করমর্দন করে একটা চেয়ারে বসলাম। যখন গিয়েছিলাম, তখন সন্ধ্যা হয়েছে সবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা বসে বসে খাবার খেলাম আর গল্প করতে লাগলাম। বলা বাহুল্য, ওরা দুজন কাছাকাছি চেয়ার টেনে একটু ঘনিষ্ঠ হয়েই আলাপ-আলোচনা করছিল। ঘণ্টাখানেক সময় পার হয়ে যেতেই ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন তামা, বললেন,—এক্সকিউজ মি, মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। মিঃ ব্যানার্জী, দয়া করে একবার আসুন না আমার সঙ্গে?

সাহানী অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে, তুমি ওকে চেনো?

তামা বললেন,—না। এই চিনলাম। উনি কলকাতার লোক, সেই হিসাবেই ওকে আমার একটু দরকার আছে। তুমি বসে থাকো, আমি এখুনি আসছি। চুক্তি অনুযায়ী, রাত দশটা পর্যন্ত তোমাকে সঙ্গ দান করতে আমি বাধ্য। আসুন মিঃ ব্যানার্জী।

বলে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে হন হন করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন। হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন, তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন,—উঠে আসুন। এক জায়গায় যেতে হবে। কাছেই।

যন্ত্রচালিতের মতো আমি গাড়িতে উঠে বসামাত্রই উনি চট্ করে এসে আমার পাশে বসলেন। ড্রাইভারকে স্থানীয় ভাষায় কিছু নির্দেশ দিয়ে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—সাহানীর সঙ্গে দিন তিনেক হলো আমার আলাপ হয়েছে। ও-ও ভারতীয়, তবে আপনি কলকাতার লোক, আপনার সঙ্গেই আমার দরকারটা বেশি।

বললাম,—দেখুন মিস তামা, আজ কিন্তু আমি এসেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। সাহানীর সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় না থাকলেও আমি আপনার হোটেলে গিয়ে আপনাকে খুঁজে বার করতাম। আমি কিছু টাকা সঙ্গে করে এনেছি। আপনার বিল্‌টা আমি শোধ করতে চাই।

তামা অল্প একটু হেসে বললেন,—বেশ তো, শোধ করবেন।

কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আমার ডেরায়।

বলে, সামনে তাকিয়ে ড্রাইভারকে আবার কী যেন বললেন। ট্যাকসি চলতে চলতে বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমাদের কলকাতার তালতলা অঞ্চলের মতো দেখতে জায়গাটা। উনি বললেন, আমার একজন বয়ফ্রেন্ড আছে, জানেন? অবশ্য, বয়সে একটু প্রবীণ। আমি তারই সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো বলে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেও আপনার মতো এশিয়ান।

এশিয়ান!

তামা বললেন, হ্যাঁ। মিঃ বানার্জী, সমস্ত জিনিসটা আপনি কিন্তু খুব গোপনে রাখবেন। এখানে অনেক ইণ্ডিয়ান আছেন, কিন্তু তাদের ওপর ভরসা করতে পারি নি। সাহানী ইণ্ডিয়ান, হয়ত আমাদের সাহায্যে আসতে পারতো, কিন্তু আপনি কলকাতার লোক, আপনি উপকার করতে পারবেন সব থেকে বেশি।

ততক্ষণে ট্যাকসিটা একটি উপ গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মিস তামা সোজা হয়ে বসে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর নির্দেশ মতো একটা জায়গায় ট্যাকসিটা থেমে গেল। তামা বললেন, এসে গেছি মিঃ ব্যানার্জী, নামুন।

আমাদের দেশের বস্তির মতোই মাটির দেওয়ালওয়ালা বস্তি। তবে দেওয়ালগুলো খুব মোটা আর আমাদের থেকে উঁচু। মাথার টালির ধরনও অন্য রকম। সুসজ্জিত মোম্বাসা শহরের মধ্যে যে এ রকম গলি আর এ রকম বাড়ি থাকতে পারে, তা ভাবা যায় না। যদিও আমি কলকাতার লোক বলে আমার চোখ এতে অভ্যস্ত।

গাড়ি থেকে নামামাত্র আমি বললাম, কতো দিতে হবে ট্যাকসিকে? আমি দেবো।

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন তামা, না, আমি এখুনি ফিরে যাবো, ট্যাকসিটা দাঁড়িয়ে থাকবে।

অবাক হয়ে বললাম, তারপর? আমি ফিরবো কী করে?

মিস তামা হেসে আমার হাত ধরলেন। নিয়ে গেলেন একেবারে ভিতরকার একটি ঘরে। ছোট একটি কেরোসিন তেলের টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় বই পড়ছিল একটি মানুষ একটি খাটিয়ার ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে। তার পাশে একটা বেতের ইজিচেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিলেন তামা। ততক্ষণে আমার পরিচয় পর্ব সমাধা করে দিয়েছেন তিনি। আমি মানুষটির দিকে তাকালাম। অতি শীর্ণকায় একটি মানুষ, মাথার চুলগুলি খুব ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রং ফরসাই, কিন্তু দেখাচ্ছে খুব পাণ্ডুর। চোখ দুটি উজ্জ্বল, কিন্তু কোটরগত। আমাকে দেখেই স্মিত হাসিতে মুখ তাঁর ভরে উঠেছিল। বললেন, আমার নাম হিদে, আমি জাপানীজ।

মিস তামা স্থানীয় ভাষায় ও'কে কী যেন বললেন, উনিও উত্তর দিলেন সেই দুর্বোধ্য ভাষায়। তামা তারপরে ঝুঁকে আমার হাতের ওপর একখানা হাত রেখে বলে উঠলেন, আমি চললাম। সাহানী ওদিকে বসে আছে। আপনার যাবার ব্যবস্থা হিদে করে দেবেখ'ন।

আপনার টাকা ?

আমার হাতের ওপর মৃদু একটু চাপড় দিয়ে মিস তামা বললেন, পরে দেবেন।

বলে আর দাঁড়ালেন না, দ্রুত চলে গেলেন বাইরে।

একটু পরেই আমি ট্যাকসিতে স্টার্ট দেবার শব্দ শুনলাম। মিঃ হিদে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। আমি মুখ ফিরিয়ে ও'র দিকে তাকাতেই বললেন, শুয়ে আছি বলে মাপ করবেন। আমার বাঁ পা-টা সম্পূর্ণ অকেজো। বাঁ হাতটা অবশ্য এখনো পড়ে যায়নি, অল্প অল্প নাড়তে পারি।

বললাম, দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে বড়ো অদ্ভুত লাগছে।

মিঃ হিদে বললেন, ব্যাপারটা অদ্ভুতই মিঃ ব্যানার্জী। আফ্রিকায় এসেছিলাম সাত বছর আগে। তখন শরীরে ছিল যুবকের মতো অদম্য শক্তি, কিন্তু সেই শরীরই গেছে ভেঙে। জঙ্গলে সিংহের মুখ থেকে বেঁচেছি, শত্রুর বর্শার খোঁচা খেয়ে মরি নি, শেষ পর্যন্ত কাবু করলো জিটসি মাছিতে। ভুগে ভুগে শরীরের এই অবস্থা!

বললাম, কিন্তু আমি আপনার কী করতে পারি, মিঃ হিদে ?

মিঃ হিদে শরীরটাকে টেনে টেনে দেওয়ালের ওপর পিঠ রেখে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলেন। বাঁ পা-টার ওপর থেকে আবরণ একটু সরে গেল। ফরসা মানুষ, কিন্তু পা খানি একেবারে নিকষ কালো। একটা ডোরা কাটা পায়জামা পরণে, পায়ের যতদূর দেখা যায়, ততটুকু দেখে আমি বিস্ময়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলাম। সরু একটা কাঠির মতো পা।

বললেন, আপনি আমার অশেষ উপকার করতে পারেন মিঃ ব্যানার্জী।

আমি কথাটা বুঝতে পারছিলাম না। হিদে আমার দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপরে বললেন, আফ্রিকায় এসেছিলাম উনিশশো এক চল্লিশ সালের এপ্রিল মাসের তেরো তারিখে। তারিখটা আমি কখনো ভুলবো না। তখন যুদ্ধের সময়। না মিঃ ব্যানার্জী, তখনকার জাপানী সরকারের গুপ্তচর হয়ে আমি আসি নি, আমি এসেছিলাম অন্য একটা কাজ হাতে নিয়ে। আমার পাসপোর্ট ছিল না, কিছু ছিল না, ভাবতে পারেন বৃটিশ-আমেরিকা, এক কথায় মিত্র শক্তির সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে কীভাবে আমি জীবন কাটিয়েছি! একবার পুলিশ আমাকে ধরে জেলেও পুরেছিল। কিন্তু রাখতে পারে নি, আমি পালিয়েছিলাম। প্যাটরিস লুমুম্বার নাম শুনেছেন ? শোনার অবশ্য কথা নয় আপনার পক্ষে। কঙ্গোর ষ্টানলিভাইলে, যাকে স্থানীয়রা বলে, কিষাণ গাণি, আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি রাজনৈতিক কর্মী, একনিষ্ঠ কর্মী, রীতিমতো শিক্ষিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষটি কালে কালে একজন যথার্থ নেতা হয়ে দাঁড়াবেন। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম।

বছর দুই হলো, আমি তামার আশ্রয়ে আছি। তামা না থাকলে আমি বেঘোরে প্রাণ দিতাম। মেয়েটা আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে মোম্বাসা শহরে পড়ে আছে আমাকে নিয়ে। শহরের কাছেই একটা গ্রামের স্কুলে ও মাস্টারির চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু সে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করতে পারলেন না।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, তাহলে তো উনি নিশ্চয় শিক্ষিতা !

হিদে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, আণ্ডার গ্রাজুয়েট। একজন সাধারণ আফ্রিকান মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষিত বলতে হবে। আমি ওর ইতিহাস জানি। লেখাপড়া শেখবার জন্য কী কষ্টই না করেছে। গেছে নাইরোবিতে পড়ার সুবিধা হবে বলে। সেখান থেকে উগাণ্ডার মধ্য দিয়ে কঙ্গো পর্যন্ত চলে গিয়েছিল স্কুলের পড়া শেষ করবার পর। কঙ্গোর ষ্টানলিভাইল, যাকে দেশীয়রা বলে, কিষাণ গাণি, সেখানেও কিছুদিন থেকে পড়া-শোনা করে। সেখানে বসেই পেয়েছিল কঙ্গোর বন্দর মাটাডির ডক-শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের খবর। আর সেখানেই আসে লুমুম্বার সংশ্রবে। আলাপের কাল সংক্ষিপ্ত, কারণ ওকে ফিরে আসতে হয়েছিল কেনিয়ায়। অবশ্য লুমুম্বাও চলে আসেন। পরে কিনশাশা অর্থাৎ লিও-পোল্ডভাইলে। তিনিও পড়ছিলেন ওখানে খবর পেয়েছি। কিন্তু যা বলছিলাম, মিস তামা নিজের রাজ্য কেনিয়া, উগাণ্ডা, কঙ্গো, এমন কি ঘানার খবরা-খবর পর্যন্ত রাখতো। ভিতরে ছিল দেশ-প্রেম আর উদ্দীপনা। অথচ দেখুন শুধু আমার জন্য ওর সবকিছু—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করতে পারলেন না, চোখ দুটো জলে ভরে এলো নিজেকে কোনক্রমে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু যাক সে সব কথা। আমি টোকিও ফিরে যেতে চাই। কতো বছর আমি দেশছাড়া ভাবুন তো ? আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?

—কি ভাবে ?

বললেন, যদিও আমি শুনেছি আপনি পুরোপুরি সুস্থ নন, তবু বলছি, আপনার জাহাজ ছাড়ছে দিন কয়েকের মধ্যেই। যদি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন ! আমার পাসপোর্ট নেই, লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রস্তাবটা শুনে শিউরে উঠলাম। জাহাজের আমি সামান্য কেরানী, তাও অস্থায়ী। এ কঠিন কাজের জন্য উনি আমাকেই বা কেন বেছে নিলেন ?

বললাম,—আমাদের জাহাজ যাচ্ছে বোম্বে।

উনি সাগ্রহে বললেন,—বোম্বেতে পৌঁছে দিলেই হবে। সেখান থেকে কলকাতা যাবো ট্রেনে। কলকাতায় পৌঁছতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন ওখানে, তাঁরা আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। কলকাতা থেকে প্লেনে আমি ঠিক টোকিও পৌঁছে যাবো।

বললাম,—কিন্তু জাহাজে বোম্বেই বা কী করে নিয়ে যাই আপনাকে ! আপনি এখানকার রাজদূতের অফিসে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—সে চেষ্টা তামা যে না করেছে এমন নয়, কিন্তু সম্ভব হয়নি। সে-সব রাজনৈতিক জটিলতার কথা না আলোচনা করাই ভালো। আপনাকে তো আগেই বলেছি, জাপানের ইমপীরিয়াল সরকারের গুপ্তচর হয়ে আমি আসি নি। রাজনৈতিক কারণেই এসেছিলাম, কিন্তু সরকারী কাজ নিয়ে নয়।

বললাম,—মিঃ হিদে, আপনার কথা আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

উনি বললেন,—মিঃ ব্যানার্জী, আপনি বাঙালী, সেইজন্যই আপনাকে ডেকে আনিয়েছি। আমার সব কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই সমবেদনা অনুভব করবেন। সেই ১৯৪১ সালে আমি আফ্রিকায় এসেছি কোনো এক বিশেষ 'মিশন' নিয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। যাঁরা আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, এশিয়ার সংহতি না গ'ড়ে উঠলে, এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মুক্তি না ঘটলে, সমগ্র প্রাচ্যদেশ স্বস্তি পাবে না, স্থায়ী শান্তিও অর্জন করতে পারবে না। মিঃ ব্যানার্জী, আপনি আপনাদের বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন! আমাকে পাঠাবার মূলে ঐ রাসবিহারী বোস। উনি আজ বেঁচে নেই, নইলে আমার মুক্তির জন্য তিনিই সর্বশক্তি প্রয়োগ করতেন।

মিঃ হিদে একটু থেমে আবার বললেন,—তাঁর কাজ আমি এখানে যথাসাধ্য করেছি। এখন আমার শরীর অপটু। আমার বুড়িমা আজও বেঁচে আছেন, আমি দেশে গিয়ে তারই কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই!

সত্যি কথা বলতে কী, ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কোনক্রমে বলেছিলাম,—আমি ক্ষুদ্র মানুষ, কিন্তু আমি যথাসাধ্য করবো আপনাকে আমার দেশে নিয়ে যেতে।

আর কোনো কথা হয় নি। মিঃ হিদে ওদেশীয় একটি ছেলেকে ডেকে ট্যাক্সি আনালেন, সেই ছেলেটিই ট্যাক্সি চালককে বলে দিলো আমার গন্তব্য স্থান—সেই হোটেলের নাম।

রাত দশটা বাজতে তখনো খানিকটা দেরি আছে, হোটেলে পেঁছে আমি সাহানী কিম্বা মিস তামা, কাউকেই দেখতে পেলাম না। সেই টেবিলটি ঘটনাচক্রে শূন্য ছিল, তারই একটি চেয়ারে বসলাম। একটি ওয়েটার দেখতে পেয়ে বললে,—এখানে বসবেন না। সংরক্ষিত আসন। মিঃ সাহানী অ্যাণ্ড পার্টি। দেখছেন না কার্ড রয়েছে?

বললাম, সেই পার্টিরই আমি একজন। সাহানী কোথায়?

ওয়েটার গলা নামিয়ে বললে, একটু বসুন, এখুনি আসছেন। কিছু খাবেন ততক্ষণ?

এক কাপ কফি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। একটু পরেই অবশ্য ওঁরা এলেন, হাসতে হাসতে, হাত ধরাধরি করে। একটু দূর থেকেই আমাকে দেখতে

পেয়েছিলেন তামা, হাসি থামিয়ে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ছুটে এলেন। ফিসফিস করে বললেন, সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ।

সাহানী এসে চোখ ছোট করে হাসতে হাসতে বললে,—কেমন এনজয় করলে? মিস তামা তোমাকে তার এক বান্ধবীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল শুনলাম। কেমন মেয়েটা?

সংক্ষেপে বললাম, ভালো। সাহানী, তুমি জাহাজে ফিরবে তো?

—নিশ্চয়ই।

—এখখুনি?

—হ্যাঁ।

উঠে দাঁড়ালাম,—সাহানী, তুমি তাহলে যাও, আমি মিস তামার সঙ্গে একটু কথা বলবো। আপত্তি আছে?

—আরে না-না!—সাহানী আনুষ্ঠানিকভাবে মিস তামাকে 'কাল দেখা হবে' বলে অভিবাদন জানিয়ে মুখে একটা শিস তুলে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাদের ছোট বয়সের সেই সেকেলে কার্জন পার্ক-এর মত একটা পার্ক ছিল কাছেই। সেইখানে নির্জনতা খুঁজে নিয়ে আমরা একটু বসলাম, বললাম,—মিঃ হিদের সব কথা আমি শুনেছি। আমি ক্যাপ্টেনকে গিয়ে আজই বলবো। ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করলে সবই পারেন। ওকে একটা হ্যাচের টুইন ডেকে লুকিয়ে রাখলে পুলিশ কিম্বা কাস্টমস কেউ টের পাবে না। মনে হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

মিস তামা সব ভুলে আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন, বললেন,—ওকে নিয়ে যাও—ও আর বাঁচবে না।

বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন মিস তামা।

বললাম, ওকে তুমি খুব ভালবাসো, না?

মুখ তুললেন তামা, বললেন—ও সব কথা থাক। তুমি পারবে তো?

বললাম,—চেষ্টা করবো। তোমার কথাও সব শুনেছি মিঃ হিদের কাছ থেকে। তুমি এক আশ্চর্য মেয়ে!

—না-না—ওসব কিছু নয়,—তামা বললেন, দেখলে না, সাহানী বেশি টাকা দেবে বলা মাত্রই ওকে নিয়ে হোটেলের ওপরকার একটা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম?

বললাম, মানুষকে সঙ্গ দেওয়াই তো তোমার উপজীবিকা।

তামা উত্তর দিলেন,—কিন্তু মাত্র সঙ্গই। আর কিছু নয়। আজ আমার প্রফেশনের বাইরে গেলাম আমি। কী করবো বলো, টাকার দরকার। ও চলে যাবে, ওর হাতে বেশ কিছু টাকা তুলে দেওয়া দরকার!

আমি মুখ নিচু করলাম। পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে বললাম,—আমার কাছেও তোমার কিছু টাকা পাওনা আছে।

তায়া ব্যাগশুদ্ধ আমার হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন,—না, আমার সব পাওনা শোধ হয়ে গেছে। তুমি ওকে শুধু সঙ্গে নিয়ে যাও, আর কিছু চাই না।

বলতে বলতে মুখখানা এক পাশে ফিরিয়ে উদগত অশ্রু রোধ করতে লাগলেন।

তার পর মুহূর্তেই আমরা উঠে পড়েছিলাম।

বলা বাহুল্য, ক্যাপ্টেন আমার প্রস্তাবে প্রথমটায় ক্ষেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব শুনেটুনে কী ভেবে যেন রাজী হয়ে গেলেন। যেভাবে আমি ও স্টুয়ার্ড সবার চোখে ধুলো দিয়ে মিঃ হিদেকে জাহাজে তুলে এনেছিলাম, লুকিয়ে রেখেছিলাম দু-নম্বর ফল্‌কার টুইন ডেকে (দোতলায়)—বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সের আড়ালে,—সে অন্য ইতিহাস, অন্য কাহিনী। শুধু এটুকু এখানে বলা প্রয়োজন, যে-সন্ধ্যায় মিঃ হিদেকে নিয়ে আমরা জাহাজে উঠেছিলাম, সেটিই ছিল মোম্বাসায় আমাদের জাহাজের শেষ সন্ধ্যা। আর, সেই শেষ সন্ধ্যাতেই সাহানী গেল সেই হোটেলে, রাত দশটা পর্যন্ত তার সেই বান্ধবীর সঙ্গে 'সুখে' কাটিয়ে আসতে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এসেছিল সাহানী, মনের মধ্যে অসীম বিরক্তি আর বিতৃষ্ণাকে বহন করে। বললে, জানো মিঃ ব্যানার্জী, সেই 'জঘন্য মেয়েমানুষ'টার দেখা আর পেলাম না। আমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করেও কোথায় কার সঙ্গে ভেগে প'ড়েছে কে জানে? ও-সব 'বাজারে' মেয়েছেলেদের 'কারবারই' আলাদা! ছ্যা-ছ্যা! আজকের সন্ধ্যাটাই মাটি!

কিন্তু আমার মন সেই 'জঘন্য মেয়েমানুষ'টির উদ্দেশেই বার বার প্রণাম জানাতে লাগলো।

॥ ১২ ॥

জাহাজটিকে বম্বেতে রেখে আমি ট্রেনে বিশাখাপত্তনে ফিরে এসে দেখি, ঘরে একেবারে নাটকীয় পরিস্থিতি। অফিসের দিক থেকে কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ আমাদের কোনো জাহাজ সেই সময় আসেনি। কিন্তু ছুটির নামে প্রায় দেড় মাস কাটিয়ে আসা,—এ কথা তো ভালো নয়। ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে তো? তারই ফলস্বরূপ ঘরে ঢুকতেই একেবারে মুখোমুখি মায়ের সঙ্গে দেখা। শুনলাম গত দশ দিন ধরে মা এসে এখানে রয়েছে, সঙ্গে ছোট ভাই, ইত্যাদি। হেড অফিসই তোড়জোড় করে মাকে পাঠিয়েছে। আমার উধাও হয়ে-যাওয়া নিয়ে আমার শত্রুপক্ষ গোপন চিঠিপত্র হেড-অফিসে কী প্রেরণ করেছে, তা জানি না, কিন্তু কিছু একটা যে তাঁরা ভেবে নিয়েছিল, এ বিষয়ে ভুল নেই। তারই প্রতিফলন ঘটলো মায়ের আচার-আচরণে। ছেলেকি কোনো মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়লো? এই দুশ্চিন্তারই অবশ্যম্ভাবী ফল

ফলতে দেরি হলো না। ১৯৪৮র জানুয়ারির শেষাশেষি ফিরে এসেছিলাম, আর ঐ সালের মে মাস পড়তে না পড়তেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার বিশাখাপত্তনের নীড় আর 'অবিবাহিতের গুহা' রইলো না। আমার কাজ-কারবার ঘোরাফেরা সবই বিশাখাপত্তন বন্দরকে ঘিরেই আবর্তিত হতে লাগলো।

বন্দর হিসাবে বিশাখাপত্তনেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সমুদ্রের জল 'ডলফিন নোজ' পাহাড়টির পাশ দিয়ে খানিকটা ঢুকে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁক নেবার পর জলধারা দুটি মূল শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। বাঁ-দিকের শাখাটি আবার খানিকটা এগিয়ে থেমে গেছে। আমি প'য়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগেকার কথা বলছি, জানি না সেই ধারাটি আরও সম্প্রসারিত হয়েছে কি না। আর, ডানদিকের শাখা, যেখানে জেটির ওপর দেশবিদেশের বাণিজ্যতরী এসে ভেড়ে, সেই শাখাটি কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি। জেটির পরপারের কয়লা-জেটি, তার পরে জলধারার ওপর একটি সেতু; সেতু পেরিয়ে জলধারা কিন্তু সংকীর্ণতর হয়ে আরও এগিয়ে গেছে। আমি যে মানুষটির কথা এবার বলবো, সে বলেছিল, এ কিন্তু সমুদ্রের 'ব্যাক-ওয়াটার' ঠিক নয়। অনেক আগে এখানে একটি নদী এসে এইভাবেই সাগরে মিশে যেতো। পরে বন্দর তৈরি হবার পর ড্রেজার দিয়ে মাটি কেটে নদীটাকে আরও চওড়া করে ফেলা হয়, গভীর করে ফেলা হয়। তারই ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত নীল জল ভিতরে ঢুকে নদীর সেই সুপেয় সুমিষ্ট জলকে তাড়িয়ে ঐ সেতুরও পরপার পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছে। সাধারণতঃ নদী সমুদ্রের পথরোধ করে রাখে মোহানার কাছে। নীল লবণাক্ত জলের সঙ্গে নদীর সুমিষ্ট সাদা জল একটু ঠেলাঠেলিতে পড়ে মোহানার কাছে অনেকটা স্থির হয়ে থাকে। অবশ্য জোয়ারের সময় আলাদা ব্যাপার।

সে বলেছিল, জায়গাটা চওড়া হয়ে যাওয়ায়, আর গভীর হয়ে পড়ায়, নদী আর সমুদ্রকে প্রতিরোধ করতে পারেনি, সমুদ্রকে ঐ সেতুর পরপার পর্যন্ত আসতে দিয়ে নিজে সরে গেছে আরও দূরে—ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—নদী যখন, তখন তার নাম একটা নিশ্চয়ই ছিল। কী বলো?

লোকটি উত্তর দিয়েছিল,—ছিল, নাম ছিল,—মেঘাদ্রী।

একটু চমকে উঠেছিলাম। কারণ, নবাগত জাহাজকে দুই হাতে ধরে নিয়ে আসার মতো করে বন্দরের ভিতরে আহ্বান করে আনলো যে দুটি ছোট ছোট 'টাগ' (স্টীম লঞ্চ), তার একটির নাম ছিল,—মেঘাদ্রী। এর থেকে বোঝা যায়, মেঘাদ্রী নদীর স্মৃতি ওদের মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি।

আলোচ্য মানুষটির চেহারা ছিল অতি সাধারণ, রং ঘোর কালো, পুরানো খাকি কিংবা ছিটের ময়লা প্যাণ্ট, তার ওপরে ময়লা ছিটের হাফ শার্ট। পায়ে বহু পুরনো মোটা স্যাণ্ডেল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কচিৎ কখনো কামাতো, মানুষটি দাক্ষিণী, কিন্তু লোকে ডাকতো চ্যাটার্জী বলে। এ নামেরও একটি ইতিহাস আছে। আমার বেশ মনে আছে, সকালের দিকেই হবে, এক নম্বর

জেটিতে বাঁধা একটা জাহাজে আমার কাজ হচ্ছে। জাহাজের গা থেকে বড় হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিয়ে ঘা দিয়ে জং ছাড়িয়ে ফেলছে আমার লোকেরা, জাহাজের গা থেকে দড়ি-বাঁধা তক্তা ঝুলিয়ে তাতে বসে তারা কাজ করছে ঠকাং ঠকাং করে বিকট আওয়াজ তুলে। আমি একটি ক্যাপস্টানের ওপর বসে ওদের কাজ দেখছি, এমন সময় মনে হলো, কে একটি লোক আমার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়ালো। মুখ ফিরিয়ে স্থানীয় ভাষায় প্রশ্ন করলাম, কে তুমি? কী চাও?

লোকটি বললো, জাহাজে আপনার কাম হচ্ছে, আর সাত-আটদিন হবে, আমাকে কামে নিবেন বাবু, আমি চিপিং-পেণ্টিং-এর কাম জানে।

বললাম, কিন্তু কে তুমি? কোথায় থাকো? নাম কী?

আমার প্রশ্নাবলীতে বোধহয় একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপরে বললে, কলকাতা থেকে এলম। আমি বাঙালী। আমার নাম—রায় চ্যাটার্জী।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললাম, তুমি বাঙালী!

হ্যাঁ।

কলকাতা থেকে এসেছো?

হ্যাঁ।

ধমকে উঠলাম, চালাকি করার আর জায়গা পাও নি? রায় চ্যাটার্জি কারুর নাম হয়?

—জী!

বললাম, এই তো আসল বুলি বেরিয়েছে বাবা! 'জী' কখনো হিন্দু বাঙালীরা বলে না। আসল নাম কী? কোথায় থাকো? কী করে জেটির ভিতরে এলে? ভিতরে আসতে গেলে 'পাস' লাগে, তা জানো? নইলে পুলিশে ধরবে।

পুলিশের কথায় ওর চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বলল, গেটে ধরেছিল, আমি দূর থেকে আপনাকে দেখিয়ে বললম, আমি ওনার লোক, ওরা ছেড়ে দিলো।

ধমক দিয়ে বললাম, আস্পর্ধা তো কম নয়! আমার লোক বলে পরিচয় দিলে কেন? তোমাকে এখখুনি ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশে দিতে পারি তা জানো?

হাত কচলে মিনতি করে বললে, বড়ো কষ্টে আছি, কামে নেন না বাবু! আপনি কামে নিলে আর পুলিশে ধরবে না।

বললাম, তাহলে সত্যি কথা বলো। তোমার নাম কী?

মাথা চুলকে, ইতস্তত করে, আরও বার দুয়েক আমার ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত বললো, ধর্মরাজু।

তুমি তাহলে এখানকারই লোক?

জী হাঁ।

এবারে তেলেগু ভাষায় কথা বলে দেখলাম, ও বুঝতে পারলো এবং স্বচ্ছন্দে ঐ

ভাষাতেই কথা বলতে লাগলো। বুঝলাম, এবার ও সত্যি কথাই বলেছে। একটু ধমকের সুরে বললাম, নাম ভাঁড়িয়েছিলে কেন?

ও কথাটার সোজাসুজি জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বাবু, রায় চ্যাটার্জী বাঙালীদের নাম নয়?

না। রায় হতে পারে, চ্যাটার্জী হতে পারে, রায়-চ্যাটার্জী এক সঙ্গে কারুর নাম হয় না।

ও বললে, তো, রাস্তার একটা সাইনবোর্ডে যে দেখলম, লেখা আছে, রায় চ্যাটার্জী।

এবার হেসে ফেললাম। তখন ভাইজাগে আরও দু তিনটি বাঙালী ঠিকাদার কোম্পানী ছিল, তাদের মধ্যে একটি ফার্মের দুই মালিকের নামে নাম মিলিয়ে আখ্যা ছিল, রায়-চ্যাটার্জী। ওকে বললাম, আচ্ছা বোকা লোক তো! সেই সাইনবোর্ড দেখে নিজের নাম বানাতে গেছো?

ও লজ্জা পেয়ে মৃদু ভঙ্গিতে বললো, শুনলম আপনি বাঙালী, তো ভাবলম—বাংলা তো জানে—আমি বাঙালী এই কথা বললে আপনি সাথ সাথ কাম দিয়ে দিবেন।

বললাম, খুব বুদ্ধি! তাকিয়ে দেখো, ঐ যারা কাজ করছে, ওরা একজনও কি বাঙালী? সব এখানকার লোক। ওদের কাছে এসে খোঁজ খবর নিলেই জানতে পারতে। নাম ভাঁড়াবার কোনো দরকার ছিল না।

ওর মুখখানা বিষন্ন হয়ে উঠলো। বললো, আপনের সর্দার নালিয়ার সাথ দেখা করলম—ওদের দল আছে বাবু, বাইরের লোককে দলে নিতে চায় না।

বললাম—কিন্তু তুমি তো ওদের দেশেরই লোক?

—না বাবু,—বললে, ওদের কাছে দেশ নয়, দলই বড়ো!

কথাটা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। একজন সামান্য মানুষ, তথাকথিত শিক্ষার ছাপ তার নেই, কিন্তু সেদিন যে কথাটা সে বলেছিল, সেটা তার জীবনমথিত সত্য ভাষণ।

বললাম, সে যাক। কী কী কাজ জানো তুমি?

ও বললো, বাবু ছয় মাস ধরে আমি কলকাতায় চিপিং-পেণ্টিং-এর কাজ করেছিলম। লেকিন, আমি দলছুট লোক, আমাকে ওরা দলে রাখতে চায় না! তো, আমি চলে এলম দেশে। কাম দিবেন বাবু?

হ্যাঁ, কাজ ওকে আমি দিয়েছিলাম। নালিয়া সর্দার খুব খুশি হয়নি, তাই আমার নিচে যে সুপারভাইজার বাঙালী বাবুটি ছিল, তার সঙ্গে যোগ-সাজসে কলকাতায় হেড অফিসে নানান মন-গড়া অভিযোগ চিঠির আকারে পাঠাতে লাগলো। আমি সে সব তখন জানতে পারি নি। এই সব চক্রান্তই ধূমায়িত হতে হতে আমার বিশাখাপত্তন-বাসের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে। কিন্তু সে সব কথা থাক। আমি ওকে সাধারণ মজুরের কাজ দিয়েই বুঝতে পারলাম, এ-কাজে ও অসাধারণ দক্ষ। ভেবে রেখেছিলাম,

পরের জাহাজেই ওকে টিণ্ডাল করে দেবো। একদিন তাই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইঞ্জিন রুমের কাজ জানো?

অল্প একটু হেসে বলেছিল, জানে সাব। বয়লারের কামও জানে।

কথাটা ও যে বাড়িয়ে বলেনি, তা ওকে পরের জাহাজে বয়লার ক্লিনিং-এর কাজ দিয়েই বুঝলাম। ও যেন একাই একশো। ফলে ও আমার খানিকটা প্রিয়পাত্রও হয়ে পড়লো বলা চলে। কথায় কথায় বন্ধুদের কাছে তাই ওর গল্প করেছিলাম, বিশেষ করে রায় চ্যাটার্জির অফিসের বাদলবাবুদের কাছে। খুব হাসাহাসি হলো ওর নাম নিয়ে। এ খবর ক্রমশই সাধারণ শ্রমিকরাও জেনে গিয়েছিল। তারা মজা পেয়ে ওকে 'চ্যাটার্জী' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। সেই থেকে সারা বন্দরে ওর ঐ নাম ছড়িয়ে পড়লো, ধর্মরাজু বলে ওকে আর কেউ ডাকতো না। ছোট বড়ো সবার কাছে ও, চ্যাটার্জী।

একদিন নালিয়াকে ডেকে বললাম, কাজ-কর্মতো চ্যাটার্জী ভালই করছে, ও কোথায় থাকে বলতে পারো?

নালিয়া একটু অবাক হয়েই বললো, আপনি জানেন না! ও বলেনি?

—না।

নালিয়া বললো, আমাদের ঝুপড়িতে আসবার জন্য কতবার বলেছি, আসেনি। রাত্রে ও আগেভাগে শুতো বন্দরের বড়ো গেটটার কাছে ফুট-পাথে। এখন দেখছি পুলিশ, কাস্টমসদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে, বন্দরের ভিতরেই এখানে ওখানে শুয়ে থাকে। কোনো জেটি খালি থাকলে, জেটির ওপর জলের ধার ঘেঁষে শুয়ে থাকে।

—ওর কেউ নেই?

—না বাবু। কেউ আছে বলে তো শুনিনি।

বললাম, বুঝেছি। একটা বাউণ্ডুলে লোক।

নালিয়া বললে, ঠিক বলেছেন বাবু। জাহাজে কাজ থাকলে যে রোজ পায়, তার কিছু হাতে রাখে না। নিজে ভালো করে খায়-দায় এমন নয়, নিজের সামান্য খরচটুকু চালিয়ে নিয়ে বাকিটা না জমিয়ে ভিখিরিদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

আর একজন বললো, লোকটার মাথায় ছিট আছে বাবু।

ও যা-ই বলে বলুক, আমার কিন্তু এই ছিটগ্রস্ত বাউণ্ডুলে মানুষটার প্রতি কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল এই, ওসব কথা জিজ্ঞাসা করলে ও উত্তর দিতে চায় না, মুখ ফিরিয়ে অল্প অল্প হাসে শুধু।

দিনকতক আরও কাটবার পর একদিন বললাম, ওহে চ্যাটার্জী, তোমার যখন থাকবার জায়গা নেই, রাত্রে এসে আমার এই অফিস ঘরের ঢাকা বারান্দায়ও তো শুয়ে থাকতে পারো? ক্যাম্প-খাট আছে, কোনো অসুবিধে হবে না তোমার। আর হাওয়া? সমুদ্রের হাওয়া তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

ও চুপ করে রইলো। সমুদ্রের হাওয়াতেও ওর উৎসাহ নেই দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বিছানাপত্তর কোথায় থাকে?

উত্তর এলো, বিছানাপত্তর নাই বাবু।

তবে শোও কিসে ?

বললে,—'গানি ব্যাগ' (চটের থলে) খুলে জুড়ে জুড়ে সেলাই করলম, একটোতে শুই, আর একটো গায়ে দিই। ঘুম থেকে উঠে জান-পয়চানওয়ালা চায়ের দোকানটার একটা কোণে পাট করে রেখে দেই।

—বাঃ! খাসা! বালিশ ?

বললে,—ইঁট কুড়ায়ে নেই।

—আরও চমৎকার! খাঁটি বোহেমিয়ান!

মুখখানা ওর গম্ভীর হয়ে গেল, বললে,—না সার, বোহেমিয়ান আর রিয়্যালি হতে পারলাম কই ?

এবার চমকে ওঠার পালা আমার। বললাম,—ইংরেজী কথাটা তো বুঝলে দেখছি। বললেও তো বেশ! কী ব্যাপার বলো ত্যো ? সবটাই কেমন যেন হেঁয়ালি লাগছে।

ও বললে,—না সার, 'রিডল্' কিছু নাই! বাচ্ছা বেলায় ফাদারদের কাছে ছিলম, তাই একটু-আধটু ইংলিশ বলতে শিখেছিলম।

—কোন্ ফাদারদের কাছে ?

বললে,—ওই ভাইজাগে তখন একটা 'অরফ্যানেজ' ছিল, ইয়োরোপীয়ান 'মংক'রা দেখাশোনা করতো। ইণ্ডিয়া ফ্রীডম পাবার পর তারা ওয়ান-বাই-ওয়ান আপন দেশে চলে গেল।

একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে বললাম,—চ্যাটার্জী তোমার আসল পরিচয়টা আমাকে বলো দেখি সত্যি করে ?

ও বললে,—আপনার কাছে যে হেলপ পেলম সার, সেটা জীবনে ভোলার নয়। তাই মিছা বলবো না আপনের কাছে। আমার কোনো বদ মতলব নাই। আমি চাই শুধু এই ভাইজাগ-পোর্টের সাথে মিশে থাকতে। এই পোর্ট ছেড়ে গিয়ে আমি ভুল করলম।

—এই পোর্ট ছেড়েই বা কেন গিয়েছিলে ? কোথায়ই বা গিয়েছিলে ?

বোধহয় ওর হৃদয়ের কোনো গোপন কোমল তারে আমার কথাটা গিয়ে রিন রিন করে বাজলো। চোখ দুটি উঠলো ছলছল করে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চ্যাটার্জী বললো, দেশ ফ্রীডম পেলো, ফাদাররা চলে গেল, আমি তখন কোনখানে যাই ? এখানকার লোক আমাকে আপন ভাবলে না। মনে দুখ ছিল, বহুৎ দুখ। তো, একজনের সাথ চলে গেলাম সেই পাকিস্তান।

বললাম, পূর্ব পাকিস্তান নিশ্চয়ই ? (তখনো বাংলাদেশ হয় নি।)

জী হাঁ।

—সেইজন্য তোমার বাংলা বুলি এইরকম জগাখিচুড়ি ঢং নিয়েছে। কোথায় ছিলে পাকিস্তানে ?

বললে, প্রথমে ঢাকা, তারপর একা চিটাগাং-এ। সেখানে জাহাজের চিপিং পেণ্টিং-এর কাম করতম।

কী ছিলে ? টিণ্ডাল ?

না সার, সুপারভাইজার। লেকিন নিজের হাতে কাম করতে ভালো লাগতো। বেশ ভালো টাকাই রোজ পেতম।

চলে এলে কেন ? হিন্দু বলে—

তাড়াতাড়ি ও বলে উঠলো,—না স্যার, হিন্দু বলে কোই চিনতোনা, গলায় ফাদারদের দেওয়া ক্রশ ঝুলতো, নামটাও চেঞ্জ করে নিয়েছিলম, লোকে ডাকতো জন বলে। খাতায় পত্তরে নাম ছিল,—জন পেরেরা। সে সব কুছ নয় সার, ফার্স্ট ইয়ারে কোন দুখ হয় নাই, লেকিন হালফিল মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল, ভাল লাগলো না। তাই একরোজ চান্স খুঁজে ওখান থেকে পালিয়ে এলম। পাসপোর্ট নেই কুছু নেই, কভি গাড়িতে, কভি হেঁটে অনেক কষ্ট করে চলে এলম কলকাত্তায়। জাহাজঘাটায় ঘোরাঘুরি করে বেশ কিছুদিন ভুখা থাকবার পর কুলির কাম নিলম। চিপিং-এর কাম, পেণ্টিং-এর কাম, মাল-বওয়ার কাম, যখন যা পাই। কুলির কাম করতে করতে কুলির মতন হয়ে গেলম। হাতে কুছ পয়সা জমলে পর এক রোজ একেবারে ট্রেন ধরে ভাইজাগ। আপন দেশ। এখানে আসবার পর সার, মনটা এমন দুখায় যে, মনে হয়, এই আমার দেশটা ছেড়ে এতদিন অত দূরে দূরে দেশে ছিলম কী করে ?

বললাম, চ্যাটার্জী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

—কী কথা সার ?

বললাম—পাকিস্তানে যে এত দিন কাটালে, ওখানে বিয়ে-সাদী.........

চ্যাটার্জী হেসে ফেলে বললে—না সার। সাদী করবো কী করে ? আমি একটা বেগার, ভিখিরী।

—ইচ্ছে করে না সাদী-টাদি করে ঘর-সংসার করতে ?

—না সার। পায়ে শিকল বাঁধতে চাই নাই। বেশ আছি। ভালো আছি।

বললাম, তোমার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে, সব-কিছুর পিছনে লুকিয়ে আছে গভীর কোন ব্যথা। কোন মহব্বৎ-টহব্বৎ—?

—না সার, সে সব কুছ নাই।

আমি ওর সঙ্গে যথাসম্ভব বাংলাতেই কথা বলতাম, ও-ও সাড়া দিতো ওর বিচিত্র বাংলা ভাষা-কথনের মাধ্যমে। কিন্তু এবার কথা বললাম তেলেগুতে, তাহলে এই-ই তোমার কাহিনী ?

—হ্যাঁ সার।

ওর সম্বন্ধে আমার কৌতুহল মিটেছিল। ভালো লাগতো ওকে। ভালো লাগতো ওর ওই বাঁধন-ছেঁড়া বোহেমিয়ান ভাবের জন্য। আমি ওকে পরের জাহাজে সুপারভাইজারের কাজ দিলাম। বললাম, যা পাবে তাই দিয়ে একটা ঘর ভাড়া করো। একটু ভালোভাবে থাকো, আস্তে আস্তে পোষাকটাও বদলাও।

ও ওর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটু হেসে চুপ করে রইলো। কিন্তু জাহাজে নালিয়া

সর্দারদের ঈর্ষাকাতর সংঘর্ষ ও অসহযোগিতার কাঁটা পার হয়েও চ্যাটার্জী যেভাবে কাজ চালালো, তাতে আমি চমকে গেলাম, কোম্পানীরও লাভ হলো।

এইভাবে দিন যায়, একদিন নালিয়া সর্দার এসে বললে, কাকে ঘর দেখতে বলেছেন বাবু? ও ঠিক পোর্টের ভিতরে জেটিতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে।

—টাকাগুলো কী করলো বলো তো? উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তো?

—তা আর বলতে!

বললাম, আচ্ছা নালিয়া, ও কি মদ-টদ খায়?

—রাম-রাম!—নালিয়া বললে, তাহলে তো কথাই ছিল না। জাহাজের কেউ দিলে-টিলে একটু-আধটু সিগারেট খায়, এ ছাড়া কোনো নেশা করে না।

এরপরে বেশ কিছুদিন আমার 'জাহাজ' ছিল না। জাহাজ নেই, তো, কাজও নেই। একদিন রাত্রে হঠাৎ খেয়াল হলো, দেখে আসি তো, ও পোর্টের জেটিতে কোথায় কেমন করে শুয়ে থাকে!

আমার বাসা থেকে পোর্টের দিকে যেতে পথের মধ্যে আমাদের একজন টিণ্ডাল কৃষ্ণাদের ঝুপড়ি পড়ে। সেখান থেকে কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে পোর্টে গেলাম। কৃষ্ণা বোধহয় খোঁজখবর রাখতো। তিন নম্বর জেটি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা টিনের শেডের বারান্দায় একটা চ্যাটাই বিছিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। উপুড় হয়ে শুয়ে সামনের দিকে মুখ করে কী দেখছিল। ওর দৃষ্টির সামনে কোনো মানুষ নেই, শুধু পূর্ববর্ণিত সেতুটিকে দেখা যাচ্ছে, যার তলা দিয়ে বন্দরের জল অনেক দূর পর্যন্ত ভিতরে চলে গেছে।

—চ্যাটার্জী?

ও ধড়মড় করে উঠে বসলো, অবাক হয়ে বললে, সার! আপনে!

আমি কৃষ্ণাকে ফিরে যেতে বলে ওর চ্যাটাইয়ের ওপর বসলাম। বললাম, এখানে শুয়ে আছো। কেউ আপত্তি করে না?

ও বললে, না সার, সবাই ভালবাসে।

বললাম, তোমাকে ঘর নিতে বলেছিলাম না?

ওর কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়লো, বললে, বলবেন না সার, আমার এই-ই ভালো লাগছে।

—অতো মনোযোগ দিয়ে ওদিকে কী দেখছিলে?

ও বললে, সার, ঐ যে ব্রীজটা দেখছেন, ওটা ছাড়িয়ে জল চলে গেছে, বহুৎ দূরে, মেঘাদ্রী নদী।

—একদিন নদী দেখতে গেলে কেমন হয়?

উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো, যাবেন সার? আমি কালই আপনাকে নিয়ে যাবো!

হাতে যখন কাজ নেই, তখন কী করবো, ওকে নিয়ে পরদিন বেরিয়ে পড়লাম মেঘাদ্রীর জলধারা দেখতে। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে নদী যেন মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলেছে! এই মেঘাদ্রী দেখার উৎসাহ চ্যাটার্জীর ছিল অপরিসীম।

কথা বলতে বলতে বুঝতে পারলাম, ভাইজাগ পোর্টের প্রতি ওর আকর্ষণ কতো বেশি! আকর্ষণটাকে প্রায় অস্বাভাবিক পর্যায়ে ফেলা যায়। এবং কেন যে এই তীব্র আকর্ষণ, সেটা এখনো বুঝতে পারছি না।

তোমার চলছে কী করে? জাহাজ তো নেই এখন!

ও চুপ করে রইলো। বললাম, টাকা দেবো? কিছু অ্যাডভান্স?

না স্যার।

—তবে? চলবে কী করে?—বললাম, না হয় তো অন্য জাহাজেই ঠিকা কাজ করো তুমি!

ও বললে, অন্য বাঙালীবাবুরা কাম দিতে চাইছে। আপনে রাগ করবেন, তাই কাম নেই নাই!

—দূর পাগল!—বললাম,—কোনো মানে হয়! আমার জাহাজ না থাকলে অন্য জাহাজে নিশ্চয়ই কাজ করবে।

এবং এইভাবে ও অন্য অন্য জাহাজ করতে লাগলো। শুধু চিপিং বা পেন্টিং নয়, একদিন শুনলাম, ও একটা জাহাজে টালি ক্লার্কের কাজ করছে, রাখছে মাল ওঠানো-নামানোর হিসাব, আর তা খুবই দক্ষতার সঙ্গে।

কিন্তু এতো আয় করেও চ্যাটার্জীর হাল সেই আগের মতো, সেই ফাঁকা জেটিতে রাত্রিবেলা গিয়ে শুয়ে থাকা। টাকা-পয়সা সব বিলিয়ে দেয় ভিখারীদের মধ্যে। পোর্টের ফটকের কাছে এক পাল ভিখারী চিরকালই ভিড় করে থাকে, তারা ওকে দেখেই যে ভাবে ছুটে আসে, তা থেকেই বোঝা যায়, ওদের সঙ্গে চ্যাটার্জীর সম্পর্ক কতো নিবিড়।

আমাদের ক্লাবে ওকে নিয়ে কথাবার্তা হয়। একদিন বিমানবাবু বলে এক ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন,—চ্যাটার্জী হচ্ছে জাত-বাউন্ডুলে। জোর করে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সবাই হৈ-হৈ করে উঠে এ-প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলো। আমি বললাম,—তার আগে ওর একটা স্থায়ী চাকরি হওয়া দরকার।

বিমানবাবু নিজেই ঠিকাদারদের অন্যতম। তাঁর কোম্পানীর তিনিই মালিক। বললেন,—বেশ, আমি ওকে নিয়ে নিচ্ছি সুপারভাইজার করে। মাস মাইনে দুশো টাকা।

কথাটায় চমকে উঠলাম। ও বিমানবাবুর কোম্পানীতে চলে গেলে ওর মতো চৌখশ লোককে আমি হারাবো। আমার ক্ষতি হবে না? বললাম,—না বিমানবাবু, ওকে আমিই নিয়ে নিচ্ছি এই মাস থেকে। ঐ মাইনেই আমি দেবো।

বিমানবাবু বললেন,—বেশ। কিন্তু বিয়ে ওকে দিতেই হবে।

সত্যি কথা বলতে কী, একটা রেষারেষি আরম্ভ হয়ে গেল চ্যাটার্জীকে নিয়ে। কে আগে ওর বিয়ে দিতে পারে! বিয়ের খরচ চাঁদা করে তোলা হবে ঠিক হলো। একটা কাগজ নিয়ে তখ্খুনি সই-সাবুদ হয়ে গেল, কে কতো দেবে। তাতে

করে দেখা গেল, সহজেই আটশো টাকা উঠে যাচ্ছে। তখনকার দিনের আটশো টাকা! কম নয়! আর ওদের বিয়ের খরচ এমন কিছু বেশি হয় না।

আমি জানতাম ও আপত্তি তুলবে। কিন্তু সবার জোর-জবরদস্তিতে ওর আপত্তি টিকলো না। কৃষ্ণাদের বস্তির কাছাকাছি একটা পাকাঘর কুড়ি টাকা ভাড়ায় ঠিক করা হলো। তক্তপোষ, বাক্স, বিছানা, সব কেনা হলো। কেনা হলো পোষাক-আশাক। এক কথায় ওকে আমরা জোর করে ঘরে পুরলাম। তারপরে শুরু হলো কনে খোঁজা। দেখা গেল, জাতে ও উঁচু নয়, চট্ করে মেয়ে দিতে কেউ রাজী হলো না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণাদের চেষ্টায় জেলেপল্লী থেকেই একটি গোলগাল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দেখে আমরা ওর বিয়ে দিলাম। মেয়ের বয়স ছাব্বিশ, ওরও কম নয়, ছত্রিশ। বিয়ের হৈ-হল্লার পর চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেমন, কনে পছন্দ হয়েছে তো?

ওর মুখখানা গম্ভীর। বললে, আপনে এর মইধ্যে ছিলেন বলে আমি কুছু বলতে পারি নাই। লেকিন, বিয়া দিলেন কেন? আমার ইসব সয় না!

বললাম,—সয় না বলছো কী করে? অভিজ্ঞতা হয়েছে নাকি?

ও বললে,—না সার। আমার মন জানে—সয় না।

দূর! বাজে বকোনা! মন দিয়ে ঘর-সংসার করো!

দিন যায়। জাহাজ আসে, জাহাজ যায়, চ্যাটার্জী কাজকর্ম দক্ষতার সঙ্গেই করে। কিন্তু কেমন যেন মনমরা, কম কথা বলে, একটা স্থায়ী বিষণ্ণতা ওকে যেন ঘিরে রেখেছে সর্বক্ষণ! এরপর বোধহয় মাস খানেকও কাটে নি, কৃষ্ণা একদিন সকালে এলো চ্যাটার্জীর বউকে নিয়ে।

কী ব্যাপার?

বউ দক্ষিণী মেয়ে—শ্রমিক শ্রেণীর মেয়ে, ঘোমটা টানা জড়ভরত নয়। বললে, সাব ও রাতে থাকে না। একটা ব্যবস্থা করুন।

ডেকে পাঠালাম চ্যাটার্জীকে। ধমকও দিলাম। কিন্তু কে শোনে? রাত একটু বেশি হলেই ঘুমন্ত বউয়ের পাশ থেকে ও উঠে যায়। শুয়ে থাকে গিয়ে সেই তিন নম্বর জেটির দক্ষিণদিককার বারান্দায়। কতক্ষণ যে অপলক দৃষ্টিতে মেঘাদ্রীর নদীর ক্ষীণ স্রোতধারার দিকে তাকিয়ে থাকে, কে জানে!

পরে শুনলাম, নিত্য অভাব লেগে থাকে ওদের। খোঁজ-খবর নিতে নিতে আরও জানলাম, ওর সেই ভিখারী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত আদৌ কমেনি। তার ফলে অভাবও ওদের প্রচুর এবং এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে। চ্যাটার্জীকে ধমক দিয়ে, চাকরির ভয় দেখিয়েও শোধরাতে পারলাম না।

এভাবে ছয় মাস আরও কেটে গেল। ওদের সংসার সুখের হয় নি, ওর বউ অনন্যোপায় হয়ে কৃষ্ণাকে সঙ্গে করে আমার কাছেই ছুটে আসে, চোখের জল ফেলে, নালিশ জানায়। কিন্তু আমিই বা ওদের ব্যাপারে কতটুকু কী করতে পারি?

আমাদের ক্লাবে ওদের বিষয়টা ওঠে। আমার মতো সবাই-ই ওর ব্যাপারে মাথা ঘামায়, কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে কেউই পারে না।

একদিন সন্ধ্যার পর চ্যাটার্জী নিজেই আমার কাছে এলো। মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, যেন সে ভারমুক্ত স্বাধীন বিহঙ্গম।

বললে, সার, আপনে সবই জানেন। বলেছিলাম, বিয়া আমার সয় না। বউ পালায়ে গেছে।

সে কী!

আমি বেঁচেছি সার।

ধমকে উঠলাম, চুপ করো তুমি। লজ্জা করে না কথা বলতে? খোঁজখবর করেছিলে?

তা একটু করেছিলাম।

খোঁজ পেলে?

চ্যাটার্জী বলতে লাগলো, একেবারে পাই নাই বললে ভুল হবে। কৃষ্ণার সঙ্গে পালায়ে চলে গেছে কলকাতায়। কী বোকা! ওখানে থাকতে পারবে? কষ্ট হোবে।

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম বলা যায়। বললাম, কষ্ট হবে, তা তোমার কী! বউকে ভালবাসলে কি আর বউ পালায়? বেশ হয়েছে, তোমার মতো লোকের ওটাই হওয়া উচিত।

ও চলে গেল তখনকার মতো। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা তদারকি করলাম। জানা গেল কথাটা ঠিক। সেদিন রাত্রে আবার জেটিতে গিয়ে ধরলাম চ্যাটার্জীকে, বললাম, চলো আমার সঙ্গে। থানায় ডায়রী করবে।

ও একটু হাসলো, বললে, না সার—ও সুখী হোক। আমি তো ওকে ভালবাসতে পারলাম না!

ধমকের সুরে বললাম, কেন পারলে না? ও কি অপছন্দের মেয়ে? কী, রঙ কালো বলে—?

ও বললে, ডানাকাটা ধবধবে রঙের পরী হলেও ভালবাসতে পারতাম না।

এ-কথাটা ও অবশ্য নিজের ভাষায় বলেছিল। আমি উত্তরে তেলেগুতেই কথা বলতে লাগলাম। যা কথাবার্তা হলো, তা—এই ঃ

চ্যাটার্জী একটু থমকে থেমে তারপরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, সার, অনেক অনেক বছর আগে এই পোর্টের গেটের কাছে এই রকমই একদল ভিখারী ঘুরঘুর করতো। তাদের দলে ছোট একটি মেয়ে ছিল—ওরা তার নাম রেখেছিল, মেঘাদ্রী। তার বাপ কে, মা-ই বা কে—কেউ জানতো না। ক্রমে মেয়েটি বড়ো হলো। বড়ো হবার পর সে ভিক্ষে না করে এই পোর্টে জাহাজে মাল বইবার কাজ করতে লাগলো। এই পোর্টে যে মেয়েরাও মাল বইবার কাজ করে, এ আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। মাল বয়ে বয়ে তার দিন কাটে, কিন্তু কখন যে সে এরই মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লো, তার খবর কেউ জানে না। সেই কুমারী মেয়ের গর্ভে যে সন্তান এসেছিল, সে আর কেউই নয়, আমি। আমার এই

কাহিনী, সেই যে ফাদারদের কথা বলেছিলাম, তাদের একজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আমার মা একবার তিন নম্বর জেটিতে এসে লাগা একটি জাহাজে রাত্রে কাজ করছিল। অন্তঃসত্বা অবস্থাতেও সে কাজ করতে বাধ্য হতো, তার গ্যাংয়ের সর্দার তাকে তখনো রেহাই দিতো না। হয়ত হাল্কা কাজ দিতো, জাহাজের খোলের ভিতরে গম-বোঝাই বস্তার মুখ সেলাই করা। কিন্তু তবুও তো সেটা কাজ। লোহার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলের ভিতরে তাকে তো ওঠা-নামা করতে হতো! এই রকম অবস্থায় আমার মা এক রাত্রিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে বা উঠতে গিয়ে হাত বা পা ফসকে পড়ে যায়। পড়ে গিয়েছিল স্তুপীকৃত গমের রাশির ওপর এই যা রক্ষে। কিন্তু তখনই মায়ের ব্যথা ওঠে। আমি মায়ের কোলে অসময়ে চলে আসি এইভাবে। এইভাবে জাহাজের খোলের মধ্যেই আমার জন্ম হয়। কিন্তু আমাকে পৃথিবীতে আনবার পর মা অসুস্থ হয়ে পড়ে—প্রবল জ্বর হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চার দিনের দিন মা আমার মারা যায়। ভিখারীদের কারুর কোলে মাসখানেক থাকবার পর আমার স্থান হয় ফাদারদের আশ্রমে। তার পরের কথা তো আপনি সবই জানেন স্যার। আমি বড়ো হয়ে যখন সব শুনলাম, তখন প্রথম যে ভাবটা আমার মনে এসেছিল, সে হচ্ছে প্রচণ্ড রাগ আর অভিমান। এক দল মুসলমান খালাসী পূর্ব পাকিস্তান যাচ্ছিল, তাদের একজনের সঙ্গে ভাব করে আমিও চলে গিয়েছিলাম পাকিস্তান। কিন্তু বয়স যত বাড়তে লাগলো, দিনের পর দিন যত পার হতে লাগলো, ততই আমার মনের ভাব বদলাতে লাগলো। আমার মন কাঁদতে লাগলো ভাইজাগ বন্দরের জন্য। এলাম পালিয়ে কলকাতায়। তখন ভিতরের কান্নাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছি। কী হবে ভাইজাগে গিয়ে? কে আছে আমার ভাইজাগে? কিন্তু ক্রমাগত মনকে এ কথা শোনাতে থাকলেও মন শেষ পর্যন্ত বারণ শুনলো না। ছুটে এলাম ভাইজাগে। আপনার দয়ায় জাহাজে কাজ পেলাম। আর,—জাহাজে কাজ করতে করতে আমার সেই হারানো না-দেখা মায়ের জন্য মনটা কেমন করতে থাকলো। সব দেখে-শুনে বেশ বুঝতে পারলাম, আমার মায়ের কোনো দোষ ছিল না। সে গরিব, সে ভিখারী, সে আত্মরক্ষা করবে কেমন করে? মায়ের নাম মেঘাদ্রী, আর ঐ মরা নদীর নামও মেঘাদ্রী, তাই আমি রাত্রে, ঐ তিন নম্বর জেটির পিছনে শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে, ততক্ষণ মেঘাদ্রীর লুপ্তপ্রায় ধারার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি। মা ভিখারীদের দলে থেকে ভিক্ষে করতো বলে, ভিখারী মেয়ে দেখলেই আমার বুকটা মায়ের জন্য মুচড়ে উঠতে থাকে! ওদের ছোট-বড়ো সবার মুখের দিকে তাকাই, আর সবাইকে আমার মা মনে হয়! মায়ের জন্য সন্তান সর্বস্ব পণ করে থাকে, কিন্তু আমি আর ওদের জন্য করতে পারি কতটুকু?

বলতে বলতে—অত বড়ো মানুষটা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

আমি ওর কাঁধে হাতখানা রাখলাম। বললাম,—আমার আর কিছু বলার নেই। শুধু এটুকু বলবো, এ-জেটি ছেড়ে যেয়ো না।

ও বুঝি অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হলো, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?

চ্যাটার্জী সত্যিই আর কোথাও যায় নি ভাইজাগ ছেড়ে। আজকাল ওর কথা যখনই মনে পড়ে, তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিন নম্বর জেটির পিছন দিকটার অংশটুকু। মনে হয় এখনো নির্জন রাত্রিতে ও ওখানেই শুয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে যার 'মরুপথে হারালো ধারা' সেই—মেঘাদ্রীর দিকে। ঘর নেই—সংসার নেই—স্ত্রী নেই—পুত্র নেই, ওর অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনাই বুঝি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই অবজ্ঞাত, অবহেলিত নদীটির ওপর, যার নাম—মেঘাদ্রী।

॥ ১৩ ॥

আমার বিবাহিত জীবনের মাস ছ'য়েক কেটে যাবার পর নবপরিণীতাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ঘাটশিলায় যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। সেইমতো ছুটিও নিলাম কিছুদিনের জন্য। ততদিনে আমার মা ফিরে গেছে কলকাতায় ভাইয়ের সঙ্গে। অফিসে মালিকপক্ষের ছোটভাই নিজে এখানে কর্মরত, সুতরাং অফিস নিয়ে চিন্তা নেই। সেজন্য আমাদের জাহাজ যখন আসবে না, এমন একটা সময় বেছে নিয়েই এই ছুটির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ঘাটশিলা আমার পুরানো জায়গা, সেজন্য স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখবো বলে একটু বেশিদিনের ছুটিই চেয়েছিলাম। ওঁরা জাহাজের আবির্ভাব-তালিকা দেখে ঐ সময় জাহাজ আসবার যে কোনো সম্ভাবনা নেই, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। রসিকতা করে বলেছিলেন, হনিমুনে যাও!

যাইহোক, অফিস-সংক্রান্ত সব ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করবার পর প্রস্তুত হয়ে বসে আছি নির্দিষ্ট দিনে রওনা হবো বলে, নবপরিণীতাও তার মামাবাড়ি (তার পিতামাতা শৈশবেই বিগত, সেজন্য মামাদের কাছে মানুষ) ঘাটশিলায় যাবার আনন্দে মশগুল হয়ে আছে, এমন সময় হঠাৎ আবার একটি আহ্বান এলো জাহাজে গিয়ে ওঠবার। জাহাজ অবশ্য বিলেত-টিলেত যাচ্ছে না, নেহাতই দিশী জাহাজ এবং যাবে দেশের আশেপাশেই। তবে নতুন নতুন জায়গা দেখার এ-ও তো একটা সুযোগ? যিনি এই ব্যবস্থা করবার মূলে, সেই আমার পরম সুহৃদ মিঃ রাও বললেন,—অবশ্য তুমি নতুন বিয়ে করেছো, এখন তোমাকে বলাও মুশকিল, তবু সুযোগটা আসায় প্রথমে তোমার কথাই মনে হলো। যাবে? না, অন্য কাউকে—

বাধা দিয়ে বললাম,—জাহাজ কোথা থেকে ছাড়বে?

—কলকাতা।

চমকে উঠলাম। মনে হলো, সত্যিই এটা আমার কাছে একটি পরম সুযোগ। কলকাতার ছেলে আমি, ভাগীরথী দিয়ে ভয়াবহ 'জেমস-মেরী চড়া' পেরিয়ে

গঙ্গাসাগরকে বাঁয়ে রেখে কখনো সমুদ্রে গিয়ে পড়ি নি। অথচ কলকাতায় গিয়ে জাহাজে ওঠার বিপদও আছে। আমার হেড-অফিসের লোকেদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। সেটা কোনরকমে এড়িয়েই কাজটা করতে হবে আর কী! আমি একটু চিন্তা ক'রে শেষ পর্যন্ত সবরকম দ্বিধা কাটিয়ে রাওকে বললাম,—রাজী।

ভেরি গুড!—রাও বললেন,—আজই ট্রাঙ্ক-কলে কলকাতায় আমাদের হেড-অফিসে সব জানিয়ে দিচ্ছি। পেপার্স সব রেডি করে রাখবো, তুমি কাল সকালেই কালেক্ট করে নিয়ো। ও-কে?

—ও-কে!

এসব কথা নবপরিণীতাকে জানানো যায় না। কিন্তু ট্রেনে উঠে প্রথম শ্রেণীর কুপোতে পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে মনে হচ্ছিল, আমিই বা ওকে ছেড়ে থাকবো কী ক'রে,—এই একটা মাস?

তার ওপরে সে যখন আমাকে একান্তে পেয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে আমাকে ঘাটশিলার ডাহিগড়া-হাতিজোবড়া মৌ ভাণ্ডার প্রভৃতি তার অতি পরিচিত জায়গার কোথায় কোথায় বেড়াবে, সেই সব তালিকা উপস্থাপিত করছিল, তখন মনটা স্বভাবতই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বিয়ের পর এই ছয় মাস কাজের চাপ ছিল প্রচুর, যার ফলে ওকে আমি সময় দিতে পেরেছিলাম কতটুকু? সেজন্য ঘাটশিলাতে একান্ত করে সে আমাকে পেতে চেয়েছিলো, মনের মতো জায়গায় বেড়াবে আশা করে বসেছিল। মনে হলো, দূর ছাই, কী হবে ওকে বঞ্চিত করে? রইলো জাহাজ, ঘাটশিলা পেঁছেই রাওকে টেলিগ্রাম করে দেবো,—দুঃখিত। যেতে পারছি না।

কিন্তু ঘাটশিলায় পদার্পণ করবার পর মনটা দোটানায় পড়লো। 'কী-করি—কী করি' ভাবতে ভাবতে টেলিগ্রাম আর করা হলো না। ওদিকে নব-পরিণীতাকে নিয়ে ফুলডুংরি, রাতমোহানা, হাতিজোবড়ার শালবন প্রভৃতিতে বেড়িয়ে খুব ছবি তুললাম আমার ক্যামেরায়। কিন্তু তারপরই মনটা পালাই-পালাই করতে লাগলো। রাত্রে একান্তে তাকে কাছে পেয়ে বললাম,—কাল কলকাতা যাবো।

—সে কী!

প্রিয়াকে বাহুপাশে বেঁধে নিয়ে বললাম,—বুঝছো না? এতদূরে এসেছি ভাইজাগ থেকে, আর দুই পা ফেলে কলকাতায় গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবো না? আমি দিন কয়েক থেকেই ফিরে আসবো।

কিছু বললো না বটে, কিন্তু সে যে বিশেষ মনক্ষুণ্ণ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—গিয়েই চিঠি লিখবো, কেমন?

সে তখনো কোনো উত্তর দিলো না।

কলকাতায় পেঁছে মা-বাবার থেকে বেশি দরকার ছিল মিঃ রাওদের হেড-অফিসে গিয়ে দেখা করবার। কাগজপত্র পেশ করে ভাবছিলাম, সুযোগটা হাত-

ছাড়া হয়ে গেল না তো? ওরা তৎক্ষণাৎ বেয়ারা দিয়ে কাগজপত্র জাহাজে পাঠিয়ে দিলো।

অর্থাৎ বোঝা গেল, ভাগ্য বিরূপ নয়। কিন্তু সময়ও বেশি হাতে নেই। এস্‌প্লানেড মুরিং-এ জাহাজ এসে ছাড়বার অপেক্ষায় নোঙর করে আছে, দু-এক দিনের মধ্যেই ছাড়বে। ওদের অফিসে বসে কিছুক্ষণ গল্প সল্প ক'রে বড়ো সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পালা শেষ ক'রে জাহাজে গেলাম ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। নৌকো করে যেতে হবে জাহাজে। এ যে লাইনের জাহাজ, সে লাইনের ঠিকাদার আমাদের কোম্পানী নয়, সেজন্য হেড-অফিসের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। তবু সাবধানের মার নেই। মা অবশ্য বলেছিল,—খিদিরপুরে যাবি না—ওদের সঙ্গে দেখা করতে?

উত্তর দিয়েছিলাম,—না। গেলেই 'এই অফিসে যাও', 'সেই অফিসে গিয়ে অমুকের সঙ্গে দেখা করে এই কাজটা করে এসো',—এসব বলবে। এখন যে মেজাজে আছি, তাতে ওসব ভালো লাগবে না।

মা বোধহয় কথাটা শুনে মুখ লুকিয়ে একটু হেসেছিল। তারপর বলেছিল, —বৌমাকে পৌঁছনোর সংবাদ দিয়েছিস?

বলেছিলাম,—দূর! দু-দিন পরেই তো ফিরে যাচ্ছি, আবার চিঠি লিখবো কী?

—লিখতে হয়। বেচারী ভাববে না?

হেড-অফিসে গিয়ে ব্যাপারটা জানালে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হতো, আমার সমুদ্র-ভ্রমণ ওঁরা ভালো চোখে দেখবেন না। শত্রুপক্ষের গোপন চিঠির মাধ্যমেই হোক, আর যেভাবেই হোক, ওদের মনোভঙ্গি ছিল, এই বুঝি ওদের কাজ ছেড়ে আমি অন্য কোনো অফিসে যোগ দিলাম, কিম্বা নিজেই স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা করবো বলে অফিস খুলে বসবার চেষ্টায় আছি! ওঁদের আগেকার ম্যানেজার দু-একজন এভাবে ওঁদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজস্ব অফিস খুলে বসেছিলেন বলেই ওঁদের মনে অনুরূপ সন্দেহ দানা বেঁধে ছিল।

বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, যা বলছিলাম সে-কথাই বলি। কলকাতার গঙ্গায় ছোট-ছোট পানসী ধরনের নৌকোর সংখ্যা কম নয়। তারই একটিকে নিয়ে জাহাজের দিকে রওনা হবো বলে উঠেছি, কিন্তু কথায় বলে না, 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়?'—আমারও হলো সেই অবস্থা। ভাইজাগে যাবার আগে ছ-মাস কলকাতাতেই হেড-অফিসের হয়ে শিক্ষানবিশী করার সময় বহুবার বহু জাহাজে উঠতে হয়েছে এইরকম পান্‌সী নিয়ে। তার ফলে অনেক পানসীর মাঝিমাল্লা আমার পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। কথাটা আমার তেমন মনে ছিল না, নইলে একটু দেখেশুনেই নৌকো নিতাম। নৌকো তীর থেকে জলে গিয়ে পড়া মাত্রই মাঝির আপ্যায়ন-মণ্ডিত কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো,—বাবু কি তয় ভাইজাগ থিকা দ্যাশে ফিরলেন নি?

চমকে তাকালাম। লুঙ্গি, ফতুয়া, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি,—আমার সেই পূর্ব পরিচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' আমার দিকে তার অভ্যস্ত হাসিটুকু ঠোঁটে ফুটিয়ে তাকিয়ে আছে।

—মকবুল না ?

তার মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হলো, বললে,—হ। দূর দ্যাশে গিয়া বাবুজী শাসে জলে হইছেন, আমি ত পেরথমে ঠাওরই পাই নাই !

বললাম,—তুমি কেমন আছো, বলো ? দেশে-টেশে গিয়েছিলে নাকি—

মকবুল দাঁড় চালাতে চালাতে বললো,—কই আর গেলাম ! বাবুজী, কইতে সরম লাগে, বুড়া বয়সে খোদার ফজলে এই এতকাল পরে ছাওয়ালের বাপ হইছি।

—তাই নাকি ! দারুণ সুখবর !

মকবুল বললে,—জরুকে তাবিজ-উবিজ কতো করছি, কতো পীরের দরগায় বাতি জ্বালাইছি, আমাগো হেস্টিংসে পীরের থানে যে 'উরুস' (মেলা) হয়, সেইখানে এক ফকির আইছিল, জব্বর ফকির, আইছিল হেই কোন্ দূর দ্যাশ 'আজমীর' থিকা। হেই বইসা বইসা ঝাড়ফুঁক করলো, ব্যস, আমার তো একখান বিবি আপনে জানেন, সেই বিবির পেটে পোলা আইলো। দিব্যি ফুটফুইট্টা হইছে, এই ছ'মাস হইল বয়স।

—বাঃ ! খুব খুশি হলাম শুনে।

মকবুল ততক্ষণে জাহাজের সিঁড়ির কাছে নৌকো নিয়ে ভিড়েছে, বললে,—সাধ হয় বাবুজীরে নিয়া গিয়া দেখাই, বেশি দূর না—দরিয়া দিয়া বাইয়া যামু—ঘাটলার নজদিগই হইবো।

আমি উঠে সিঁড়িতে পা দিয়ে বললাম,—দেখা যাক। আগে তো কাজটা সেরে আসি ?

—তা আসেন।

ওপরে, ক্যাপ্টেনের ঘরে ঢুকে আর এক বিস্ময়ের সম্মুখীন হলাম। ক্যাপ্টেন আমার পূর্ব পরিচিত। গুজরাতি। মিঃ দুধওয়ালা। এই নামটির জন্য মানুষটিকে তারও মনে ছিল। ভাইজাগে আলাপ হয়েছিল, আমাদেরই কোনো লাইনের জাহাজে চীফ অফিসার ছিলেন। এখন দেখছি ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হয়ে অন্য লাইনের জাহাজে চলে এসেছেন। আমাকে দেখেই বললেন,—কী হে, ওয়ার্লড্ ইজ রাউন্ড, ইজন্‌ট্ ইট্ ?

—চিনেছেন আমাকে ?

দুধওয়ালা উত্তর দিলেন,—অফ কোর্স ! ইওর বায়োডাটা—

ইত্যাদি বহু কথা। কলকাতা থেকেও এজেন্ট একটি লোক দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাইজাগের মিঃ রাওয়ের সুপারিশ ও আমার জীবনপঞ্জী সম্বলিত কাগজপত্র দেখে দুধওয়ালার আমাকে চিনতে অসুবিধা হয় নি। বললো,—আর একদিন দেরি করলে আমাকে কলকাতার লোকটিকে বাধ্য হয়ে নিতে হতো। নাউ কাম অন, নিজের কেবিনে যাও।

'রাইটার' বা 'কেরানী'র কেবিন এই সব 'যুদ্ধকালে প্রস্তুত লিবার্টি-ধরনের' জাহাজে কোন্‌দিকে থাকে, তা আমার জানা ছিল। সুতরাং খুঁজে নিতে অসুবিধা হলো না। ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা, আমি এখন থেকেই জাহাজে স্থিতি হয়ে থাকি, কিন্তু অনেক বলে কয়ে সেটা রোধ করলাম। আগামী কাল জাহাজে আসবো, এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমাদের মকবুল বা 'পদ্মানদীর মাঝি'র নৌকোতেই এসে উঠলাম।

মকবুলই কেন 'পদ্মানদীর মাঝি' বলা হয়, তার কারণ হচ্ছে, কলকাতার গঙ্গার পানসী চালক ছিল সবাই মূলত অবাঙালী মুসলমান, তার মধ্যে মকবুলই সম্ভবতঃ একমাত্র বাঙালী এবং পূর্ববঙ্গের মানুষ। পদ্মাতেই গহনার নৌকো'তে সওয়ারি বসিয়ে পদ্মা পাড়ি দিতো। সেই মকবুল তার বয়সকালে কলকাতা দেখতে এসে তাদের এক আত্মীয়ের ওয়াটগঞ্জ অঞ্চলের বাসায় ওঠে। এখানে থাকতে থাকতে স্থানীয় অবাঙালী মাঝিদের একটি 'খাপসুরত' মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং এই প্রেমের টান এতো গভীর ছিল যে, সেবারে অভিভাবকদের নির্দেশে তাদের সঙ্গে দেশে ফিরে গেলেও পদ্মা আর তাকে বেঁধে রাখতে পারলো না, গঙ্গার টানে সে আবার একদিন চলে এলো কলকাতায়। এবার এলো পালিয়ে। তারপরে তার সাদী এবং ক্রমে ক্রমে শ্বশুরের পানসীতে অধিষ্ঠান। এইজন্যই অন্যান্য মাঝির দল ওকে 'পদ্মানদীর মাঝি' বলে ডাকতো।

কিন্তু গঙ্গানদীতে যাতায়াতকারী জাহাজের যারা ঠিকাদার বা ঠিকাদারের প্রতিনিধি, তারা এই সব মাঝিমাল্লার সঙ্গে তেমন মিশতো না বা তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর রাখতো না। আমার স্বভাবটা এর বিপরীত বলে সময় ও সুযোগ পেলেই এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করতাম। শিক্ষানবিশী কালে ঐ এস্‌প্লানেডের জেটিতে ক্যাপস্টানের ওপর বসে আছি জাহাজ আসবার আশায়, ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক কেটে গেছে, জাহাজের দেখা নেই। তখন করবো কী? অন্যান্যদের মতো কাছের কোনো পরিচিত অফিস বা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে আড্ডা জমানো যায়, কিন্তু আমার সে-ইচ্ছা হতো না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে, নিরালা, শূন্য জেটির ওপর একা বসে আছি, তখন এইসব পানসীর মাঝিদের ডেকে ডেকে আলাপ জমাতাম, কখনো বা ওদের আহ্বানে ওদেরই নৌকোতে গিয়ে বসতাম। আমাদের মতো ওদেরও জীবন জাহাজের সঙ্গে বিজড়িত। জাহাজের লোকদের নিয়ে পারাপার করাই তো ওদের মুখ্য জীবিকা! মকবুলের সঙ্গে এইভাবেই একদিন আমার আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ওরাও খবরাখবর রাখতো কম নয়। আমি কে, কোন্‌ অফিসের লোক,—সে-সব তথ্য আলাপ হবার আগেই ওরা নিয়ে রেখেছিল।

যাই হোক, মকবুল সেদিন আমাকে তীরের দিকে না নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি জাহাজের পাশ কাটিয়ে খিদিরপুরের দিকে চালিয়ে দিয়েছিল তার পানসী।

তখন বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যার আগমনী ঘোষিত হচ্ছিল আকাশের প্রান্তে।

একটু পরেই ওপারের কোনো মন্দির থেকে আরতির ঘণ্টা হয়ত আগেকার মতো বেজে উঠবে! গঙ্গায় তখন ভাঁটার সময়। ওর পানসী তরতর করে এগিয়ে চলছিল। আমি বুঝেছিলাম ও কী চায়, তাই আর বাধা দিলাম না। শুধু বললাম,—তাহলে তোমার বাসাতেই আমাকে নিয়ে চললে?

মকবুল বলে,—বাবুজী, এক মিনিট। আমার ছাওয়ালটারে একটু দেইখ্যা যান। কতোকাল পরে আপনের সাথে মোলাকাৎ হইল কন্ দেহি! বড়ো আনন্দ হইছে!

নৌকো এগিয়ে যাচ্ছিল। একসময় বললাম,—আচ্ছা মকবুল, গঙ্গায় নাও বাইতে বাইতে তোমার পদ্মার কথা মনে পড়ে না?

মকবুল উত্তর দিলো,—পড়ে বাবু—হরবখতই পড়ে! মনে দুখ হইলে একটা চিন্তায় ডুব দেই। কী চিন্তা জানেন? আপনেরে কই। বস্তিতে এক মাস্টারবাবু এক ছাওয়ালরে পড়াইতে আসে। তার কাছে কথাটা শুনছিলাম। বড়ো হক্‌দার কথা। মনে একেবারে লাইগা আছে। শুনছিলাম, এই গঙ্গা নাকি আগে পদ্মার মতোই আছিল। ঐ রকম বিশাল, এপার-ওপার দেখা যায় না। আর আমাগো হেই পদ্মা আছিল এই গঙ্গার মতো, এইরকম চওড়া। একদিন হইলো কী, গঙ্গার স্রোত এই ভাগীরথীর দিকে না আসিয়া হেই পদ্মার খাত দিয়া চলতে লাগলো, তখন কতো যে ঘরবাড়ি—কতো যে গ্রাম ডুবাইলো তার হদিস নাই! সেইজন্য পদ্মারে নাকি কয় কীর্তিনাশা। ওদিকে পদ্মা হইয়া গেল বিশাল, আর গঙ্গা হইয়া গেল ছোট! তাই বলছিলাম বাবু, মন দুখাইলে হেই চিন্তায় ডুব দেই। চিন্তা করি যে, আমি যেন হেই গঙ্গায় নাও বাইতে আছি, যেই গঙ্গা ছিল বিশাল—আমাগো ঐ পদ্মার লাখান! সত্য কথাটা কই বাবু, হেই কথা মনে আইনা বড়ো আরাম পাই! আপনে কইবেন, ক্যান, আরাম কিসের? আরাম আছে বাবু, মনে দুখ হইলে, একটা বিশাল কিছু—বড়ো কিছু ভাবতে পারলে সেই দুঃখের আর লেশ থাকে না! কী বাবু, কথাটা কি মিছা কইলাম?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—না মকবুল, না। তোমার মতো ক'রে এই সত্য কথাই বা অনুভব করতে পারে কজন?

কথা বলতে বলতে আমরা এগিয়ে চলছিলাম। একসময় সেইখানে এলাম, যেখান থেকে আমার শৈশবের লীলাক্ষেত্র যে কালীঘাট, সেই কালীঘাটের গঙ্গা বা আদিগঙ্গার মুখ পেরিয়ে যাবার পর আমরা কথা শুরু করলাম। বললাম, —তোমার ছেলেকে বড়ো হলে কী করাবে, মকবুল?

মকবুল বললে,—উয়ার মায়ের ইচ্ছা মক্তবে-মাদ্রাসায় পড়াইয়া 'লায়েক' করবো। লেকিন আমার ইচ্ছা অন্যরকম। আপনেরে চুপি চুপি কই বাবু, পোলায় য্যান বড়ো হইয়া পদ্মা নদীর মাঝিই হয় আমার লাখান। এই গঙ্গারে পদ্মার লাখান বিশাল ভাইব্যা নাও চালাইবো! পয়সা জমাইয়া আমীর হইবো না, কিন্তু 'সুখ' পাইবো। এক ধরনের অন্তরের সুখ, যা মুখের

কথায় কইয়া বোঝান যায় না। আমীরগো তো দেখতে আছি, হরবখৎ হিংসা-হিংসি-রেষারেষি! পয়সা দিয়া যদি মনই না বড়ো হইল, তা অইলে আমীর হইয়া লাভ কী? নামেন বাবু ঘাটে আইয়া পড়ছি!

সাধারণ ঘাটের মাঝির কথাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। মকবুলের ছেলেটি সত্যিই ফুটফুটে হয়েছে, হাত বাড়ানো মাত্রই কোলে এলো। ওর হাতে একটি দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে একটু আদর করলাম। মকবুল বললে,—ও কী রুপিয়ার মর্ম বোঝে বাবু? ঐ দেখেন মুখের মধ্যে পুইরা দিতেছে? বসেন বাবু—একটু চা-পানি খান।

মকবুলের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে পড়লাম, তখন রাত হয়ে গেছে। খিদিরপুরে একটা ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে কালীঘাটে এলাম আমাদের বাসায়। খিদিরপুরে একটু সতর্ক ছিলাম হেড-অফিসের কারুর সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়।

তা অবশ্য হয় নি। রাতে বসে নবপরিণীতাকে সংক্ষিপ্ত পত্র দিলাম। লিখলাম, কলকাতায় কয়েকটা দিন দেরি হবে, কোনো ভাবনা-চিন্তা করো না। কাল বড়ো চিঠি দিচ্ছি।

কিন্তু পরের দিন জাহাজে উঠে আর সে-সব কথা মনে রইলো না। সেদিনও মকবুলের পানসী নিয়েছিলাম, কিন্তু বলেছিলাম, মকবুল ফিরে যাও। আজ জাহাজে আমার নেমন্তন্ন, রাতে জাহাজে থাকবো।

—আইচ্ছা, আদাব।

এর পরের দিন ভোরবেলা জাহাজ ছেড়ে গেল। এত ভোরে মকবুল কি এসেছে? আমি ডেকে দাঁড়িয়ে তীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, মকবুলকে দেখতে পেলাম না। অনেক মাঝি রাতে নৌকোতেই থাকে, কিন্তু মকবুল তার 'ফুটফুটে ছাওয়াল'-এর আকর্ষণে বাসায় না গিয়ে নৌকোয় রাত কাটাবে কেন?

যাইহোক, খুব ধীরে ধীরে জাহাজ চলতে লাগলো। একসময় জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকে বাঁক নিলো। গঙ্গার এই বাঁক থেকে কলকাতা শহরের এক অদ্ভুত রূপ চোখে পড়ে। বাড়ি-ঘর-দোর ছাড়িয়ে এক বিস্তৃত শ্যামলিমা। কী আশ্চর্য! কলকাতার বুকে গাছপালার অমন শ্যাম-সমারোহ!—বোধহয় চিড়িয়াখানা অঞ্চলের মহীরুহ-শীর্ষগুলোই অমন শ্যামল রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

আমি ডেক থেকে নড়তে চাইছিলাম না। গত দুই জাহাজে রেডিও-অফিসারের সঙ্গে খাতির বেশি জমেছিল বলে এখানে ঢুকেই রেডিও-অফিসারের খোঁজ করেছিলাম। দেশী জাহাজ, সর্বত্র দেশী মুখ, কিন্তু তার মধ্যে একেবারে যে একটি স্বজাতীয় বাঙালী মুখ আবিষ্কৃত হবে, তা ভাবতে পারিনি। মকবুলের ভাষায় দিব্যি 'শাঁসে-জলে' চেহারা, একটু খাটো ধরনের। কার্তিক মজুমদার। এই কার্তিকবাবু মহাশয় ডেক থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর অফিস-ঘরে প্রবিষ্ট করাবার বহু প্রয়াস করলেন, কিন্তু আমি

'জেমস-মেরী'-চড়া বা 'চোরাবালি' দর্শনের আশায় একটি চেয়ারে বসে রইলাম, আমাকে ওঠাবে সাধ্য কার? প্রাতরাশ পর্যন্ত এইখানে নিয়ে এসে শেষ করলাম, তবু ভিতরে যাই নি।

'জেমস-মেরী'-চোরাবালিতে ঠেকে বহু জাহাজের তৎক্ষণাৎ সলিল সমাধি হয়েছে বলে শুনেছি। সেজন্য বজবজের কাছ থেকে শুরু করে রূপনারায়ণের মুখ পর্যন্ত বিশেষ জরিপ করে বয়া বসিয়ে জাহাজের চলাচল ঠিক করা হয়, প্রায়ই 'ড্রেজিং' করতে হয়। দামোদর যেখানে গঙ্গায় বা ভাগীরথীতে এসে পড়েছে, সেখান থেকে রূপনারায়ণ পর্যন্ত এই ভয়াবহ চোরাবালির বিস্তৃতি। একে পাশ কাটিয়ে অতি সন্তর্পণে জাহাজকে চালিয়ে নিয়ে যান পাইলট-মহাশয়।

'জেমস-মেরী' যতই ভয়ঙ্করী হোক, তার ওপরের তীরভূমি কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর! দামোদরের খাতের দুপাশে গাছপালার সঙ্গে মাটির ওপরে পাতা সবুজ নরম ঘাসের আস্তরণের যে মোলায়েম রূপটি দেখা যায়, তা ভোলবার নয়। জননী জম্মভূমিকে সুন্দরী বলে প্রণাম করতে মন আপনিই নত হয়ে পড়ে। রূপনারায়ণের মুখে থেকে জাহাজ আবার বাঁক নিলো। এখান থেকে ধীর গতিতে চলে হুগলি পয়েণ্টে এসে পেঁছিতে কম সময় কাটলো না। এইখানে নোঙর ফেললো জাহাজ। বৈকালী ভোজন সমাপ্ত হবার পর জাহাজ চলবে, পাইলটও তারপর জাহাজকে সমুদ্রে পেঁছে দিয়ে তাঁর বোটে নেমে কলকাতায় ফিরে যাবেন।

রাত্রে, নিজের ঘরে বসে একরাশ কাগজপত্র টাইপ করে যখন অবসর পেলাম, তখন ঘাটশিলার কথাই বারবার মনে পড়তে লাগলো। নবপরিণীতা আমার অপেক্ষায় প্রহর গুণবে আর আমি কাউকে না জানিয়ে সমুদ্র-পথে পাড়ি জমালাম! বিছানায় শুয়ে মনটা খারাপ হতে লাগলো। কী দরকার ছিল এভাবে বেরিয়ে পড়ার? কী লাভ হলো এতে? ভালো লাগছিল না, উপায় থাকলে বোধহয় আমি তখন জাহাজ থেকে পালিয়ে যেতাম।

কিন্তু সকালে উঠে সমুদ্রের রূপ দেখে আর সে কষ্টের কথা মনে রইলো না। মনে হলো নীল অকাশটাকে কে যেন উপুড় করে দিয়েছে!

কার্তিক মজুমদার এলো। এবার আর তার ডাক উপেক্ষা করতে পারলাম না। তার কাছেই শুনলাম, জাহাজ সিংহল যাচ্ছে বটে, কিন্তু কলম্বো যাচ্ছে না, যাচ্ছে যে বন্দরে, তার নাম 'ত্রিন্-কো-মালো,' বা ইংরেজীতে "ট্রিনকোমাল্লী'। আমি যখনকার কথা লিখছি, সেই ১৯৪৮ সালেই সিংহল স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছিল। বন্দরের নামটা শুনে আমার প্রথমেই সেই কোকনদ-বন্দরে দেখা পোতরাজুর পালতোলা কাঠের ছোট্ট জাহাজের কথা মনে পড়েছিল। সেই জাহাজটিও তো সেবার 'ত্রিন্-কো-মাল্যে'র অভিমুখে রওনা হয়েছিল! কে জানে ওখানে তাদের সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়ে যেতে পারে!

কলকাতা থেকে জাহাজ কলম্বোর পথে মোটামুটি 'কোস্ট্-লাইন' বা তটরেখার কাছ দিয়ে চলে। অবশ্য কাছ দিয়ে মানে একেবারে কুল ঘেঁষে নয়,

কখনো জাহাজ থেকে দূরের তটরেখা দেখা যায়, কখনো বা দূরবীণ দিয়ে দেখতে হয়। জলের বর্ণনায় নূতনত্ব কিছু নেই, শুধু একটা লেখনীয় বিষয় আছে, সেটা নজরে পড়লো যথাক্রমে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মোহানা পেরিয়ে আসার পর। হঠাৎ মনে হলো, সমুদ্রের বিপুল একটা স্রোত যেন ভিতরে ঢুকে গেছে, তটরেখা চলে গেছে অনেক দূরে। শুধু তাই নয়, এখানকার জলও কালো, এবং গভীরতাও কম নয়। এই কালো স্রোতটাকে ডানদিকে অনেক দূরে রেখে জাহাজ জায়গাটা পার হতে লাগলো। জাহাজের আশেপাশে জল নীল, আকাশও নীল, শুধু দিগন্তে সাদা মেঘের বুকে একটু কালো আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু দূরবীণের সাহায্যে দেখা গেল, ডানদিকের দিগন্তের কাছে জল বেশ কালো। কার্তিকই এ-সব আমাকে দেখাচ্ছিল, বললে,—এই নিয়ে চারবার।

—চারবার মানে ?

কার্তিক বললে,—এইখান দিয়ে গেলুম—এই নিয়ে চার বার।

—সব সময়ই জল এইরকম কালো দেখেছিলেন ?

—হ্যাঁ,—কার্তিক বললে,—আমার ধারণা কী জানেন ? এইটিই কালীদহ, যেখানে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীমন্ত' কমলেকামিনী দর্শন করেছিল।

ওর কথায় আমি দূরবীণ চেয়ে নিয়ে আরেকবার ঐ কালীদহ ভালো করে দেখতে লাগলাম। কালো জলের রাশি, দিগন্তে কোনো স্থলচিহ্ন নেই। কিন্তু পরের দিন হঠাৎ দিগন্তে স্থলরেখা ফুটে উঠলো। কার্তিক খবরাখবর নিয়ে এসে জানালো,—'মাদ্রাজ' শহর ও বন্দর দেখা যাচ্ছে।

মাদ্রাজের পর পণ্ডিচেরী, তারপরে কুড্ডালোর, নেগাপত্তম,—এই সব দূর থেকে আভাষে বা দূরবীণে দেখা যায়। তারপরে জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে চলতে লাগলো। এই সময় আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামলো, হাওয়ার জোরও কম নয়, জাহাজ দুলতে লাগলো। রাত কাটলো ঐভাবে, কিন্তু ভোরে আবার সব শান্ত। দূরে নারিকেলকুঞ্জবেষ্টিত তটরেখা দেখা যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল, তটরেখার কাছাকাছি অংশ জুড়ে পালতোলা ছোট ছোট জেলেডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে বলে 'কাটামারণ'।

—আমরা কি ত্রিনকোমাল্যেতে এসে পড়লাম ?

কার্তিক জানালো,—না। আমরা 'জাফনা'র কাছাকাছি এসেছি। সিংহলের উত্তরতম অংশের নাম জাফনা। একটি আলাদা দ্বীপের মতো, মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে মাত্র দুই জায়গায় সরু স্থলরেখাদ্বারা যুক্ত, একটি সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে, অন্যটি একটু ভিতরের দিকে। এই শেষের অংশ দিয়েই রাজপথ এসে যুক্ত হয়েছে। তাকিয়ে দেখলাম, তটভূমি থেকে আরও 'কাটামারণ' বেরিয়ে সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ছে।

বললাম,—দেখে মনে হচ্ছে 'জাফনা' রীতিমত একটা মাছধরার বড়ো আড্ডা।

—না,—কার্তিক বললে,—তার থেকে বড়ো আড্ডা দেখতে পাবেন আর একটু পরে। সে-ও ছোটখাটো একটি বন্দর, নাম মুল্লাইটিভু।

কিন্তু 'মুল্লাইট্টিভু'র খুব কাছ ঘেঁষে জাহাজ গেল না, দূর থেকে দেখে সাধ মেটাতে হলো। ওখানে জেলে-নৌকো ছাড়া পালতোলা কাঠের সাবেকী ছোট জাহাজের ভিড়ই বেশি দেখলাম।

ত্রিনকোমাল্যোতেও ঐসব জাহাজের ভিড় ছিল। বন্দরটিকে 'প্রকৃতি-গঠিত বন্দর' বলা হয়ে থাকে। যেন সমুদ্র খানিকটা ভিতরে এসে অনেকটা চতুষ্কোণ সৃষ্টি করেছে। আমাদের জাহাজ যেখানে ভিড়লো, তার বিপরীত দিকে, চতুষ্কোণের একটি কোণায় একটি নদীর মোহানা দেখা যায়, ঐ নদীই সিংহলের প্রধানতম নদী—'মহাবলী গঙ্গা'—জাফনায় যেমন তামিলদের সংখ্যা বেশি, 'ত্রিনকোমালো'তে তা' নয়, এখানকার তামিল ও সিংহলীদের জনসংখ্যা প্রায় সমান-সমান। কার্তিক অনেকবার এসেছে, তাই খবরও রাখে। ও বললে, —এখানকার তামিলদের মধ্যেও আবার দুটো ভাগ আছে, একটা ভাগকে বলা হয় 'ভারতীয় তামিল', অন্য ভাগটিকে বলা হয় 'সিংহলী তামিল।'

—আপনি তো খোঁজ রাখেন খুব ?

কার্তিক বললে,—কোথায় রাখি ? এখানে এই সিংহলে এসেছি চার বার, জায়গাটা ভালো লেগেছিল, তাই সব খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম। অন্য জায়গার নাম বলুন, বিশেষ কিছুই বলতে পারবো না।

ত্রিনকোমাল্যোতে মাল ওঠানো-নামানোর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের যান্ত্রিক কিছু কাজ ছিল, যার সবটাই কলকাতায় করা যায় নি। সেই কাজের জন্য যে ঠিকাদার নিযুক্ত হয়েছিল, সেই ভদ্রলোক তরুণ-বয়সী, বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়, পিতৃ-ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়েছে আর কী! পিতা অফিস নিয়ে থাকেন, বাইরের যাবতীয় কাজ ছেলেই করে থাকে ঠিকা মিস্ত্রী বা ঠিকা শ্রমিকদের সাহায্য নিয়ে। এর নাম শঙ্করন, ইনি তামিল, কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ব্রাহ্মণ, মাছ-মাংস খান না। কাজের প্রথম দিনেই আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। মিস্ত্রীদের কাজে লাগিয়ে আমাদের ঘরে এসেই বসতো। এর কাছেই শুনলাম 'মহাবংশ' গ্রন্থের কথা, যে-গ্রন্থে সিরিলোন বা সিলোনের আদি ইতিহাস কিছু পাওয়া যায়। আজ 'সিরিলোন'-এর সঙ্গে 'কা' (দ্বীপ) জুড়ে (যার অর্থ হলো 'সিরিলোং' দ্বীপ) শ্রীলঙ্কা নাম হয়েছে, কিন্তু তখনো 'সিলোন' নামটা চালু ছিল। এর কাছেই শুনলাম, মহাবংশের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী, কিন্তু তাতে যা লেখা আছে তার ঘটনাকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৮৩ অব্দ থেকে শুরু হয়েছে। ঐ সালেই ভারত থেকে বিজয়সিংহ তাঁর সাতশো অনুচর নিয়ে এসে আদিবাসীদের হটিয়ে 'সিংহল'-এ (ভারতীয়দের দেওয়া নাম) রাজত্ব স্থাপন করেন। (এই সেই বিজয়সিংহ, যাঁকে বাংলার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'বাঙালী' আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন '—লঙ্কা করিয়া জয়। —') বিজয়সিংহ রাজা হয়ে বসবার পর দাক্ষিণাত্যের মাদুরায় লোক পাঠালেন উপযুক্ত বধূ সংগ্রহ ক'রে আনবার জন্য। (বাঙালী হলে বাংলায় লোক না পাঠিয়ে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতেন কী ?) এবং মাদুরা থেকে বিজয়সিংহের

বধূ বা রাণীই শুধু আসে নি, এসেছিল বহু সম্ভ্রান্ত মাদুরাবাসী, সঙ্গে সূত্রধর, স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পীর দল। বলা বাহুল্য, এরা সবাই তামিল। এর পরের ঘটনা ঘটে খৃষ্ঠ-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। রাজর্ষি সম্রাট অশোক তাঁর পুত্র-কন্যাকে পাঠালেন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে। এরই ফলে, জানা যায়, পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে উঠে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

শঙ্করনের কাছ থেকে আরও শুনেছিলাম, সিংহলী রাজাদের আদি রাজধানী ছিল অনুরাধাপুরে। এই অনুরাধাপুর ত্রিনকোমালো থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে মাত্র, দ্বীপের ভিতরের দিকে, এবং সিংহলের উত্তরাংশেই বটে, অর্থাৎ কলম্বো অথবা কাণ্ডির দিকে নয়। সে যুগের অনুরাধাপুরের রাজারা বৌদ্ধ-বিহার, বৌদ্ধ স্তূপ প্রভৃতি তৈরি করতেই ব্যস্ত ছিলেন, দেশরক্ষার কথাটা তত চিন্তা করেন নি। তার ফল হলো এই যে, দাক্ষিণাত্যের তামিল রাজারা সিংহল আক্রমণ করলেন। খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা এটা। আক্রমণের পর আক্রমণ করে তাঁরা চল্লিশ বছরের ওপর সিংহলকে নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। সিংহল থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করেছিলেন যে সিংহলী রাজা, তার নাম 'দুতুগেমুনু'। তারপরে অনুরাধাপুরের আর এক উল্লেখযোগ্য নরপতির নাম 'গজবাহু।' খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি একটি নৃত্যধারার প্রচলন করেন, তার নাম 'উদারানাটুম্', এখন যা বাইরের জগতে 'কাণ্ডিনাচ' বলে আখ্যাত হয়েছে। এই গজবাহু দক্ষিণ ভারতের চোলরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর দেশের পাট্টিনীদেবী বা দুর্গার পায়ের স্বর্ণ নূপুর বিজয়ীর স্বীকৃতি স্বরূপ নিয়ে আসেন। পাট্টিনীদেবীর মন্দির তৈরি করে তাঁর পূজার প্রচলন করেন। ঐ চোল রাজ্য থেকে তিনি কিছু সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী সঙ্গে করে এনেছিলেন। এদের চেষ্টায় ঐ নাচ সিংহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সিংহলে 'পোলোন্নারুয়া' বলে একটি জায়গা আছে, সেটিও ত্রিনকোমালো থেকে খুব দূরে নয়, ঐ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই হবে, তবে তা আরও দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এই 'পোলোন্নারুয়া'র রাজা বিজয়বাহু দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐ নাচকে বৌদ্ধধর্মের উৎসবগুলির অঙ্গীভূত করেন। তবে ঐ শতাব্দীতেই মহারাজা পরাক্রমবাহু এই নাচকে আরও ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন। ১২৯৪ সালে মার্কো পোলো চীন থেকে ফেরার পথে এই সিংহলে এসেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পনেরো শতাব্দী পর্যন্ত সিংহল বারবার বাইরের শক্তিদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কখনো ভারত থেকে, কখনো মালয় থেকে, কখনো বা সুদূর চীনদেশ থেকে। সিংহলের বিভিন্ন রাজাদের নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদই ছিল তাদের দুর্বলতার মূলে। এই দুর্বলতারই সুযোগ নিতো বাইরের শত্রু। সিংহলের রাজধানীরও তাই বদল হয়েছে বারবার, শেষপর্যন্ত ১৫০০ সালে রাজধানী সরে যায় 'কোট্টে'তে, কলম্বোর কাছে। ১৫০৫ সালে পর্তুগীজদের আবির্ভাব। তাদের আধিপত্যে সিংহলীদের দুর্দশার

সীমা ছিল না ! একদিকে 'কোট্টে'র দুর্বল রাজারা, অন্যদিকে পর্তুগীজ দস্যু —এই দুই উৎপাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে সিংহলীদের একটি দল দক্ষিণ সিংহলের পার্বত্য অঞ্চলে 'কাণ্ডি' রাজ্যের পত্তন করেছিল। পর্তুগীজরা উত্তর সিংহলের তামিল রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল বলা চলে। ১৬৩৮ থেকে ১৬৫৮ সালের মধ্যে ডাচেরা এসে পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিয়ে উপকূলবর্তী জায়গাগুলি দখল করে নেয়। একমাত্র কাণ্ডিই স্বাধীন থেকে যায়।

সিংহল ব্রিটিশদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল ১৭৯৮ সালে। কিন্তু কাণ্ডিরাজ্য দখল করতে তাদের সময় লেগেছিল। কাণ্ডি তাদের হাতে যায় ১৮১৫ সালে। এই কাণ্ডিদের কথা বলতে গিয়ে শঙ্করন বললে,—সিংহলে এসে এই কাণ্ডিনাচ যদি না-ই দেখলেন, তবে দেখলেন কী ?

—কী করে দেখবো ?

শঙ্করন বললে,—আমি দেখাবো। কালই চলুন আমার সঙ্গে। দিনের বেলায়—বিকেলের দিকে। শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ে যেতে হবে। গাঁয়ে আমাদের একটা 'ফার্ম-হাউস' আছে, সেখানে আমি ব্যবস্থা করবো।

—জাহাজের সবাইকে বলবো ?

শঙ্করন বললে,—না—না—তাহলে জমবে না। আপনারা দুজনই চলুন।

কার্তিক বললে,—আমরা কিন্তু মশাই নাচের বিশেষজ্ঞ নই। নাচের কলাকৌশল কিছুই বুঝবো না।

শঙ্করন একটু হেসে উত্তর দিলে,—তবু চলুন। আপনারা আমার বন্ধু হয়ে গেছেন, আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে আপনাদের নিয়ে যেতে পারলে খুব খুশি হবো।

—ক্যাপ্টেনকে নেবেন না ?

শঙ্করন বললে,—ব্যবসার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেনকে, চীফ অফিসার আর চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়িত করা উচিত। সেটা করবোই। তবে সেটা হবে আমাদের শহরের বাড়িতে। আমার বাবাও থাকবেন। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে অন্য ব্যাপার। সেখানে ব্যবসা নয়, নিছক বন্ধুত্ব।

পরদিন জাহাজে সকালের দিকে খুব খেটে আমার সব কাজ সেরে লাঞ্চের পরে বেরিয়ে পড়লাম শঙ্করনের সঙ্গে—আমি আর কার্তিক। ত্রিনকোমালো শহরের অংশ খুব যে বিস্তৃত, তা মনে হলো না, স্বাধীনতা প্রাপ্তি উৎসবের জন্য যে সব তোরণ তৈরি হয়েছিল পথের মোড়ে-মোড়ে, তার কিছু কিছু নিদর্শন তখনো নির্মূল হয়ে যায় নি। কোনো কোনো সংকীর্ণ পথের পাশে তালপাতার ঝুপড়ি দিয়ে তৈরি ছোট ছোট দোকান, তাতে মিঠাইয়ের স্তূপ সাজানো, আর বড়ো বড়ো ডাবের কাঁদি, ডাবের রঙ সবুজ নয়, হলদে ধরনের ! সিংহলী তরুণী লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে দোকানে বসে রয়েছে পসরা বিক্রি করার জন্য। গ্রামাঞ্চলে সবুজের সতেজ সমারোহ। আমাদের গাড়ি ঘুরে যখন এক বিস্তৃত জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখলাম জলে হাতিদের স্নান করানো

হচ্ছে। হাতিগুলো কিনার ঘেঁষে জলের ওপর শুয়ে আছে। তাদের অর্ধ-নিমজ্জিত শরীরের ওপর ডলাই-মলাই করছে মাহুতেরা, তীরে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি ও সাদা ব্লাউজ-পরা তরুণী মেয়েদের কেউ কেউ তা দেখছে, আবার কেউ কেউ জলে নেমে হাতিদেরই পাশে স্নান করছে।

এইখানে বলে রাখি, 'ত্রিনকোমাল্যে'-বন্দরের সঙ্গে আমার দেখা গ্রামের এই কাঁণ্ডি নাচের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কিন্তু ত্রিনকোমাল্যের স্মৃতির সঙ্গে এই নাচ বিজড়িত। বিশেষ করে 'সারিতা' নামক মেয়েটির নাচ কখনো ভুলবার নয়।

কাণ্ডি নাচ প্রধানতঃ পুরুষদের নাচ, এবং তাতে বীর রসেরই প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথও সিংহলে এসে এই কাণ্ডি নাচ দেখেছিলেন। সিংহলে তিনি এসেছিলেন তিনবার, কিন্তু কাণ্ডিনাচ দেখেছিলেন তৃতীয়বার, ১৯৩৮-এর মে মাসে। এই নাচ দেখেই তিনি লিখেছিলেন, 'নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন/আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন!'

মুক্ত আকাশের তলায় শঙ্করনদের পল্লী-আবাস-সংলগ্ন সবুজ ঘাসের ওপর ছয়জন মানুষ যেভাবে নৃত্যে মেতে উঠেছিল, তা দেখে কবিগুরুর কথাই মনে পড়েছিল,—'সিংহলে সেই দেখেছিলেম কাণ্ডিদলের নাচ/শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ/পেরিয়ে এলো মুক্তি মাতাল খ্যাপা!'

নাচিয়েদের কোমরে সাদা কাপড় লুঙ্গির আকারে পরা। কাপড়ের ওপরে জরির কাজ-করা চওড়া কোমরবন্ধ শক্ত করে আঁটা। বাজিয়েদের মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি, খালি গা, কোমরের কাছে লম্বা ধরনের ঢোলক বাঁধা, যাকে ওরা বলে 'বেড়ে'—এই বেড়ের তালে তালেই ওরা নাচে। নাচিয়েদের খালি গায়ের ওপর নানান নক্সার মালা গাঁথা। ওরা প্রথমে যে নাচ দেখালো, তার নাম 'নায়য়াণ্ডি'—হাত ও পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নানান দেহভঙ্গি,—কিন্তু ভঙ্গিমার মধ্যে প্রচণ্ড পৌরুষ ফুটে ওঠে, গতিচাঞ্চল্যও দেখবার মতো। এর পর গানের সঙ্গেও নাচ হলো। গানের ভাষা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শুনলাম, এর নাম হলো 'কিরলা' বা সাগর-পক্ষী। সাগর-পক্ষীর দুটি পাখা মেলে চঞ্চল হয়ে উড়ে বেড়ানো, কখনো নিচের দিকে তার নামবার ভঙ্গি, কখনো বা মুখ উঁচু করে ওপরের দিকে উড়ে যাবার মুদ্রা।

পুরুষদের নাচ শেষ হবার পর ঘরের ভিতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। তরুণী মেয়ে, তন্বী চেহারা, রঙ কালো হলেও চেহারায় লাবণ্য যেন উপচে পড়ছে! তারও পরণে সাদা লুঙ্গি, উর্ধাঙ্গে হাফহাতা চোলির ব্লাউজ, দু-হাতে সোনার কাঁকন, গলায় মুক্তোর মালা, কানে আর নাকে সাদা পাথরের দ্যুতিময় ফুল। হাতে মন্দিরা। জনৈক বাজিয়ের 'বেড়ে'-বাদ্যের তালে তালে সে মন্দিরা বাজিয়ে নাচতে আরম্ভ করলো। এই নাচের নাম 'নাগ-বনমা',—অর্থাৎ সাপিনী-নৃত্য। ধান-কাটার উৎসবে এই নাচ পরিবেশন করা হয়, কিম্বা গাঁয়ে কোনো রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব হলে এই নাচ নেচে সেই মহামারীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

মেয়েটি তার ছিপছিপে কালো শরীর নিয়ে অবিকল ফণা-তোলা সাপের মতো হেলে-দুলে নাচছিল। প্রথমে তার চোখে অপ্রসন্নতা, তারপরে ক্রোধ, দুঃসহ ক্রোধে সে যেন কাউকে ছোবল মারবার জন্য উদ্যত। তারপরে হঠাৎ তার ভাব বদলে গেল, সাপিনী যেন কোনো সাপের দেখা পেয়েছে! এইবার দেহ হিল্লোলে জাগলো তার দুর্নিবার উল্লাস, চোখে বিদ্যুৎ, মুখে হাসি। মাথার ওপরে দু-হাত একটুকু উঠিয়ে মন্দিরার দিকে হাসিমুখখানি তুলে মন্দিরা বাজিয়ে সে দুলে দুলে নাচতে লাগলো! আমরা নাচের কিছু বুঝি না, কিন্তু অপলক চোখে মুগ্ধ হয়ে তার নাচ দেখছিলাম। শঙ্করন জানালো, ওর নাম,—সারিতা।

নাচের শেষে বক্‌শিস-টকশিস নিয়ে নাচের দল চলে গেল, কিন্তু সারিতা গেল না। সে নাচ শেষ করেই চলে গেল ঘরের ভিতরে, বকশিস নিতেও সে এলো না। কার্তিক ততক্ষণে শঙ্করনের সঙ্গে গল্পে মেতে গেছে, কিন্তু এ-ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না। কৌতূহলও জাগলো। মেয়েটি তবে কে? মেয়েটি কি কাণ্ডি-দলের কেউ নয়? শঙ্করনকে সেই সময় জিজ্ঞাসা করা হলো না। কী জানি কী মনে করবে, তার থেকে নীরব হয়ে যাওয়াই ভালো। আমরা জলযোগে আপ্যায়িত হবার পর ফিরে এলাম। ছিপছিপে মেয়েটির অপূর্ব সাপিনী-নৃত্য তখনো চোখের সামনে ভাসছিল, আর মনে জাগছিল সেই প্রশ্ন,—মেয়েটি কে?

উত্তর পেলাম পরদিন সকালে। ব্রেকফাস্টের পর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখছি, বন্দরের ভিতরকার বিস্তৃত বারিরাশি আর 'মহাবলী গঙ্গা'র মোহানা অঞ্চলের নৈসর্গিক শোভা,—এমন সময় তার মিস্ত্রীদের কাজকর্ম দেখে ইঞ্জিনরুম থেকে উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো শঙ্করন। পারস্পরিক অভিবাদনের পালা শেষ হওয়ায় সে বললে,—একা দেখছি? আপনার বন্ধু কই?

—সে এখন তার কাজে ব্যস্ত। কাল আমাদের জাহাজ ছাড়বে কি না!

শঙ্করন বললে,—তা তো জানি। আজ আমার কাজ শেষ করতেই হবে। অবশ্য কোনো ভাবনা নেই, কাজ ভালোই এগোচ্ছে দেখে এলাম।

বলতে বলতে আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললে,—ফ্রি আছেন? যাবেন নাকি আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

বললে,—যেদিকে তাকিয়েছিলেন, ঐ দিকেই যাবো—ঐ মহাবলী গঙ্গার দিকে।

—কী করে?

—আমার ছোট লঞ্চ আছে, যাকে বলে 'এম-এল'। যুদ্ধ শেষ হবার পর আমার বাবা 'ডিসপোজাল' থেকে কিনেছিলেন।

—তাহলে চলুন।

শঙ্করনদের খুদে লঞ্চটাকে আমাদের জাহাজ থেকে দেখা যায় নি, জেটির

প্রান্তে ওটা বাঁধা প'ড়ে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। লঞ্চে পা দিয়ে কিন্তু চমকে গেলাম। কালো ব্লাউজের ওপর পাতলা সাদা শাড়ি পরে বেঞ্চে বসেছিল সারিতা, আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালো, করজোড়ে আমাকে নমস্কার জানালো।

একটি বেঁটে মতন খাকি পোষাক-পরা লোক খুদে 'এম-এল' বা মোটর লঞ্চটা চালাচ্ছিল, সে ছাড়া মেয়েটি বাদে আর কেউ লঞ্চে ছিল না, আমরা দুজনে লঞ্চে গিয়ে উঠতেই লঞ্চটা ছেড়ে দিলো। মুখ ঘুরিয়ে লঞ্চটা বিস্তৃত দরিয়া পার হতে লাগলো, তার লক্ষ্য বোধহয় মহাবলী গঙ্গার মোহানা।

বললুম,—মিঃ শঙ্করন আমি কিন্তু কিছুই বুঝছি না! এঁকে নিয়ে—

শঙ্করন একটু হেসে উত্তর দিলো,—এর বড়ো সাধ, বন্দর দেখবে। কয়েকটা জাহাজ আর জল ছাড়া কী দেখবে বলুন তো? নদীর মোহানার কাছে একটা 'ফ্লোটিং ডক' আছে, তার ট্যাঙ্ক-ক্লিনিং, ড্রাই-ডকিং,—প্রভৃতি কাজ পেয়েছি আমরা। আপনাদের জাহাজ কাল চলে গেলেই এই কাজটা শুরু করবো। ভাবলাম, মন্দ নয়, এ একটা নতুন জিনিস, ও দেখে আনন্দ পাবে।

—কী বললেন? ফ্লোটিং ডক?

—হ্যাঁ। গত যুদ্ধে ওটাকে ক্যাপচার করা হয়েছিল,—শঙ্করন বললে,—জার্মানদের তৈরি। এবার ওটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে শুনছি আপনাদের ভাইজাগ-পোর্টে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে।

'ভাইজাগ-পোর্ট" শুনে চকিত হয়ে উঠলাম। শঙ্করন বলতে লাগলো,—সারিতাকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল, ও হিন্দীও জানে না, ইংরেজীও জানে না। আমাদের কথা শুনে ও কিছুই বুঝছে না, কিন্তু জানবার আগ্রহ ওর খুব। এই দেখুন না, 'ফ্লোটিং-ডক'-এর কাণ্ডকারখানা যখন বললাম, তখন ও-তো 'হাঁ' হয়ে গেল! বললে,—সমুদ্রে ভাঙা বা জখমী জাহাজ বুকে নিয়ে 'ডক'টা জেগে উঠলো, সে কী কথা!

বললাম,—উনি কেন, আমিও কিছু জানি না, 'ফ্লোটিং-ডক দেখিনি কখনো।

শঙ্করন বললে,—কজনেই বা দেখেছে! প্রকাণ্ড ডক। দুপাশে দুটো সরু দেওয়ালের মতো উঠেছে, মাঝখানে বিরাট মেঝে বা পাটাতন। ওটা ডুবতে পারে। ডুবে জাহাজটাকে পাটাতনের ওপর বসিয়ে আবার ভেসে উঠবে। তখন ঐ জখমী জাহাজটার নিচে-ওপরে যেখানে খুশি মেরামত করে নেওয়া যায়। আর মনে রাখবেন, সবটাই ঘটে যাবে সমুদ্রের বুকে।

বোধহয় ঘণ্টা খানেকেরও বেশি সময় লাগলো মোহানার কাছে যেতে। এরই এক পাশে—মোহানা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে সমুদ্রের বারিরাশিরই কিনারে—একটি কাঠের জেটি, সেই জেটির সঙ্গে সংলগ্ন বিরাট ফ্লোটিং ডক্‌টা দাঁড়িয়ে আছে। 'ডক'টি' এখনো ইংরেজদের অধিকারে, তাই ফ্লাগস্টাফে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। শঙ্করন ঠিকই বলেছিল, মাঝখানে বিশাল লৌহনির্মিত পাটাতন, পাটাতনের নিচে ফাঁপা ট্যাঙ্ক আছে, যাতে পানীয় জল ধরা থাকে।

যতখানি পাটাতন, ততখানিই ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের ভিতরে খোপ করা। সেই খোপের ভিতরগুলো পরিষ্কার করার কাজ নিয়েছে শঙ্করন। সারিতার কাছে সবই নতুন, সে অবাক হয়ে সব-কিছু দেখছিল। পাটাতনের দুপাশে দোতলা-সমান উঁচু দুটো দেওয়াল উঠে গেছে। দেওয়ালগুলো আট-ফুটের মত চওড়া, ভিতরে ফাঁপা। এই ফাঁপা জায়গাগুলিতেই কোথাও ইঞ্জিনরুম, কোথাও বয়লার, কোথাও লোকজনদের থাকবার মতো কেবিন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে 'ব্লাইডক'-এর কম্যান্ডিং অফিসার ব্রিটিশ নেভীর লেফ্‌ট্যানান্ট কম্যান্ডার মিঃ লক্‌হার্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। চল্লিশের মতো বয়স, সুগঠিত, লম্বা-চেহারা, রীতিমত সুপুরুষ। সরু মতন দুটি কেবিন, পাশাপাশি। একটি শয়ন কক্ষ, অন্যটি তাঁর অফিস। ব্লু শর্টস আর সাদা জামা প'রে ব'সে কাজ করছিলেন। শঙ্করন যে এই সময় আসবে, এ খবরটা তাঁর জানা ছিল। তাই শঙ্করন বা তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখে অবাক হলেন না, ঠিকাদার মানুষ, সঙ্গে লোক থাকতেই পারে। কিন্তু বিস্মিত হলেন সারিতাকে দেখে। আমাদের সঙ্গে সম্ভাষণ শেষ করে নিচু গলায় শঙ্করনকে বললেন, হু ইজ শী? এ-রিয়্যাল ব্ল্যাক কুইন।

শঙ্করন বললে,—দিস ইজ দি গার্ল অফ হুম আই টক্‌ট্‌ টু ইউ দি আদার ডে।

—আই সি! —বলে মিঃ লকহার্ট মেয়েটির দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালেন। তারপরে ওদের ভাষায় কী যেন বললেন, তাই শুনে মেয়েটির মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো, সে অল্প একটু হেসে মুখ নিচু করলো।

লকহার্ট বললেন,—কুইন লাইক স্মাইল্‌ ইনডিড!

বলে আবার ওদের ভাষায় কী বললেন। মেয়েটি মুখ নিচু করা অবস্থাতেই হেসে ফেললো, কিছু বললো না। শঙ্করনও মজা পেয়ে হাসছিল। লকহার্ট আমাকে এবার বললেন,—ডু ইউ নো হোয়াট আই সেইড? পার্ললাইক টিথ্‌? অ্যান্ড সি? শী ইজ ব্লাশিং!

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটিকেই বা শঙ্করন কেবিনে আনলো কেন, আর সাহেবই বা তাকে নিয়ে এমন রসিকতা আরম্ভ করলেন কেন?

যাই হোক, একটু পরে সাহেবের উর্দি-পরা বেয়ারা আমাদের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে এলো। সারিতা চায়ে চুমুক দিতে লজ্জা পাচ্ছে দেখে সাহেব ওদের ভাষায় আবার কী যেন রসিকতা করলেন। শঙ্করন হেসে উঠলো, মেয়েটি লজ্জায় আরও নুয়ে পড়লো।

মেয়েটির অমন ভঙ্গি দেখে আমারও কেন যেন আমার সেই ফেলে-আসা নব-পরিণীতার মুখখানা মনে পড়লো! জাহাজে ওঠবার পর চিঠি দেওয়া হয় নি। চিঠি দেবোই বা কী করে? এই ত্রিনকোমালোতে চিঠি ডাকে দেওয়া যায়, কিন্তু কবে পৌঁছবে কে জানে?

এইসব সাতপাঁচ ভাবছি আর চায়ে চুমুক দিচ্ছি, ওদের রসিকতায় একটু কান দিচ্ছি, আবার দিচ্ছি না। সিংহল থেকে চিঠি গেলে নবপরিণীতা কী ভাববে? হয়ত কলকাতায় মাকে চিঠি দিয়ে বসবে! ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে কাঠি পড়বে,—হেড অফিস থেকে ভাইজাগ পর্যন্ত হৈ-চৈ পড়ে যাবে!

এই সময় লকহার্ট সাহেব উঠলেন, তাঁকে ইঞ্জিনরুমের দিকে যেতে হবে, বোধহয় আগে থাকতেই এ-ব্যবস্থা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও তাঁর সহগামী হতে হলো। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা জেটি পার হয়ে তীরে এলাম। কিন্তু আমাদের সেই লঞ্চটা কোথায়? শঙ্করন বললে,—লঞ্চ আমাদের ছেড়ে দিয়েই চলে গেছে।

—তাহলে?

শঙ্করন মাটির দিকে নির্দেশ করলো। একটু ওপরে, জলের ওপর বড়ো বড়ো গাছপালা ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে, তার নিচে শঙ্করনদের সেই ছোট গাড়িটা অপেক্ষা করছে, আমাদের চেনা ড্রাইভার! শঙ্করন আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল, বললে, চলুন স্যার আমাদের ফার্মে—সারিতাকে পেঁাছে দিতে হবে না?

—দেরি হয়ে যাবে না?

শঙ্করন বললে,—না—না—আপনাকে ঠিক সময়ে পেঁাছে দেবো।

সারিতার মুখের দিকে এই সময় চোখ পড়লো। সে আমাদের ভাষা বোঝে না, কিন্তু তার চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আর অধরের মৃদু হাসি আমাকে বুঝিয়ে দিলো, সঙ্গে আমি গেলে সে খুশিই হবে।

এই দিন ক্যাণ্ডিনাচ ছিল না। ওদের ফার্মে দু-একটি লোক ছাড়া কেউ ছিল না। সারিতা গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ছুটেই ঘরে চলে গেল। যেন খাঁচার পাখী তার চেনা খাঁচাটিতে গিয়েই নিশ্চিন্ত বোধ করলো।

বসবার ঘরে এসে দুজনে বসলাম। সিগারেট ধরিয়ে ধূমোদগীরণ করতে করতে শঙ্করন বললে,— আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না,—না?

ওর দিকে তাকালাম। শঙ্করন বললে,—সাহেবকে সব বলেছিলাম। তাই সে অমন রসিকতা করছিল। যাকে বলে, নির্দোষ রসিকতা! এইবার তাহলে সবটা শুনুন। সারিতা ততক্ষণ চা করুক, আমরা আমাদের কথাবার্তা সেরে নেই। ক্যাণ্ডিনাচ তো দেখলেন? পর্তুগীজদের অত্যাচারে এই নাচ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঐ যে বলেছিলাম ক্যাণ্ডির কথা? নাচিয়েদের একটি দল গিয়ে ঐ ক্যাণ্ডিতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই নাচকে তারা প্রাণের টানে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারা বাঁচালেও এই নাচ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সম্প্রদায়কেই বলা হয় বেরোয়া। অনেক কাল পরে দ্বিতীয় বিমলধর্মসূর্য যখন ভগবান তথাগতের দন্ত-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন উৎসবে অংশ নেবার জন্য ঐ নাচিয়েরা এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাচের পুনরুত্থান ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা কীর্তিশ্রীর আমলে। কিন্তু কীর্তিশ্রীর পরে আবার এই মহিমা অস্তগামী হলো। জনসাধারণের মধ্যে এর প্রসার রুদ্ধ হয়ে

যাওয়ায় সবার ধারণা হতে লাগলো, এই সব নাচ বেরোয়াদেরই নাচ। বেরোয়াদের তখন লোকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতে আরম্ভ করেছিল। এইবার আসল কথায় আসি। এই বেরোয়া-জাতের মেয়ে হচ্ছে সারিতা। আমি তামিল ব্রাহ্মণ, কিন্তু সারিতা শুধু সিংহলীই নয়, সিংহলীদের মধ্যেও নিচু জাত। আমাদের চোখে অচ্ছুতই বলতে পারেন। আমি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে গিয়ে এই সারিতার ঐ নাগিনী নৃত্য দেখি। দেখে অভিভুত হই। টাকার জোর আছে, তাই জনবলও আছে। আমি ওকে কাছে পেতে চাই, ও রাজী হয় না। বারবার কান্ডী গিয়ে কিছুতেই ওর মন টলাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত এক দুসাহসিক কাজ করলাম। রামায়ণের 'রাবণ' যেমন 'সীতা'কে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল, আমি তেমনি করে ওকে নিয়ে এসেছি। বাবার শাসনে নিজেদের বাড়িতে রাখবার জো নেই, তাই এই গাঁয়ের বাড়িতে এনে রেখেছি। জানেন তো এখানে সিংহলীদের সঙ্গে তামিলদের বিরোধ লেগেই আছে? সেই বিরোধ এখন তুঙ্গে। কারণ, এযাবৎ সিংহলের রাষ্ট্রভাষা ছিল ইংরেজী, কিন্তু এখন হয়েছে 'সিংহলী',—ফলে তামিলরা চটে গেছে। তারা 'তামিল' ভাষারও সমান স্বীকৃতি চায়। এই রকম অবস্থায় আমি নিজে তামিল সন্তান হয়ে সিংহলী বালিকাকে নিয়ে এসেছি, সুতরাং হৈ-চৈ—থানা-পুলিশ—যা হবার সবই হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে ঐ সারিতা। এদিকে অনিচ্ছায় ধরে আনার জন্য সমানে কাঁদছিল, খাচ্ছিল না, দাচ্ছিল না, সে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি,—কিন্তু সেই মেয়েটি প্রয়োজনের সময় চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েতের সামনে সাক্ষ্য দিলো, সে সাবালিকা, এবং নিজের ইচ্ছেতেই আমার কাছে চলে এসেছে, আমাকে সে ভালোবাসে। আমি কিন্তু স্যার, অবাক হয়েছিলাম। আমি ওকে রক্ষিতা হিসাবে পেতে চেয়েছিলাম মাত্র, অন্য কিছু নয়। কিন্তু এ-কথা শোনবার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। আমি ওর কোনো ক্ষতি করি নি। এবং করবোও না। বাবা আমাকে ত্যজপুত্র করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন, কিন্তু আমি ওকে ফেলবো কী করে? আমি ওকে বিয়ে করবো। বিয়ে করবো আগামী বৈশাখী পুর্ণিমার পুণ্যলগ্নে। যত বাধাই আসুক, এ সংকল্প থেকে আমাকে কেউ টলাতে পারবে না।

ঠিক এই সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো সারিতা। কাপড় বদলে পরে এলো একটি গোলাপী শাড়ি, উর্ধাঙ্গের ব্লাউজ গাঢ় মেরুন রঙের। দুই ভুরুর মাঝখানে সিঁদুরের টিপ। আমি ওর দিকে তাকালাম। তারপরে শঙ্করনকে বললাম,—তুমি ওকে তোমাদের ভাষায় বলো, তোমাদের সব কথা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। অভিনন্দন!

শঙ্করন ওকে কথাগুলো ওদের ভাষায় বলতে ভীষণ লজ্জা পেয়ে এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে তারপর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সারিতা। বিদায় নেবার সময় আমার হয়ে শঙ্করন কতো ডাকাডাকি করলো, কিন্তু কিছুতেই আমার সামনে আর বার হলো না!

'ত্রিনকোমালো'র স্মৃতি আমার এইটুকুই। একদিকে মহাবলীগঙ্গার মোহানার দৃশ্য, আর একদিকে সারিতার সর্পিণী নৃত্য—এই দুই মিলিয়ে ত্রিনকোমালো আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে! আজও দেখছি কোনো কথা ভুলি নি। জাহাজে এসে রাত্রে বসে বসে নবপরিণীতাকে সারিতার কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে চিঠি আর পাইলটের হাতে ডাকে ফেলার জন্য দিতে পারি নি। ভাবলাম, দেখা যাক পরবর্তী বন্দরে গিয়ে একাজ করা যায় কি না! কার্তিকের কাছে শুনলাম, পরবর্তী বন্দর—মরিশাস!

॥ ১৪ ॥

'ত্রিনকোমালো'র পর আমরা সিংহল-দ্বীপটাকে যেন প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছিলাম। কখনো তীরের কাছাকাছি আসছি, কখনো দূরে যাচ্ছি, এমনি করে করে 'মাতারা' বলে সিংহলের একটি দক্ষিণ বিন্দুকে প্রায় ছুঁয়ে জাহাজ ক্যাপ্টেন দুধওয়ালার নির্দেশে মুখ ঘুরিয়ে গভীর সমুদ্রে ভেসে পড়লো। আমরা আশা করেছিলাম 'কলম্বো' দেখতে পাবো, কিন্তু তা আর হলো না। জাহাজ এরপরে ডানদিকে মালদ্বীপকে রেখে ক্রমাগত এগিয়ে চলতে লাগলো। প্রসঙ্গত একটা কথা আমার আগেই বলা উচিত ছিল, সিংহল যখন ছুঁয়েছিলাম, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল ভারত মহাসাগর।

যাই হোক, দেখতে দেখতে আমরা বিষুবরেখা পার হয়ে গেলাম। তারপরে এলো চাগোস দ্বীপপুঞ্জ। এখানে আমরা থামি নি, জাহাজ ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে কোণাকুনি পাড়ি দিতে লাগলো। এইরকম করে একদিন আমরা এসে পেঁছিলাম 'মরিশাস' দ্বীপে। সারাটা পথ আসতে লেগেছিল (স্মৃতি থেকে বলছি) যতদূর মনে পড়ে, ন-দিন। এবং এই ন-দিন ঝড়-ঝাপটা-বৃষ্টি সবই ভোগ করেছিলাম, তবে তা জাহাজের পক্ষে মারাত্মক হয় নি। ক্যাপ্টেন দুধওয়ালা বলেছিলেন,—এ জাহাজের পুরোনো বৃত্তান্ত যা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে, এ খুব পোড়-খাওয়া মাল, বহুৎ ধাক্কাধুক্কি সহ্য করেছে, সহজে কাবু হবে না!

তারপরে একটু হেসে মন্তব্য করেছিলেন,—ঘাবড়ে যেয়ো না, এ সময় এদিকে একটু-আধটু সাইক্লোন-টাইক্লোন হয়েই থাকে!

তা সাইক্লোন বা ঝড়ঝঞ্ঝা সমুদ্রে যা-ই হোক, আমার মনের মধ্যে তুফানের আলোড়ন কম ছিল না! যাকে ঘাটশিলায় রেখে হঠাৎ-ই চলে এসেছি, তার জন্য এই সাতদিন মন খুব খারাপ হয়েছিল। সেইজন্য বোধহয় এবারের এই জলযাত্রা আমার মোটেই ভালো লাগে নি। সঙ্গে একখানা ছবি থাকলে মন্দ হতো না, কিন্তু হুড়োহুড়ি করে চলে আসার দরুন ওসব সংগ্রহ করা হয় নি, বা সংগ্রহ করার কথা মনেও হয় নি। কিন্তু আমার একান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলো এখন থাক।

যেখানে ২০ ডিগ্রি দক্ষিণ দ্রাঘিমা রেখা ৬০ ডিগ্রি পূর্ব-অক্ষরেখার সঙ্গে এসে মিশেছে, তার পশ্চিমে একটু এগিয়ে গিয়েই আমরা 'মরিশাস' দ্বীপের উত্তর অংশে পৌঁছলাম। দূর থেকে মরিশাসের প্রধান শহর 'পোর্ট লুইস' বা 'পোর্ত লুই' (বা 'পরলুই' কে) ডুবো পাহাড়ের চুড়ো বলে মনে হচ্ছিল, একটু কাছাকাছি হতেই দেখা গেল, পাহাড়ের পাদদেশে সমতলভুমি জুড়ে শহরটার মূল অংশ গড়ে উঠেছে। দুধওয়ালা আগেই এসেছিলেন এসব দিকে। তিনি জানালেন, নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি থেকেই 'মরিশাস' বা মরিশাসের প্রতিবেশী 'রি-ইউনিয়ন'-দ্বীপের সৃষ্টি। 'পোর্তলুই' বিরাজ করছে মরিশাস দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে।

আমরা রাত্রে পেঁছেছিলাম বলে বন্দরের বাইরে নোঙর ফেলে আমাদের থাকতে হয়েছিল। এখান থেকে 'পোর্তলুই'-এর দৃশ্য যা চোখে পড়ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল, দার্জিলিঙের ওপর দিকের কোনো অংশে বসে সমান্তরালভাবে তাকালে অপর অংশ রাত্রিকালে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। তেমনি ক্রমান্বয়ে উঁচু-হয়ে-যাওয়া পাহাড় আর ঘরবাড়ি। ঘরবাড়ির আলোগুলো দেখে মনে হচ্ছে বনান্তরাল থেকে যেন একরাশ জোনাকি উঁকি দিচ্ছে!

এইখানে একটা কথা বলে রাখি, মরিশাস স্বাধীনতা পেয়েছিল ১৯৬৮ সালের ১২ই মার্চ তারিখে। কিন্তু আমি গিয়েছিলাম তারও অনেক আগে, ১৯৪৪ এর শেষের দিকে। পরদিন ভোরে নোঙর উঠিয়ে বন্দরে গিয়ে জাহাজ জেটিতে বাঁধা পড়বার মুহূর্তে কিন্তু শহরটাকে বেশ ছিমছাম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ছেলেবেলায় শোনা সেই 'মরিচ শহর'—যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের কলকাতা থেকেই 'দাস' চালান আসতো। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও তার জের চলেছিল। পরে 'দাস' হিসাবে না হলেও 'ঠিকা শ্রমিক' হিসাবে বহু লোক চালান হয়ে এসেছে এখানে। বোধহয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এসেছে, নইলে সাধারণ মজদুরদের মধ্যে 'মরিচ শহর' কথাটার অতো প্রচলন থাকতো না কলকাতা শহরে। তাছাড়া আরও একটা কারণে 'মরিশাস' আমাদের কাছে খানিকটা পরিচিত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। তাঁর বাল্যকালে প্রচলিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় তিনি পড়েছিলেন এই মরিশাসের পটভুমিকায় লেখা একটি কাহিনী 'পোল-বর্জিনী'। তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখে গেছেন,—'এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল-চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জন্মিয়াছিল!'

প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়াইন মরিশাসে এসেছিলেন ১৮৯৬

সালে। তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে তিনি লিখে গেছেন,—'দেখা যাচ্ছে মরিশাসের ইতিহাসে একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ছিল, যা কিনা প্রকৃতপক্ষে ঘটেই নি। আমি বলছি এখানকার 'পল' ও 'ভার্জিনিয়া'র মধুর রসাত্মক আবির্ভাবের কথা। এই কাহিনীই মরিশাসকে সারা বিশ্বে পরিচিত করেছে, সবাই জেনেছে শুধু এর নাম, এর ভৌগোলিক অবস্থানের কথা নয়।'

•এখানে যাঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, সেই রামজী শর্মা আমাকে বলেছিলেন, এখানকার লোকেরা পড়েছে শুধু বাইবেল আর 'পল ও ভার্জিনিয়া' নামের উপন্যাসটি। আর কিছু নয়। এখন আমাদের লোকেরা তুলসীদাসজীর 'রামচরিত মানস' পড়ে বা তার পাঠ শোনে, 'পল ও ভার্জিনিয়া'র পাশাপাশি এখন 'রাম-সীতা' খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে, তা-ও আমাদের মধ্যে যতটা, ততটা অন্যদের মধ্যে নয়।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'পোল' বা 'পল' এবং 'বর্জিনী' বা 'ভার্জিনিয়া', এদের দুজনেরই মূল জীবনকাহিনীর পটভূমিকা এই মরিশাস। আর এদের দুজনের সঙ্গে আরও একজনের নাম অক্ষয় হয়ে আছে, তিনি তখনকার ফরাসী গভর্ণর জেনারেল 'লাবোরদনে'। ছোটবেলায় একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিল পল ও ভার্জিনিয়া। পরে, তাদের যৌবনকালে, তাদের এই মেশামেশি পরিণতি লাভ করে গভীর প্রেমে। কিন্তু সব বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনীর যে পরিণতি হয়, এই কাহিনীরও তাই হয়েছিল। এদের মিলন যাদের কাছে অভিপ্রেত ছিল না, তারা ভার্জিনিয়াকে কৌশলে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভার্জিনিয়া পলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে 'সেন্‌ত্‌ জের়াঁ' জাহাজে করে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে 'ইল-দ্য-ফ্রাঁস' বা 'মরিশাস'-এ ফিরে আসছিল। দ্বীপের কাছাকাছি এসে ঝড়ের কোপে প'ড়ে জাহাজ ডুবে যায়। ভার্জিনিয়ার দেহটা জলে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পড়ে বটে, কিন্তু সে কোন্‌ ভার্জিনিয়া? তাকে দেখে পল হাহাকার করে ওঠে! ভার্জিনিয়ার নিস্পন্দ মরদেহটা শুধু প'ড়ে আছে, তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেছে অনেক—অনেক দূরে!

'সেন্‌ত্‌ জেরাঁ'-জাহাজটির ডুবে যাওয়ার ঘটনাটা অসত্য নয়। যাত্রীদের মধ্যে বেঁচেছিল মাত্র নয়জন। জাহাজের নাবিকরা যাত্রীদের বাঁচাতে, বিশেষ করে দুটি তরুণীকে বাঁচাতে যেভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, তার বিবরণ শুনেছিলেন তখনকার একজন ফরাসী লেখক 'বার্নারিদ্যাঁ দে সাঁপিয়্যার'। তারই ফলশ্রুতি হলো তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পল ও ভার্জিনিয়া',—পোলবর্জিনী নামে যে-লেখাটির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন 'অবোধবন্ধু'তে।

গভর্ণর জেনারেল লাবোরদনে পল ও ভার্জিনিয়াকে খুবই স্নেহ করতেন বলে তাঁর উপন্যাসে লিখে গেছেন লেখক। এই লাবোরদনে-সাহেব মরিশাসের গভর্ণর-জেনারেল হয়ে এসেছিলেন ১৭৩৫ সালে। তিনিই তখনকার রাজধানী 'পোর্ট নর্থ-ওয়েস্ট'-এর নাম বদলে 'পোর্ত লুই' বা 'পোর্তো লুই' বা 'পর লুই' রেখেছিলেন।

এই পোর্তো লুইতে হিন্দুদের একটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি গোলাকার, চারদিকে কাঁচের জানালা দিয়ে ঘেরা, মাথায় টিন ছিল না টালি ছিল, এখন মনে করতে পারছি না। রামজী শর্মার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এখানে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই, তিনি বাঙালী। তিনি 'রামচরিত মানস' ও যেমন পড়েছেন, 'পল-ভার্জিনিয়া'ও তেমন পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ইতিহাসও।

লাবোরদনের কথাও এ'র কাছ থেকে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন (তাঁর নাম ভবেশানন্দ), আসল কথা কী জানেন? (এটি তাঁর কথার মাত্রা, শুনতে সেদিন খুব ভালো লেগেছিল),—এই যে দ্বীপ দেখছেন, এর উন্নতি কার জন্য? ঐ লোকটির জন্য। ঐ লাবোরদনে সাহেব। অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করে গেছেন এই দ্বীপের জন্য। তাঁকেই মরিশাসের স্থাপন-কর্তা বলা যেতে পারে। এখানকার যা-কিছু বাড়বাড়ন্ত পরে হয়েছে, সব তাঁর জন্য। সে কি আজকের কথা? দুটি সন্তান ছিল তাঁর। সে-দুটিকে পর পর তাদের শিশুবয়সেই তিনি হারালেন ১৭৩৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে। আর মে-মাসে হারালেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে। এ কী প্রচণ্ড আঘাত, বলুন তো দেখি? কিন্তু এখানেই তাঁর দুঃখকষ্টের শেষ হলো না! ১৭৩৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি ছুটি নিয়ে রওনা হলেন ফ্রান্সের পথে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ফ্রান্সে পেঁছে কর্তাদের কাছ থেকে তিনি পেলেন যার পর নাই দুর্ব্যবহার—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের ফল ছাড়া এ আর কিছুই নয়। ১৭৪১ সালের আগস্টে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হলো মরিশাসে। এর পরে আসে ১৭৪৬ সালের কথা। এই সালের মার্চে তাঁকে যেতে হয়েছিল ভারতবর্ষে এক জরুরী নির্দেশ পেয়ে। ঐ সময় ভারতে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। যুদ্ধে তাঁর মতো রণকুশল ব্যক্তিকেই দরকার,—সেজন্যই তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি এসে উঠেছিলেন পণ্ডিচেরীতে। ভারতে, তখনকার ফরাসীদের কর্তা ছিলেন দুপ্লে। ভারতের ইতিহাসে সেইযুগে ইংরেজদের রবার্ট ক্লাইভ, আর ফরাসীদের দুপ্লে,—এই দুটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ নাম। কিন্তু আসল কথা কী জানেন? ক্ষমতা আর খ্যাতি বড়ো সর্বনেশে জিনিস, সবসময় ভয় থাকে এই বুঝি সব হারালাম, এই বুঝি অন্য কেউ এসে আসন কেড়ে নিলো! দুপ্লেরও হয়েছিল তাই। লাবোরদনেকে তিনি প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারছিলেন না। সাধারণ—অতি তুচ্ছ একটা অছিলা খুঁজে নিয়ে তিনি রাগে অন্ধ হয়ে লাবোরদনেকে হঠাৎ-ই একসময় মরিশাসে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। এই কাজটা সে-সময় দুপ্লে যদি না করতেন, তাহলে ঘটনা অন্যরকম হতো। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, দুপ্লের এটা হয়েছিল মারাত্মক ভুল। লাবোরদনে কাছে থাকলে দুই মহারথীর মিলিত শৌর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করতে পারতো। তা সে যা-ই হোক, লাবোরদনে ভারত থেকে মরিশাসে পেঁছে দেখলেন, তিনি আর গভর্ণর জেনারেল নেই, তাঁর বদলে সরকার চালাচ্ছেন অন্য লোক, বার্থেলমি ডেভিড।

এই ডেভিড মরিশাসে এসেছেন শুধু শাসনকার্য চালাবার জন্যই নয়। তাঁর পকেটে আছে ফরাসী সরকারের হুকুমনামা,—লাবোরদনেকে গ্রেপ্তার করো। গ্রেপ্তার ক'রে অবিলম্বে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু আসল কথা কী জানেন? এই ডেভিড ছিলেন ভদ্রলোক। তিনি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন, লাবোরদনে কোনো অপরাধেই অপরাধী নন। সত্যিকার একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, ভালোমানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে কিছু স্বার্থান্বেষী ঈর্ষাতুর লোক। এটা বুঝতে পেরে তিনি ওঁকে গ্রেপ্তার করলেন না, ফ্রান্সগামী একটি নৌবহরের অধিনায়কের পদে বসিয়ে রওনা করে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। কিন্তু কী দুর্দৈব দেখুন! যেতে যেতে পড়লেন প্রবল তুফানের মুখে। ঝড়ের দাপটে তিনি তাঁর বহরের অন্য সব জাহাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তখন ইংরেজদের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছিল, সে-কথা আগেই বলেছি। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লাবোরদনে গিয়ে পড়লেন ইংরেজদের হাতে। কিন্তু ইংরেজরা তাঁর নাম শুনেছিল, তারা বীরের মর্যাদা দিতে জানতো। তারা তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রেখেছিল, তারপরে মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল ফ্রান্সে। কিন্তু নিজের দেশে তিনি কোনো মর্যাদা পেলেন না, পেলেন না আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ। প্যারীতে পৌঁছানো মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে রাখা হলো কুখ্যাত 'বাস্তিল দুর্গ'-এ। এখানে তিন বছর বন্দী থাকবার পর অবশ্য তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তখন তাঁর শরীর-মন দুই-ই ভেঙে প'ড়েছিল। এর আরও তিন বছর পরে তিনি পেয়েছিলেন সত্যিকার মুক্তি। মৃত্যু এসে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল মানুষের নাগাল থেকে অনেক দূরে!

সত্যি কথা বলতে কী, সেদিন অনেক কথা জেনেছিলাম স্বামী ভবেশানন্দের কাছ থেকে। ভারতবর্ষ থেকে তিনি মরিশাসে গিয়েছিলেন কোনো এক সংঘের প্রতিনিধি হয়ে (সংঘের নাম করতে এখন আর চাই না) কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি সংঘ ত্যাগ করেন। সেই থেকে রয়ে গেছেন মরিশাসে, দেশে আর ফিরে যান নি। সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই, নইলে জানতে চাইতাম তাঁর আসল নাম, তাঁর দেশের ঠিকানা। জানতে চাই-তাম, দেশে তাঁর কে-কে আছেন,—কাদের তিনি ছেড়ে এসেছেন দেশে?

কিন্তু সন্ন্যাসী নির্বিকার। নিজের কথার ধার দিতেও যেতে চান না। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম মরিশাসের ইতিকথা। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম, ৭২০ বর্গ মাইল পরিমিত এই দ্বীপ প্রাচীনকালে আরবদের কাছে পরিচিত ছিল। কিন্তু তারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে নি, করে নি পর্তুগীজরাও।

—আসল কথা কী জানেন?—ভবেশানন্দ বলেছিলেন,—ইয়োরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু তারা এখানে থাকে নি। এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে প্রথমে ওলন্দাজ বা 'ডাচ্'-রা ১৫৯৮ সালে। এদেরই অজ্ঞতায় এদেরই হাতে এই দ্বীপের নিজস্ব পক্ষীকুল 'ডো-ডো' (দো-দো)-রা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী থেকে।

এখন এখানকার মিউজিয়ামে রাখা একটি আঁকা ছবি ছাড়া, আর কোথাও ওদের অস্তিত্ব নেই।

যাই হোক, ডাচেরা কিন্তু চলে যায় নানান কষ্ট আর দুর্গতি ভোগ করার পর। এর পরে আসে ফরাসীরা ১৭১৫ সালে। তাদের কাছ থেকে এটি ব্রিটিশদের হাতে আসে ১৮১০ সালে। ১৮৩৩ সালে দাস-ব্যবসার বিলোপ ঘটে। ১৮৩৪ সালে পাঁচ বছরের চুক্তি-প্রথায় (স্থানীয় হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের ভাষায় 'গিঁরমাটি'র মাধ্যমে) ভারত থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে আনার কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। (এই মরিশাসের কাছেই আছে আরও কয়েকটি খুদে খুদে দ্বীপ, তাদের মধ্যে একটি হলো 'দিয়েগো গারসিয়া', যা নিয়ে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে আজকাল। মরিশাসের অধীনেই ছিল এই দ্বীপ, সেজন্য স্বাধীন মরিশাস এই দ্বীপ তাদের বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ এটিকে আণবিক বীক্ষণাগার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমেরিকাকে ইজারা দিয়ে বসে আছে বলে শোনা যাচ্ছে)।

এসব তথ্যের কিছু আমি রামজী শর্মার কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছিলাম। ঘোরাঘুরির সময়ে সঙ্গে থাকতো কার্তিক। যে কদিন জাহাজ ওখানে মেরামতি ও মালপত্র ওঠানো-নামানোর জন্য ছিল, ততদিন সময় পেলেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়তাম।

আজকের মরিশাসের সুবিখ্যাত 'প্লাঁয়জ'-বিমানবন্দর তখনো হয় নি, যদিও শুনলাম একটা 'এয়ারস্ট্রিপ' আছে, মাঝে মাঝে প্লেন এসে নামে। ছোট ছোট প্লেন আসে মাদাগাস্কার থেকে। কিন্তু এ-সব আমাদের শোনা কথা, চোখে দেখি নি। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম এখানকার 'রয়্যাল বটানিক্যাল গার্ডেন', দেখতে গিয়েছিলাম 'ওরিয়েণ্টাল হোটেল', যেখানে এসে উঠেছিলেন গান্ধীজী ১৯০১ সালে—৩০শে অক্টোবর তারিখে। তখন তিনি ব্যবহারজীবী গান্ধীজী, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরছিলেন, পথে তুফানে পড়ে জাহাজ বিকল হয়ে সেটি মরিশাসে আসায়, গান্ধীজীরও মরিশাস-ভ্রমণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী হয়ত জানতেন না, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ করে তিনি তখন মরিশাসেও 'সংবাদের শিরোনাম।' সেজন্য তাঁর এই আকস্মিক আবির্ভাব এখানকার ভারতীয়দের কাছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা বই কী! আমাদের নবলব্ধ বন্ধু রামজী শর্মা এই তথ্য দিয়ে বললেন,—এখানকার দৈনিক পত্রিকাগুলো বেরুতো সন্ধ্যাবেলায়। পত্রিকাগুলির মধ্যে 'লে র‍্যাদিক্যাল' ছিল সব থেকে জনপ্রিয়। তাতেই সব থেকে বিস্তারিত ভাবে বেরিয়েছিল 'গান্ধীজীকে যে বিপুল জনসম্বর্ধনা দেওয়া হয়, তার খবর।'

বলে, একটু হাসলেন রামজী, বললেন,—গান্ধীজী যখন এখানে আসেন, তখন এখানে একটিও মটোর গাড়ি ছিল না। যে তিন-সপ্তাহ তিনি এখানে ছিলেন, তাঁকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল ঘোড়ার গাড়ি।

বললাম,—তখন এখানে ঘোড়ার গাড়ি ছিল বুঝি ?

—থাকবে না ?—রামজী বললেন,—'দ্বীপের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত লোকে যাতায়াত করবে কিসে ? এখনো আছে। পথ চলতে চলতে ঠিক আপনাদের চোখে পড়বে একসময়, বিশেষ করে শহর ছাড়িয়ে বাইরে যদি বেড়াতে যান।'

—বলুন তো ? এখানে আর কী-কী দেখবার আছে ?

রামজী বমলেন,—আসল জিনিসই তো দেখেন নি ! চলুন আমার সঙ্গে ? সময় আছে ?

—তা আছে।

তাহলে চলুন।

গেলাম ওঁর সঙ্গে। সমুদ্রেরই একটা খাঁড়ি, সরকারীভাবে এর নাম 'গ্র্যান্ড বেসিন,'—কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা বলেন,—'গঙ্গাতালাও !' 'পাড়িতালাও'-ও অবশ্য বলে থাকেন অনেকে।

—মহিমা আছে গঙ্গাতালাওয়ের,—রামজী মন্তব্য করলেন,—রামায়ণের কাহিনী মনে আছে তো ? মনে আছে সেই ঘটনাটা ? সেই যে 'সীতা মায়ী' সোনার হরিণ দেখে লক্ষ্মণকে ওটা ধরে দিতে বলেছিলেন ? ওটা তো সত্যি-কারের 'সোনার হরিণ' ছিল না, ও ছিল মায়াবী রাক্ষস,—মরীচ। মরীচ মরণকালে রামের কাছে কামনা করলো কী, হে রাম ! আমি পরলোকে গিয়ে সব সময় যেন রামনাম শুনতে পাই ! রাম বললেন, তথাস্তু। রামের হাতের ছোঁয়ায় মরীচ (আমরা বলি, 'মারীচ', কিন্তু আমাদের রামজী উচ্চারণ করে-ছিলেন 'মরীচ') হয়ে গেল নিটোল একটি ঝকঝকে 'মুক্তো'। এই মুক্তো নিয়ে রাম সজোরে ছুঁড়ে দিলেন। সমুদ্রে গিয়ে পড়লো এই মুক্তো। যেখানে পড়লো সেটিই হলো এই মরিশাস। আর, ঠিক যেখানে পড়েছিল, তার নাম 'গ্রেট বেসিন', হিন্দুরা নাম দিলে—গঙ্গাতালাও।

এসব কথা কি রামায়ণে আছে ?

—থাকবার দরকার কী ? মানুষ মুখে মুখে তৈরি করে নিয়েছে,—রামজী বললেন,—আর একবার যখন তৈরি হয়েছে, তখন আর তাকে হটায় কে ? এই দেখুন না আমার ঠাকুমা বুড়ি বলতো, রাম চৌদ্দবছর বনবাসে ছিলেন, তার মধ্যে পাঁচটা বছরও কি তিনি এখানে কাটান নি ? নিশ্চয়ই কাটিয়েছিলেন। সীতামায়ীর প্রিয় জায়গা ছিল এটা, তা জানিস ? আমি যুক্তি দিয়েও তাঁর এ-বিশ্বাস টলাতে পারি নি।

এইখানে এই রামজী শর্মা-মানুষটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের জাহাজে মালপত্রের যোগান দিয়ে থাকেন যে-কোম্পানী, রামজী তাঁদেরই প্রতি-নিধি। তরুণ বয়স্ক, বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি হবে না বয়স। জাহাজে এসে-ছিলেন কর্ম উপলক্ষ্যে, সেই সূত্রে আলাপ। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী বলেন, সঙ্গে কিছু হিন্দী মিশ্রিত থাকে, কিন্তু হিন্দীও ইনি পুরোপুরি বলতে পারেন না। অথচ মাঝে মাঝে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' থেকে আবৃত্তি করে থাকেন। যেমন একদিন কী কথায় যেন বলে উঠলেন,—"নহি দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা/

নহি' কোউ অবুধ ন লচ্ছণহীনা।' মানে হলো, গরিব, দঃখী, দীন, নির্বোধ ও অলুক্ষুণে কেউ থাকবে না রামরাজ্যে। মণিলাল ডক্টরের নাম শুনেছেন?

—না!

রামজী বললেন,—ওঁকে মরিশাসে পাঠিয়েছিলেন গান্ধীজী। পণ্ডিত লোক। বিলেতে লেখাপড়া করেছিলেন। প্যারিসেও ছিলেন বহুদিন। এখানে এসে একখানা কাগজ বার করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'হিন্দুস্থানী'। প্রথমে এর ভাষা ছিল গুজরাতি, পরে হলো 'হিন্দী'। এর মাথায় ছাপা থাকতো, —ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও সবার সঙ্গে সমান-অধিকার। তিনি এখানকার চুক্তিবন্ধ মজদুরদের দুরবস্থার কথা খুব লিখতেন বলে আমার বাবার কাছে শুনেছি।

রামজী একবার আমাদের নিয়ে গেলেন 'শামারেল' দেখাতে। কথাটা বোধ হয় ফরাসী, যার মানে, 'সাতরঙের সমাবেশ'। গিয়ে দেখলাম, এখানকার মাটির রঙ নানারকমের। অর্থাৎ রঙের সমাবেশ সাত কেন, সাতের থেকেও বেশি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এ-থেকেই প্রমাণ হয় এই দ্বীপের সৃষ্টি আগ্নেয়-গিরি থেকে। আগ্নেয়গিরি না থাকলে এমন সব রঙিন মাটি এলো কোথা থেকে? কেমন, সুন্দর না?

বলতে বলতে 'রামচরিত'-পড়া রামজী শর্মা হঠাৎ অন্য জগতে চলে গেলেন, —কে বলতে পারে, হয়ত ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছিল পল আর ভার্জিনিয়া। এই রঙের সমাবেশ আর ঐ ওখানকার পাহাড়ী ঝর্ণা দেখে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এমনও হতে পারে, ওরা ফেরার পথে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। আর পলের মা মারগারিতের যে নিগ্রো-দাসটি ছিল, সেই দোমাঁগ ওদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হচ্ছিল জঙ্গলের মধ্যে। এখন এই যে এতো আখের ক্ষেত দেখছেন, এখানে আগে ছিল বিরাট জঙ্গল। অবশ্য যতই বসতি বেড়েছে, জঙ্গল ততই কাটা পড়েছে। কিন্তু আমাদের দেখা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যত জঙ্গল কাটা পড়েছে, তত আর কখনো হয়নি। কারণ কী জানেন? চিনির দাম বাড়তে বাড়তে একেবারে তুঙ্গে চলে যায়। সেজন্য জঙ্গল কেটে তাড়াতাড়ি আখের ক্ষেত করার হিড়িক পড়ে গেল। আর এই আখ, এবং আখ থেকে চিনি,—এই-ই তো আজকের মরিশাসের প্রধান সম্বল।

'শামারেল' দেখে ফিরতে ফিরতে এইসব কথা হচ্ছিল।

এরপরে আমরা দেখতে গেলাম পোর্তলুই বা 'পরলুই'-এর সংলগ্ন 'কুলিঘাটা'। এদিন ভবেশানন্দজী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বন্ধ-করা একটি লোহার ফটক, তার পিছনে এক সার সিঁড়ি। এরই নাম 'কুলি-ঘাটা'। এখানেই প্রথম এসে নেমেছিল ভারতীয় শ্রমিক ১৮৩৪ সালে। ভবেশানন্দ বললেন,—তার মধ্যে বাঙালী, বিহারী, যুক্তপ্রদেশী, তামিল, তেলেগু, সবই ছিল।

—আসল কথা কী জানেন?—ভবেশানন্দ তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন,—খুব বড়ো আকারে ভারত থেকে লোক আসে ১৮৫৭-র

'সিপাহী-জাগরণ''-এর পর (উনি 'বিদ্রোহ' শব্দটা ব্যবহার করলেন না)। অন্ততঃ ত্রিশ হাজার লোক সেদিন এসেছিল বিহার থেকে—ব্রিটিশের রোষ থেকে বাঁচবার জন্য। মরিশাস তখন ছিল ফ্রান্সের অধীন, তাই এখানে তাদের কোনো বিপদের মুখে পড়তে হয় নি!

[এইখানে পাঠকদের জন্য আমি বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে রাখি। এ-সব ঘটনা ঘটেছে আমার মরিশাস-ভ্রমণের পর। ১৯১৫ সালে হয়েছিল প্রলয়ঙ্করী তুফান। তার ফলটা কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়। তখনই কংক্রীটের ঘরবাড়ি তৈরি হতে শুরু হয়। প্রখ্যাত জননেতা সার শিউসাগর রামগুলাম গত ১৫ ডিসেম্বর (১৯৪৩) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ১২ই মার্চ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ছিলেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে হন গভর্ণর জেনারেল। ব্রিটিশ-আমলে কার্যত তিনি এই দেশের প্রধান নেতা ছিলেন, মরিশাসের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর অবদান কম নয়। লণ্ডনে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক রামগুলাম নির্যাতিত মজদুর-শ্রেণীর স্বপক্ষে সংগ্রাম করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এখন যিনি মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর নাম অনিরুদ্ধ জগন্নাথ। বর্তমানে দ্বীপটির বাসিন্দা দশ লক্ষ, ভারতীয়দের উত্তরাধিকারীর সংখ্যা এর ৬৯ শতাংশ, এর মধ্যে হিন্দু হচ্ছে ৫২ শতাংশ]

ভবেশানন্দজী আমাকে 'মহাযজ্ঞ'-এর খবরও দিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর হিন্দুদের মিলিত উৎসব হয়েছিল এই উপলক্ষে। এই মহাযজ্ঞ ছিল হিন্দুত্ব ও হিন্দু-জাগরণের প্রতীক। একে জাতীয় জাগরণও বলা যায়, বাসে চ'ড়ে, পায়ে হেঁটে দলে দলে ভারতীয় হিন্দুর দল এসেছিল এই যজ্ঞে অংশ নিতে, এসেছিল অনেক মুসলমান ও খ্রীষ্টান ভারতীয়ও। তখনও ব্রিটিশ আমল। নেতাদের ধরপাকড় ইত্যাদির অবধি ছিল না। কিন্তু তা দিয়ে এই জাতীয়তার উত্থানকে রোধ করা যায় নি। আমি যখন ওখানে যাই, তখন এই জাতীয়তার তরঙ্গ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। তার প্রধান মাধ্যম ছিল এই 'মহাযজ্ঞ' প্রতিম অন্যান্য ধর্ম-সংহতি গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড। শিবরাত্রি, পৌষ-সংক্রান্তি বা পঙ্গল, ছট্-পরব উপলক্ষে হাজার-হাজার মানুষ গঙ্গা-তলাও'তে সমবেত হচ্ছে, মন্দিরে মন্দিরে জমায়েত হচ্ছে, শুনছে 'রাম-কথা'র মধ্যে রাম-সীতা-কাহিনীর মাহাত্ম্য!

বলা বাহুল্য, আমাদের রামজী শর্মা স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন এই জাতীয়তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, কিন্তু যখন আমরা একসঙ্গে বেড়াতাম 'পাম্পলমুশ'-এ যাবার পথে, বা, শহরের পিছনকার 'মর্ন দে লা দেকুভ্যাত''—পাহাড়ের দিকে, তখন রাম-সীতা-মারীচের মায়ার পিছন থেকে উঁকি দিতো পল-ভার্জিনিয়া, বা তাদের দুই অভাগিনী মায়ের কথা। একদিন পাম্পলমুশের গীর্জার কাছে এসে রামজী থমকে দাঁড়ালেন, বললেন,—এখন তারা গেল কোথায়? 'পরলুই'-শহরের শেষ-প্রান্তে একটা বনভূমি চোখে পড়তো, কোথায় সেই বনভূমি? সাগরতীরের একটা

প্রণালীর কাছে রয়েছে 'দুর্ভাগা অন্তরীপ', তার পরেই দিগন্তবিশারী বিশাল সমুদ্র। সেই সমুদ্রে দেখা যায় ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ। ওদের মধ্যেকার প্রধান দ্বীপটির নাম ছিল 'কঁয়-দে-মীর'। ও নামে পল বা ভার্জিনী ডাকলেও এখন আর কেউ ডাকে না!

—আসুন, এই পাহাড়ের ধারে একটু বসি। এখান থেকে সমুদ্রকে দেখা যাচ্ছে দারুণ!

—বসুন।

বসলাম আমি আর কার্তিক, রামজীর পাশে। তিনি তখন পল ও ভার্জিনিয়ার স্মৃতিতে বিভোর। বললেন,—পীয়্যার-সাহেব ১৭২৬ সালের কথা লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর কাহিনীর দে-লাতুর ছিল এক ভদ্রলোকের নাম। ফ্রান্সে চাকুরি-বাকরি না পেয়ে সে এই দ্বীপে চলে এলো জীবিকা-নির্বাহের জন্য। সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী। স্ত্রীকে 'পরলুই'-তে রেখে সে মাদাগাস্কারে গিয়েছিল কয়েকটি দাস কিনে আনতে। কিন্তু সেখানে হঠাৎ এক দুর্যোগে সে মারা যায়। বিধবাটি হয়ে পড়লো একা, সঙ্গে নিগ্রো একটি মেয়েছেলে ছাড়া আর কেউ নেই, তার ওপর সে ছিল সন্তান-সম্ভবা। ফ্রান্সে যে ফিরে যাবে তার উপায় নেই। কারণ, এ-বিয়েতে তার ধনী বাপ-মায়ের মত ছিল না, তারা লুকিয়ে বিয়ে করেছিল। এই অবস্থায় তার আলাপ হলো মারগেরিতের সঙ্গে। মারগেরিত ফরাসী নয়, ইংরেজ, বিলেতে এক সাধারণ চাষীর ঘরে তার জন্ম। প্রতিবেশী এক তরুণকে সে ভালোবাসতো, কিন্তু ছেলেটি নিজের কামনা সিদ্ধি করে দূরে সরে যায়, বিয়ে করে না। এই কলঙ্ক ঢাকতে সে চলে আসে মরিশাসে, এখানে এক নিগ্রো দাসকে সে ক্রয় করেছিল অনেক কষ্টে-সৃষ্টে। এখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তার ছেলে,—পল। মাদাম লা-তুর যখন তাকে প্রথম দেখে, তখন সে তার শিশু সন্তান পলকে স্তনদান করছিল। এই মাদাম লাতুরের কোলেই এসেছিল ভার্জিনী বা ভার্জিনিয়া। পল আর ভার্জিনিয়ার প্রেমের গল্প আমি আপনাদের বলেছি। তার এক ধনী মাসীর আগ্রহে ভার্জিনিয়াকে পাঠানো হয়েছিল ফ্রান্সে। কিন্তু সে ফ্রান্সে যাবার পর 'পল'-এর মানসিক অবস্থা হয় শোচনীয়। ভার্জিনীকে বাংলা দেশের নীল কাপড়ের পোষাকে ভারী সুন্দর দেখাতো। সেই পোষাক পরে সে যখন নদীর ধারের সবুজ গাছ-গাছালীর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতো, তখন মনে হতো যেন বনদেবী নিজে এসে আবির্ভূত হয়েছেন স্বর্গের সমস্ত সুষমা নিয়ে! সেখানে গিয়ে পল একা একা ঘুরে বেড়াতো, কিন্তু কোথায়—কোথায় তার ভার্জিনী?

বলতে বলতে শেষের দিকে গলা ধরে এসেছিল রামজীর। তারই জের টেনে রামজী বলতে লাগলেন,—আমারও আজ পলের মতো অবস্থা! আমার ভার্জিনীও চলে গেছে দূরে—বহুদূরে—তাকে ছেড়ে যে এতো কষ্ট হবে, তা আমি কখনো ভাবিনি!

—আপনার ভার্জিনী?

রামজী বললেন,—হ্যাঁ। আমার স্ত্রী। মাত্র মাসকয়েক আগে আমি বিয়ে করেছি!

আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। মনে পড়লো আমারও নব-পরিণীতার কথা, তাকে আমি ঘাটশিলায় রেখে হঠাৎ চলে এসেছি!

রামজী বললেন,—এখানকারই মেয়ে—আমাদের জাতপাতেরই মেয়ে। কিন্তু বিয়ের পর আমার বাবার কী হলো, তাকে আমাদের দেশ সেই বিহারের পুর্ণিয়া জেলায় নিয়ে গেছে—আমাদের সাবেক গাঁ দেখাতে, যে গাঁ আমি নিজে কোনোকালে দেখি নি।

—আপনি গেলে পারতেন?

রামজী বললেন,—পরের চাকরি করি, বোঝেন তো? যখন-তখন ছুটি পাওয়া মুশকিল। তার ওপরে টাকা কোথায় অতো? বাবাই জীবনে গেলেন এই প্রথম। অনেক দিন থেকে টাকা জমাবার পর এই বুড়ো বয়সে তার যাত্রা। বাবার ইচ্ছে ছিল মাকে নিয়ে যাবার। তাই দুটো টিকিট কিনেছিল জাহাজের। কিন্তু মা কিছুতেই রাজী হলো না আমাকে আর আমার ভাইবোনদের ছেড়ে যেতে। তখন তার চোখ পড়লো তার 'পুতহু' (পুত্রবধূ)-র দিকে।

— আপনার স্ত্রী যেতে রাজী হলেন?

—সঙ্গে সঙ্গে। তার আহ্লাদ দেখে কে? ড্যাং ড্যাং করে জাহাজে গিয়ে উঠলো শ্বশুরের সঙ্গে!

—আশ্চর্য?

রামজী বললেন,—আবার সেই তুলসীদাসজীরই স্মরণ নিতে হলো। তিনি বলেছেন না? 'নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গাহি জাঈ/জানি ন জাই নারী গতি ভাই!' আয়নায় নিজের ছায়া ধরে রাখা যায় কী? তেমনি মেয়েদের মনের গতিও জানা সম্ভব হয় না! এতদিনে দেশে গিয়ে পৌঁছেছে নিশ্চয়। কিন্তু সেখানে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার কথা আর মনে পড়ছে কী?

সত্যি কথা বলতে কী, ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার মনটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জাহাজে ফিরে গেছি, কাজকর্ম করছি, কিন্তু মন টিঁকছে না! পলের ভার্জিনিয়া, রামজীর স্ত্রী, আর আমার নবপরিণীতা,—যেন সব একাকার হয়ে গেছে!

পরদিন সময় পাওয়া মাত্রই ছুটলাম রামজীর অফিসের দিকে। 'লাবোরদনে স্কোয়ার'-এর কাছেই ও'দের অফিস-বাড়ি। সেদিন আমি একা, কার্তিককে সঙ্গে নেই নি। ও'কে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলাম সমুদ্রের ধারে, সেই 'কুলি-ঘাট' ছাড়িয়ে একটু দূরে। ছোট্ট একটা পার্কের মতো জায়গা, কাছেই সমুদ্রের বেলাভূমি। বললাম,—আপনার কথা শুনে আমারও মনটা খুব উতলা হয়েছে।

—কোন্ কথা?

বললাম,—আপনার স্ত্রীর কথা। আমিও আপনার মতো বিরহ-যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছি। দেশে ফেলে রেখে এসেছি আমার নবপরিণীতা স্ত্রীকে। তাকে

জানিয়েও আসি নি আমি কোথায় এসেছি ! তাকে কোনো চিঠিও দেই নি। নানা কারণে দিতে পারছিও না !

আমার দিকে একটু অবাক হয়েই তাকালেন রামজী, তারপরে হাত বাড়িয়ে আমার হাতখানা ধরলেন, বললেন,—ভাইয়া ! তবে তো তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ এক !

বললাম,—হ্যাঁ।

রামজী বললেন,—আমি তোমাকে তার নামটা বলি নি। তার নাম মোহিনী। কিন্তু আমি তাকে চুপিচুপি ডাকতাম, ভার্জিনী।

—আপত্তি করতো না ?

রামজী বললেন,—না। খুশি হতো। সে জানতো পল ও ভার্জিনীর কাহিনী। গঙ্গা তালাওয়ে বিয়ের আগে ছুটি পরবের সময় সে-ও গেছে, আমিও গেছি, রাম-সীতা বা মারীচের গল্প সে-ও শুনেছে আমিও শুনেছি, কিন্তু এখানকার পাহাড় বা সমুদ্র বা ঐ 'শামারেল',—ওসবের সঙ্গে পল-ভার্জিনী যতটা খাপ খায়, ততটা অন্য কিছু নয়। তাঁরা দেবতা, কিন্তু পল-ভার্জিনী আমাদের মতো মানুষ, তাদের সুখদুঃখের ধরনের সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখের ধরনটা মেলে বেশি। জানি না যখন বুড়ো-বুড়ী হবো তখন কী হবে, কিন্তু তরুণ বয়সে—এখানে—পল-ভার্জিনীয়াই আমাদের সব থেকে আপন ! ভবেশানন্দজীর মতে, এখানে এখন হয়েছে কী জানেন ? মুসলমানেরা তাকিয়ে আছে পাকিস্তানের দিকে, হিন্দুরা হিন্দুস্থানের দিকে, আর ফরাসীরা ফ্রান্সের দিকে। কিন্তু আগে এটা ছিল না, পরেও মনে হয় থাকবে না। ধর্মকে যে-যার ঘরে রেখে আমরা সবাই 'মরিশাসবাসী' হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবো। কারণ, আমাদের তিন দলেরই মিলে যাবার মূল সূত্র হচ্ছে পল ও ভার্জিনিয়া। পল ও ভার্জিনিয়াকে আমরা, তা আমরা মুসলমান হই, হিন্দু হই, খৃষ্টান হই, সমান ভালোবাসি। এই ভালোবাসাই—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন রামজী, মুখ ফিরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকালেন, বললেন,—কিন্তু এসব কথা আমি বলছি কেন ? আপনি তো জানেন পল-ভার্জিনীর শেষটা কী হয়েছিল ? যদি সেরকম কিছু হয় ? সে যখন জাহাজে চ'ড়ে এদিকে আসবে, তখন ভার্জিনীর 'সেনুত্ জেরা' জাহাজের মতো তার জাহাজও যদি ঝড়ের মুখে পড়ে ! যদি ডুবে যায় ?

—না—না—এসব কী ভাবছেন ?

আমার হাতখানা চেপে ধরলেন রামজী, বললেন,—ভাইয়া, তোমাদের জাহাজের মেরামতি প্রায় শেষ, দু-একদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। যাবে ইণ্ডিয়ায়। আমাকে সঙ্গে নেবে ? আমি যাবো পুব দিকে—বিহারে—জেলা পূর্ণিয়া—!

বললাম,—বলুন না আপনি আমাদের ক্যাপ্টেনকে ?

—উনি কি নেবেন ?

—বলেই দেখুন না ?

কী যেন ভাবতে লাগলেন চুপচাপ, তারপরে বললেন,—না—তা হয় না। আমি রওনা হবো, আর সে হয়তো এসে পড়বে অন্য জাহাজে। হয়ত পথে যেতে যেতে তার জাহাজকে দূর থেকে দেখবো, কিন্তু চিনতে পারবো না,—অত দূর থেকে দেখতে পাবোও না তাকে !

তারপরে একটু থেমে, আবার বলতে আরম্ভ করলেন,—অদ্ভুত কথা কী জানো ? আমি যেমন জানি না আমাদের গ্রামের নামটা কী, আমার মা-ও তেমনি জানে না। হয়ত বাবা বলেছিলেন, আমরা ভুলে গেছি, নামটা মনে রাখতে পারি নি। ভারতে গেলে আমাদের গ্রামটা আমরা খুঁজেই বা বার করবো কেমন করে ? বাবা পারবেন, একটা কাগজে তিনি সব লিখে রেখে গিয়েছেন কোনো দেশোয়ালী ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ে।

আমাদের জাহাজ যে-দিন ভোরবেলা ছেড়ে যায়, তার আগের দিন রাত্রে বহুক্ষণ আমার কেবিনে ছিলেন রামজী শর্মা। বললেন,—ভাইয়া, তুমি তোমার ভার্জিনীর সঙ্গে খুব শীগ্‌গিরই মিলিত হবে, কিন্তু আমার ভার্জিনীকে যে কবে পাবো জানি না !

বললাম,—অতো ভাবছেন কেন, ওঁরা তো আর দেশে থাকতে যান নি, বেড়াতে গেছেন মাত্র। নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।

রামজী বললেন,—জানি। বুঝি সব। কিন্তু তবু মন মানে না ! এই দ্যাখো আজ একটা পরব আছে আমাদের। সবাই জোট বেঁধে গঙ্গাতালাওয়ে গেল, আমার মা গেছে, ভাই-বোনেরাও গেছে, কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হলো না ! বরং আমার যেতে ইচ্ছে হলো 'পাম্পল মুশে'র গীর্জার কাছে, যার কাছের বাঁশঝাড়ের ধারে 'পল ও ভার্জিনিয়া'র সমাধি দেওয়া হয়েছিল।

—সত্যিই কি সমাধি দেওয়া হয়েছিল ?

—পীয়্যার সাহেব তো তাই লিখে গিয়েছেন।

—গিয়েছিলেন গীর্জায় ?

রামজী বললেন,—হ্যাঁ। দিনমানের কথা বলছি। ওরা গেল গঙ্গাতালাও, আমি গেলাম পল-ভার্জিনীর সমাধির পাশে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। সত্যি বলছি, আমি আজকাল নিজেকে 'পল' ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না, আর তাকে 'ভার্জিনিয়া !' আমার বিরহের যন্ত্রণা আমাকে রাম-সীতার থেকে ছিঁড়ে এনে 'পল-ভার্জিনিয়া'র পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছে ! 'পল-ভার্জিনিয়া' বুঝি মরিশাসের সত্যিকার আত্মা, একে বাদ দিয়ে কোনো মরিশিয়ানেরই চলবে না, বিশেষ করে তাদের তারুণ্যের কালে।

হয়ত যুক্তি দিয়ে এর বিপক্ষে সেদিন অনেক কিছু বলতে পারতাম, কিন্তু তার ব্যথার তন্ত্রী যে আমারও তন্ত্রীতে সুর তুলে দিয়েছে ! নিজের 'বিরহ' দিয়ে আমি ওর বিরহকে বুঝতে পারছিলাম। ওর মন ছুটেছে ভারতের বিহারের দিকে, আমরাও তাই। ওর জেলা—পূর্ণিয়া, আমার জেলা—সিংভূম—এই যা তফাৎ !

সে-রাত্রে রামজী ছিলেন আমার অতিথি, তাই খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প করতে পেরেছিলাম। গল্প সেই একই। ঘুরে ফিরে সেই পল আর ভার্জিনিয়া। রামজী আমার হাতখানা ধরে বললেন,—দেখ ভাইয়া, তুমিও 'পল', আমিও 'পল',—এক 'পল'কে ছেড়ে যেতে আর এক 'পল'-এর কষ্ট হবে না! খুবই কষ্ট হচ্ছে! যদি সম্ভব হয়, চিঠি দিয়ো। আর, যদি সুযোগ পাও, তো, পূর্ণিয়া জেলায় একবার যেয়ো, কিন্তু—বলেই আবার থেমে গেলেন, বললেন,—গাঁয়ের নাম? গাঁয়ের নাম না জানলে তুমি যাবে কী করে? যাক গে, তুমি তোমার ভার্জিনিয়ার কথা লিখো, আমি লিখবো আমার ভার্জিনিয়ার কথা। কেমন?

ওঁর বলার মধ্যে এমন আন্তরিকতা ছিল যে, আমার চোখ ছলছল করে এসেছিল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,—ঠিক আছে! 'পল' কি তার অন্য 'সত্তা'—দ্বিতীয় 'পল'কে ভুলতে পারে?

সে আমাকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো। কথা বলতে পারছিল না। চোখে জল।

॥ ১৫ ॥

চোখে জল নিয়ে রামজী বিদায় নিয়ে চলে গেলো, আমারও চোখ শুষ্ক ছিল না। কদিনেরই বা আলাপ? অথচ হয়ে গিয়েছিল আমার যেন অতি আপন জন। ভোরবেলা জাহাজ আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে বন্দর ছেড়ে যেতে লাগলো, ধীরে ধীরে এক সময় মিলিয়ে গেল তটরেখা, তবু রামজী আর তার পল-ভার্জিনিয়া আমাকে ছাড়ছিল না। রামজীর কণ্ঠস্বর যেন তখনো শুনতে পাচ্ছি,—'ভাইয়া, পূর্ণিয়া জেলায় একবার যেয়ো! কিন্তু গাঁয়ের নাম? তুমি তোমার ভার্জিনিয়ার কথা লিখো, আমি লিখবো আমার ভার্জিনিয়ার কথা!'

আমরা পরস্পর চিঠি লিখবো বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম। আমি দেশে ফিরে তাকে চিঠি লিখবো বলেছিলাম, কিন্তু ফিরে গিয়ে এমন ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম যে, তাকে চিঠি আর লেখা হয়নি! জীবনে এই সব ছোট ছোট অপরাধ আমরা করি, কিন্তু পরে—জীবনের সায়াহ্নবেলায় এই অন্যায়গুলিই বিরাট হয়ে দেখা দেয়। তখন অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকি, অথচ, করার আর কিছু থাকে না!

সেদিন কিন্তু সদ্যছেড়ে আসা এই রামজীকে যেন আমার 'দ্বিতীয় সত্তা' বলে মনে হয়েছিল। তার আর আমার অন্তর সেদিন একই দুঃখে মথিত হচ্ছিল, একই বিরহের অন্তর্জ্বালায় জ্বলছিলাম আমরা!

এ-যাত্রার প্রথম অধ্যায় ছিল মনোরম। শান্ত সমুদ্র। পথের বিপদ কিছু আছে বলে মনে হচ্ছিল না। ছোট্ট 'রাখাল'-এর মতোই মন কাঁদছিল। কিন্তু কাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো, 'দেশে পৌঁছতে আর কতদিন আছে?'

শিশু বা কিশোরকে এ প্রশ্ন মানায়, আমাদের মানায় কী? তবু সান্ত্বনা, জাহাজ দেশেই যাবে এবার, আর দেশে পৌঁছনোমাত্র আমারও হবে চুক্তি শেষ, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবো। এখন তাই কোনো দিকে মন যাচ্ছে না, 'রাখালের গৃহগত প্রাণ'-এর মতো আমারও গৃহগত প্রাণ ক্রমাগত কাঁদছে!

সেদিনের সূর্য ডুবলো, রাত এলো। আবার রাত কেটে দিনের মুখ দেখা গেল। কে দিয়েছিল খবরটা? বোধহয় কার্তিকই দিয়েছিল। কাছে এসে গোপন-কথা বলবার মতো সুরে ফিস-ফিস করে বললে,—দেশের কোন্ পোর্টে যাচ্ছি জানেন?

বললাম,—কোথায় আবার—বোম্বাই?

—না,—সে বললে,—যাচ্ছি আরও কাছে। কালিকট।

আমার বুকের ভিতরটা উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো,—কী বললে! ক্যালকাটা!

—না-না—ক্যালকাটা নয়,—কালিকট।

কথাটা প্রথমে মগজে ঢোকে নি, একটু ধীরে ধীরে ওটা যেন স্পষ্ট হলো আমার কাছে!

কালিকট! মানে 'জামোরিন' আর 'ভাসকো-ডা-গামা।' যার সঙ্গে আমাদের ভারতের ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায় জড়িত! ভাবলাম—তবু ভালো।

বোম্বাইয়ের অনেক আগেই নামতে পারবো, পা দিতে পারবো দেশের মাটিতে। তারপরে ট্রেন। পথটার কথা আন্দাজ করতে পারি। কালিকট থেকে মাদ্রাজ। সেখান থেকে ওয়ালটেয়ার (বা বিশাখাপত্তন) ছুঁয়ে ট্রেন যাবে খড়গপুর হয়ে হাওড়া, অর্থাৎ কলকাতা। আমাকে ওয়ালটেয়ারে নামলে চলবে না, পরিচিত কেউ না দেখে ফেলে এমনভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে ট্রেনে। আমাকে নামতে হবে খড়গপুরে, সেখান থেকে ঘাটশিলা। ঘাটশিলায় পৌঁছে আর দেরি নয়, আমার 'ভার্জিনিয়া'কে নিয়ে পরদিনই আবার রওনা। খড়গপুরে এসে ট্রেন ধরে একেবারে ওয়ালটেয়ার।

মরিশাসে থাকতেই দুধওয়ালা-সাহেব আমাকে একটি আশ্বাস-বাণী শুনিয়েছিলেন! 'দেশের যে বন্দরেই প্রথম নামবো, সেখানেই তোমাকে ছুটি দেবো। তার আগে 'কেবল' করবো হেড-অফিসে, 'রাইটার'কে 'অমুক' বন্দরে এসে পৌঁছতে বলো। বুঝলে হে? অসুস্থ 'লেখক' এখন পুরো সুস্থ। চিঠি পেয়েছি। সুতরাং তোমার release এর জন্য কোনো চিন্তা নেই!'

ওপরে, হুইল-হাউসের ম্যাপে দেখেছিলাম, মরিশাস থেকে উত্তর-মুখে প্রায় ধনুকের মতো মরিশাস-সিসেলস্ (বা সিচেলাস) নামের একটি 'রিজ' আছে, যেখানে জল অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এই 'রিজ'-এর পাশ দিয়েই জাহাজ যাচ্ছিল, এক সময় সুবিধামতো জায়গা দেখে মুখ ফিরিয়ে দেশের দিকে পাড়ি জমাবে। কিন্তু পরদিন এ-যাত্রার আর একটু বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেল। সামনেই একটি বিস্তীর্ণ চর আছে, ঠিক 'একটি' নয় দুটি। নদীতে 'চর' থাকলে

আমরা যা বুঝি, এ তা' নয়। একে বলা যেতে পারে 'ডুবো চর'। বড়োর নাম 'সায়া-দ্য-মালহো ব্যাঙ্ক, আর ছোটটির নাম 'নাজারেথ ব্যাঙ্ক'। দুটির মাঝখানে একটি খাড়ি আছে, একশো মাইলের মতো চওড়া, যা খুবই গভীর। সিসেলস থেকে প্রায় সাড়ে চারশো মাইল আগে পড়েছে এই 'ব্যাঙ্ক',—অর্থাৎ মরিশাস আর সিসেলসের মাঝামাঝি। রিজ যেমন ডুবো পাহাড়, এ-ও তাই। ডুবো পাহাড়ের ওপর বালির স্তর জমে উক্ত 'ডুবো চর' দুটির সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে প্রবালও রয়েছে। এই 'ডুবো চর' বা চড়া কোথাও পাঁচ, ছয়, আট থেকে ২০ ফ্যাদম পর্যন্ত গভীর, কোথাও বা অনেক বেশি (এক 'ফ্যাদম', যাকে আমাদের দেশের মাঝি-মাল্লারা বলে 'বাঁও',—তার মাপ হচ্ছে চার হাত বা ছয় ফুট)।

আকাশটা ছিল আগাগোড়া নীল, রোদ্দুর ছিল ঝকঝকে, দিগন্তের কাছাকাছি সাদা মেঘের দল নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে যেন সার বেঁধে। এর মধ্যে কোথাও হঠাৎ পড়লো এক ফোঁটা ঘোর কালো রঙ, দেখতে দেখতে সেটা দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন করে ফেললো। শুরু হলো আমাদের ত্রস্ত ছুটোছুটি। দুধওয়ালা-সাহেবকে দুদিন ধরে চোখে চশমা লাগিয়ে মোটা মোটা বই পড়তে দেখছিলাম, এখন দেখছি সে-সব ফেলে দিয়ে, চোখ থেকে বই-পড়বার চশমা নামিয়ে রেখে 'ব্রীজ'-এ উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, দেখছেন আর হুইল-হাউসে নির্দেশ দিচ্ছেন। ততক্ষণে ঘোর কালো-হয়ে-যাওয়া আকাশটার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সমুদ্রের ঢেউ! সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হাওয়া, বজ্রপাত ও প্রবল বৃষ্টি। জাহাজ তার বাঁশী বাজিয়ে বিপদ জ্ঞাপন করছে, ইঞ্জিন-বিভাগের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম সারির সৈনিকের মতো সংগ্রামে নেমে পড়েছে, স্বয়ং চীফ ইঞ্জিনিয়ারও চলে গেছেন নিচে, ইঞ্জিন-রুমে। ডেক-বিভাগের লোকেরাও বসে নেই। তারাও ছুটোছুটি করে নানান কাজ করছে। প্রত্যেকটি কেবিনের ফোকর বা পোর্ট-হোল বন্ধ হয়ে গেল, মিড-শিপের বা পিছনের কেবিনগুলোর বাইরের দরজা সব শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। আরম্ভ হলো জাহাজের প্রবল দুলুনি। সামনে-পিছনে দুলুনি, আবার সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে-বাঁয়ে দুলুনি; দুই দুলুনি একসঙ্গে। এটাই সাংঘাতিক। মেঝেতে পা রেখে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা যায় না, ঘরের জিনিসপত্র ছিটকে প'ড়ে যায়—সে এক অদ্ভুত বিপর্যয়ই বটে!

এইভাবে প্রায় বারো ঘণ্টা জাহাজে আমরা যেন যুদ্ধ করছিলাম। স্টুয়ার্ডের যত্নে, অর্থাৎ তার দেওয়া ওষুধ খাওয়ার ফলে 'সি-সিকনেস'-এর প্রকোপ ঘটলো কম। বারো ঘণ্টা পরে আকাশের ঘোর কালো পর্দাটা আস্তে আস্তে সরে যেতে আরম্ভ করলে জাহাজের 'নাগরদোলা'-ভাবটা একটু শান্ত হলো। আমি ওপরে গেলাম হুইল-হাউসে। গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন দুধওয়ালা ব্রীজ থেকে হেঁটে এই মাত্র হুইল-হাউসে এলেন। জামা-প্যান্ট বৃষ্টিতে ভিজে, বারো ঘণ্টা সমানে কাজ করে গেছেন, ঘুম নেই কিছু নেই,—চোখ বসা, মুখ শুকনো,—কিন্তু আমাকে দেখে সহজ ভঙ্গিতেই হাসলেন, বললেন,—কী হে, ঠিক আছো তো?

বলেছিলাম না, এসব জায়গায় ঝড়-টড়—ধাক্কাধুক্কি একটু-আধটু আছেই! দাঁড়াও এখানে, থার্ড অফিসারের কাছে,—আমি নিচে থেকে একটু ঘুরে আসছি, চীফ ইঞ্জিনিয়ার ডাকছে ইঞ্জিন-রুমে, কোথায় কী গড়বড় হলো, দেখি।

'থার্ড অফিসার'—যিনি হুইলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর চোখদুটো যেন কপালে উঠলো! ক্যাপ্টেন নিজে যাচ্ছেন ইঞ্জিনরুমে,—এ-বড়ো অভিনব দৃশ্য! সচরাচর ঘটে না! তাহলে নিশ্চয়ই কোনো যন্ত্রপাতি বিকল হয়েছে! নিশ্চয়ই ঘটেছে কোনো দুর্ঘটনা! ক্যাপ্টেন দুধওয়ালা, যিনি প্রবল ঝড়কেও 'একটু-আধটু ধাক্কাধুক্কি' ছাড়া অন্য কিছু বলে বর্ণনা করেন না, তাঁর পক্ষে এ-রকম 'ও-কিছু নয়' গোছের ভাবভঙ্গি করেই চীফ ইঞ্জিনিয়ারের এলাকা,—ইঞ্জিন-রুমে নেমে যাওয়া সম্ভব!

আমাদের আশঙ্কা অমূলক নয়। জাহাজ রীতিমত ঘায়েল হয়েছে! কোনো ডুবো পাহাড়ে 'ধাক্কাধুক্কি' লাগায় নি তো? শুনলাম, খাস 'প্রপেলার'-এই নাকি গোলমাল! মরিশাসে খানিকটা মেরামতি করা হলেও ঝড়ের ধাক্কায় তা আবার বিকল হয়ে গেছে! এ ছাড়া একটি বয়লারও গোলমাল করছে! (ও সব জাহাজে দুটি করে বয়লার থাকতো তখন, সঙ্গে একটি বাড়তি, যাকে বলা হতো 'অক্জিলিয়ারি বয়লার')। সেটি নিভিয়ে দিয়ে ঐ 'বাড়তি'-টাকেই চালু করতে হবে। ক্যাপ্টেন ফিরে এসে বললেন,—এই 'মাল' বলে এ-সব ধাক্কাধুক্কি সামলেছে, অন্য জাহাজ হলে স্রেফ 'গোঁত্তা' খেতো!

কিন্তু তাহলে কোথায় যাবো আমরা? ছুটলাম রেডিও-অফিসারের ঘরে: 'বাড়িওয়ালা' (ক্যাপ্টেন) কাকে কী বার্তা পাঠান, তা থেকেই বোঝা যাবে আমাদের কপালে কী আছে! 'দেশ' না 'বিদেশ'?

বোঝা গেল কিছুক্ষণ পরেই। আমরা না যাচ্ছি কালিকট, না যাচ্ছি বোম্বাই,—আমরা যাচ্ছি কাছেরই একটি দ্বীপের প্রধান বন্দরে। তার নাম,—'ভিক্টোরিয়া'। দ্বীপ এখানে একটি নয়, অনেক। তাই দ্বীপ না বলে দ্বীপপুঞ্জ বলাই ভালো,—নাম, 'মাহে-সিসেলস্'। যার কথা আগেই আমরা শুনেছিলাম! বড়ো দ্বীপটাকে 'মাহে' বলা হয়, যার প্রধান বন্দর ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে আমরা পৌঁছলাম সকাল বেলা। ঠিক ভোর নয়, পড়ন্ত সকাল বলা যেতে পারে। তখনো আকাশ একেবারে নির্মেঘ নয়, তবে ঝড়টা শান্ত হয়ে গেছে। হুইল-হাউসের চার্টে দেখছি, আমরা মরিশাস থেকে ৯৮০ সামুদ্রিক-মাইল উত্তরে উজিয়ে এসে এই মাহে-সিসেলসে পৌঁছেছি। ডানদিকে—বেশ খানিকটা দূরে ছিল 'ন্যাজারেথ ও সায়া-দ্য-মালহা ব্যাঙ্ক'। প্রথমেই পড়ে 'ন্যাজারেথ ব্যাঙ্ক',—এই 'ব্যাঙ্ক'-এর শুরুর বিন্দুতেই ছিল একটি দ্বীপ, তার নাম 'অ্যালবাট্রস' দ্বীপ। পাখীর নামে নাম। এই অ্যালবাট্রস-পাখি একটা আমরা দেখেছিলাম, আমাদের মাস্তুলে এসে বসেছিল। ঠিক আমাদের দেশের সব থেকে সাদা ধবধবে পাতিহাঁস, ঠোঁটদুটো লালচে হলুদ,—সঙ্গে দুটি বেশ বড়ো-বড়ো ডানা; ডানার বাইরেটা কালো-সাদায় মিশানো, ভিতরের দিকটা কিছুটা ধূসর,

কিছুটা বাদামী। একটুক্ষণ বসেই সে আবার উড়ে গেল ডানদিকে, অর্থাৎ যে-দিক থেকে এসেছিল, সেই দিকে। তখনই শুনেছিলাম দ্বীপের কথাটা,—দিগন্তে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল,—'অ্যালবাট্রস'-দ্বীপ। বোধহয় অ্যালবাট্রস পাখীরা থাকে। নইলে ঐ পাখীদের নামে নাম হবে কেন? শুনলাম ও-দ্বীপে জনবসতিও আছে। ব্রিটিশদের অধিকৃত। এখন কী হয়েছে জানি না।

'অ্যালবাট্রস'-পাখীকে মারতে নেই। জাহাজ-ডুবি হয়ে যে-সব নাবিকরা মরে, তারা নাকি জন্মায় 'অ্যালবাট্রস'-পাখী হয়ে। আমি প্রথম অ্যালবাট্রস-পাখীর নাম শুনেছিলাম ছাত্র-অবস্থায়, কোল্‌রিজের একটি কবিতার মধ্যে: Rhime of the Ancient Mariner!

যাই হোক, বিষণ্ণ এক সকালে আমরা এসে হাজির হলাম অনাহূত অতিথির মতো ভিক্টোরিয়া বন্দরে। মূল-ভুভাগ থেকে জলের মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে সোজা একটি বাঁধানো রাস্তা, বাঁধের মতো হয়ে, সামনের দিকটা একটু বেঁকে তৈরি হয়েছে জেটি, কয়েকটি জাহাজ একসঙ্গে বাঁধা পড়তে পারে, কোনো অসুবিধে নেই। এরই নাম 'লং পীয়ার।' দুপাশে সমুদ্রের জল, একেবারে হ্রদের মতো শান্ত, নিস্তরঙ্গ। দেশে যেতে পারলাম না বলে মনটা ভালো না থাকলেও সিসেল্‌সের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না! সামনেই ছোট ছোট দুটো দ্বীপ, কূর্মপৃষ্ঠের মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে! আন্দামানেও এ-রকম পাহাড় দেখেছি পোর্টব্লেয়ারে ঢোকবার আগে, কিন্তু সে-দৃশ্যের থেকে এ-দৃশ্যের অনেক তফাৎ আছে।

অন্যান্য বারে যা হয়, এবারেও তাই হলো। জাহাজ জেটিতে ভেড়ামাত্র আমার নামা হলো না, আমার তখন অনেক কাজ। তবু যেটুকু চোখে পড়লো, বহু লোক এসে জড়ো হয়েছে আমাদের জাহাজের কাছে। কারও গুরুতর কোনো রোগ হলে যেমন ডাক্তার আসে, প্রতিবেশীরা আসে, বন্ধুবান্ধবেরা আসে,—তেমনি করে 'অসুখ'-এর খবর পেয়ে ওরা এসে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে জাহাজের দিকে। আমি এইটুকু দেখেই ঘরে গেলাম নিজের কাজ করতে। ওরই মধ্যে একসময় জাহাজের সামনের দিকে চোখ পড়ে গিয়েছিল। তাকিয়ে দেখি, সামনে একটি যুদ্ধ-জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, যাকে বলে 'নৌ-বিভাগীয় জাহাজ',—তার পিছনে রয়েছে আমাদেরই জাতীয় পতাকা। বুকের ভিতরটা আকস্মিক আনন্দে ফুলে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে নিচে ডেকে নেমে দেখলাম গলুইয়ের দিকে, যাকে বলে জাহাজী ভাষায় 'ফ'ক্‌সল্‌' (Forecastle)। সেখান থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ঐ জাহাজটার গায়ে লেখা রয়েছে, 'H. M. I. S., Delhi'. (পরিবর্তিত নাম, I. N. S. Delhi)। কথায় বলে, নিজের দেশের কাকটাও ভালো! নিজের দেশের জাহাজ দেখে সেদিন অদ্ভুত আনন্দে মনটা ছেয়ে গিয়েছিল। যেন অনেক দিন পরে দেখা হলো কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে। সুদূর সিসেল্‌স্‌ দ্বীপে 'দিল্লী'-জাহাজটিকে যেদিন দেখেছিলাম, সে-তারিখটি আমার দিনপঞ্জীতে সযত্নে লেখা রয়েছে,—'২০শে মে, ১৯৭৯'—মনে হচ্ছিল জেটিতে

নেমে এখ্খুনি ছুটে যাই, দেশোয়ালী ভাইদের সঙ্গে আলাপ করে আসি ! কিন্তু সেই মুহূর্তে পারি নি, কেবিনে গিয়ে ঢুকতে হয়েছিল, একরাশ কাজ তখন হাতে !

বোধহয় ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন এখনো ডেকে পাঠান নি, 'কাস্টম্স্' আর 'পুলিশের লোক' এলে আমাকে ডেকে পাঠানোই নিয়ম। কিন্তু ক্যাপ্টেন তখন জাহাজের 'অসুখ' নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের জাহাজের ইঞ্জিনিয়াররা তো আছেনই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন পোর্টের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। ইঞ্জিন-রুমে গিয়ে তাঁরা সদলবলে পরিমাপ করছেন 'আসল ক্ষতি' টা কতখানি। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে পুলিশের লোক, কাস্টম্সের লোক,—এরা নিজেরাই এলো আমার কাছে, টাইপ-করা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিয়ে চলে গেল। মামুলী নিয়ম-রক্ষা আর কী! 'রোগী অসুস্থ, ডাক্তাররা এসেছে,'—এখন কি আর অন্যদিকের হাঁকডাক ভালো লাগে? ওরা চলে যাবার পরই ঘটলো নাটকীয় ঘটনা। আমাদের কার্তিক হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকে পড়লো আমারই বয়সী এক আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে। সাদা জামা-প্যান্টের ইউনিফর্ম পরা। দেখেই বুঝলাম, ইনি আমাদের ঐ 'দিল্লী'—জাহাজের লোক। কার্তিকের মুখ থেকে তখন খুশির ফুলঝুরি ফুটছিল। বললে,—দাদা, ইনিও বাঙালী, মিঃ ঘোষাল, আলাপ হওয়া মাত্র টেনে নিয়ে এলাম আপনার কাছে !

পোষাকের চিহ্ন দেখে বুঝেছিলাম, ইনি পেটি অফিসার।

—বসুন ?

উনি বসলেন, বললেন,—সারা 'দিল্লী'-তে আমিই একমাত্র বাঙালী, তাই কার্তিকবাবুর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হতে যেন অকূলে কূল পেলাম ! ওর কাছেই শুনলাম, এ-জাহাজে আরও একজন বাঙালী আছেন। আর কি থাকা যায় ? এক ছুটে চলে এলাম আপনার দরজায়।

—খুব ভালো করেছেন। জমিয়ে বসুন। প্রাণখুলে গল্প করা যাবে ! কার্তিক—

আমার মুখ থেকে কথা খসতে-না-খসতেই কার্তিক বললে,—আমি এখুনি যাচ্ছি প্যান্ট্রিতে।

বলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেল 'অতিথি-আপ্যায়ন'-এর ব্যবস্থা করতে।

ঘোষাল বললেন,—সাত-সাতটা দিন এখানে রইলাম, কিন্তু কোনো বাঙালীর টিকি দেখলাম না, আর আজ পেলাম আপনাদের দুজনকে,—কিন্তু কী দুর্ভাগ্য দেখুন, কাল ভোরেই আমরা রওনা দিচ্ছি !

—কাল ভোরে !

—হ্যাঁ। আগেই যাওয়ার কথা ছিল, ঝড়ের জন্য আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। আমরা এসেছি শুভেচ্ছা-সফরে !

—কোথা থেকে আসছেন ?

—ইন্দোনেশিয়া থেকে। সবই শুভেচ্ছা-সফর। এই সিসেল্স্ হয়ে ফিরবো বোম্বাই, মাঝপথে থামবো কোচিনে।

—কোচিন !

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখান থেকে তিন দিনের রাস্তা। মানে, আমাদের জাহাজ তো একটু দ্রুতগামী—

বললাম,—ভাই, আমার একটা উপকার করবেন ?

—নিশ্চয়ই। বলুন ?

বললাম,—আমরা যাচ্ছিলাম কালিকট, কিন্তু মাঝখানে ঝড়ে পড়ে গিয়ে এই দুরবস্থা। কদিন এখানে পচতে হবে কে জানে ! তাই বাড়িতে একটা চিঠি দিতে চাই। আপনি যদি কোচিনে গিয়ে চিঠিটা পোস্ট করে দেন !

—এই কথা ! দিন চিঠি।

ইতিমধ্যে কার্তিক নিজেই নিয়ে এলো কফি আর কিছু বিস্কুট। ওরা দুজনে তার সদ্ব্যবহার করতে করতে গল্প শুরু করলো, আর সেই সুযোগে খসখস করে লিখে ফেললাম চিঠি, বলা বাহুল্য আমার শ্রীমতীকে। (আগের চিঠিটা কী মনে করে যেন ছিঁড়ে ফেলেছিলাম) লিখলাম, 'হঠাৎ কাজে চলে আসতে হয়েছে কোচিন। কিছু ভেবো না, শীগ্‌গিরই পেঁছিবো। কিন্তু খবরদার, এখবর যেন অন্য কেউ জানতে না পারে, কাউকে বোলো না। আমি গিয়ে বলবো সব কথা, কেমন ? ইনিয়ে-বিনিয়ে আরও কিছু ছত্র যোগ করেছিলাম, সে ছিল 'ভার্জিনিয়া'দের প্রতি 'পল'-দের উচ্ছ্বাস। কিন্তু চিঠির মূল বক্তব্য ছিল ঐটুকু। চিঠিটা খামে ভরে ঠিকানা লিখে ঘোষালের হাতে দিতে উনি একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বললেন,—আমাদের দেশের খাম ? পেলেন কোথায় ?

—ছিল একখানা আমার কাছে !

—আহা ! টিকিটটা দেখতেও কতো সুন্দর !

সেদিন শুয়ে-বসে খুব গল্প করলাম। ঘোষাল আমার 'অতিথি' হিসাবে আমাদের জাহাজেই লাঞ্চ খেলেন। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন আমাকে ডেকেছিলেন মাত্র একবার, চীফ স্টুয়ার্ড দুবার। ইঞ্জিন-মেরামতির কাজ আজই শুরু হচ্ছে, —কিন্তু যা শুনলাম, অন্ততঃ সাতদিনের আগে জাহাজ বেরুতে পারবে না। মনটা দমে গেল। ঘোষাল শুনে বললেন,—আরে মশাই, সাত দিন তো কিছুই নয়, মাসখানেক ধরে যে পচতে হচ্ছে না, এই-ই যথেষ্ট।

কার্তিককে এর ডাক, ওর ডাক শুনে প্রায়ই উঠে যেতে হচ্ছে, কিন্তু যখনই সময় পাচ্ছে, চলে আসছে আমার কেবিনে, বলা যায়, গোগ্রাসে গিলছে আমাদের গল্প।

ঘোষাল বললেন,—কী আশ্চর্য ! একটু বেরুবেন না ? দেখবেন না শহরটাকে ? অন্ততঃ আমাদের 'দিল্লী' ?

ও'র হাত ধরে বললাম,—সে-সব পরে হবে, এখন তো চুটিয়ে গল্প করে নেই ! আপনাকে যে এভাবে পাবো, ভাবতেও পারি নি ! জানেন, একবার আন্দামানেও এ-রকম হয়েছিল ? হঠাৎ এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা ! একেবারে জেটির ওপরেই !

ঘোষাল বললেন,—ঈস ! কবে গেলেন ! আমাদের যাওয়া হয়নি একবারও !

বলতে-বলতে লণ্ডন, প্যারিস, নোতরদামের গীর্জা, লুভ্রে মিউজিয়াম প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গই উঠলো। সবই উনি দেখে এসেছেন নিজের চোখে। এইসব বর্ণনা করতে করতে একসময় মন্তব্য করলেন,—আর কদিন ? এর পর জাহাজের আর কোনো দাম থাকবে না, সমুদ্র যাত্রাই আর করবে না কেউ ! সবাই তখন উড়বে, প্লেনে যাতায়াত করবে। দেখবেন, এই সিসেলসেও একদিন প্লেন এসে নামবে !

—আচ্ছা, কেমন লাগলো আপনার সিসেলস ?

ঘোষাল বললেন,—সত্যি বলবো ! দারুণ ! কতো জায়গায় ঘুরেছি, বালীদ্বীপ, জাভা, বাটাভিয়া (এখনকার নাম 'জাকর্তা')। মোট কথা,—ইন্দো-নেশিয়াও দারুণ সুন্দর। কিন্তু এখানকার সৌন্দর্য অন্যরকম। ওখানকার সবুজের সমারোহ এখানে নেই, কিন্তু এখানে যা আছে তা আবার অন্য কোথাও নেই ! ছোট-ছোট কতো যে দ্বীপ আছে, তার ঠিক নেই ! আমরা এখানকার সব থেকে উঁচু পাহাড়টার চূড়ায় গিয়ে একদিন উঠেছিলাম, কতো উঁচু জানেন ? মাত্র পনেরো শ ফিট। কিন্তু ওখান থেকে দৃশ্য দেখা যায় ভারী অদ্ভুত ! এই দ্বীপটা আঁকাবাঁকা, মাঝখানে শিরদাঁড়ার মতো সারা দ্বীপ জুড়ে রয়েছে পাহাড়ের শ্রেণী। পাহাড়ের সেই শিরদাঁড়াকে ঘিরে দুপাশে ঢালু হয়ে নেমেছে মাটি, সেখানে জন্মেছে গাছপালা ! মানুষ এসে সেই ঘন জঙ্গল কেটেই গড়ে তুলেছে জনপদ !

—খুব ঘুরেছেন এই দ্বীপে ?

—কোথায় আর ঘুরলাম !—ঘোষাল বললেন,—মূল এই ভূখণ্ড ছাড়া গিয়েছিলাম কাছেরই ছোট্ট একটা দ্বীপে। মাত্র ৮৪০ ফিট উঁচু একটা পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে দ্বীপ। বন্দর থেকে বেরুলেই ওকে স্পষ্ট দেখা যায়, পূর্ব-দিকে ; মাত্র তিন মাইল দূরে। 'সেণ্ট আনে আইল্যাণ্ড !' ফরাসীরা যেদিন এই দ্বীপ দখল করে, সেদিন ছিল সেণ্ট আনের উৎসব ! সেজন্যই এই নাম-করণ। ওখানে গিয়ে অদ্ভুত এক মানুষের কথা জেনে এসেছিলাম। শুনবেন ?

—বলুন ?

ঘোষাল বলতে শুরু করলেন,—ঘটনাটা আজকের নয়, আঠারো শতকের কথা, যদিও আজকের লোক তা ভুলে যায় নি। তখনকার দিনে সিসেলস ছিল মরিশাসের কর্তৃত্বাধীন। তখন মরিশাসের নাম ছিল 'ইল-দ্য-ফ্রাঁস'। সেখান থেকে একটি জাহাজে করে সাদা মানুষ আর কালো মানুষ মিলিয়ে পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে ঐ দ্বীপে এসে উঠলেন মঁশিয়ে দুবারে বলে এক বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ। তখন ফ্রান্সের অধিপতি ছিলেন পঞ্চদশ লুই। তাঁর দরবারের প্রভাব-শালী ব্যক্তিদের কাছে লম্বা লম্বা চিঠি লিখতেন এই বারে। একবার লিখলেন, সেণ্ট আনে দ্বীপে তিনি একটি রুপোর খনি আবিষ্কার করেছেন, তা থেকে রাশি রাশি সম্পদ তিনি জোগাড় করে দিতে পারবেন। রাজ-দরবার এ খবরে বিশেষ

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, পাঠালেন আর্থিক সাহায্য দফায় দফায়, যেমন বারে সাহেব চাইছিলেন। কিন্তু কার্যকালে খতিয়ে দেখা গেল, 'রাশি রাশি সম্পদ' তো দূরের কথা, একটি কাণাকড়িও আসছে না! তখন তাঁরা সম্রাট লুইকে সব জানালেন, বললেন, তদন্ত করে দেখা হোক। এই দুবোরে সাহেবটি নানারকম পরিকল্পনা দাখিল করতেন ফরাসী-দরবারের আমীর-ওমরাওদের কাছে। তাতে যে কতরকম ব্যবসার কথা থাকতো তার ঠিক নেই! ভালো ভালো দামী কাঠ, জ্বালানী কাঠ, মাছের তেল, সামুদ্রিক লবণ, ইঁট, কচ্ছপ, মাছ, মুরগী, ছাগল, চিনি, নারকেল, নারকেল তেল, নীল-চাষ, ধান, কফি, এমন কি 'ডুগং' বা 'সামুদ্রিক গাভী' যাকে বলা হতো, তার চামড়া, গাধা, ঘোড়া, কিছুই বাকি ছিল না তাঁর তালিকা থেকে। যা মাথায় আসতো তাই লিখে ফেলতেন। সেই সব ব্যবসাই তিনি করতে চেয়েছিলেন। ব্যবসার জন্য কাঁচামাল এখানে নাকি প্রচুর! কিন্তু এই ফাঁপানো ফানুসটি ফেঁসে গেল ১৭৭৫ সালে। ফ্রান্স থেকে পণ্ডিচেরী যাচ্ছিলেন ম'শিয়ে পেরো। তাঁর জাহাজ মাঝপথে এসে থামলো এই 'মাহে-সিসেলস'-এ। তিনি তদন্ত করে দেখলেন, সব ভাঁওতা। কোথায় রূপোর খনি, কোথায় ডুগং-এর চামড়া, কোথায় সামুদ্রিক লবণ, কোথায় হচ্ছে নীলের চাষ, ধান বা কফি? বরং শোচনীয় দুর্ভিক্ষে শ'য়ে শ'য়ে লোক মারা গেছে! এই ফেরেববাজ দুবোরেকে বন্দী করে তিনি গেলেন ভারতে, পণ্ডিচেরিতে। এক বছর পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দেশে আর সে ফিরে যায় নি, বছর দুই পরে পণ্ডিচেরিতেই সে মারা যায়!

আমরা হাঁ করে ঘোষালের কথা শুনছিলাম। ঘোষাল বললেন,—আর একটি বিচিত্র মানুষের কথা শুনবেন? লোকে বলতো, সিসেলস্ ছিল জলদস্যুদের দ্বীপ। তারা সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরতো আর সুবিধামতো জাহাজ লুটতো। সেই সব লুটের মাল এনে লুকিয়ে রাখতো এই দ্বীপে। এই গল্প পল্লবিত হয়ে এমন কাণ্ড বাধিয়েছিল যে, ইয়োরোপ থেকে বহু লোক আসতো ঐ সব গুপ্তধনের সন্ধানে। আপনাকে কী বলবো, ভিক্টোরিয়ার উল্টোদিকে—পাহাড় পেরিয়ে—একটা জায়গা আছে সমুদ্রের ধারে, তার নাম, 'বেল আম্বর',—তারই কাছে 'দনদম রক'। সেখানে বিলেত থেকে আসা একটি পাগল মানুষ এখনো পাথর ফাটাচ্ছে গুপ্তধনের খোঁজে। টাকা আনছে দেশ থেকে, ফুরোচ্ছে, আবার আনছে। তার ধারণা গুপ্তধন একদিন না একদিন সে পাবেই!

—তাকে দেখেছেন আপনি?

—না, দেখিনি। শুনে এলাম তার কথা।

ঘোষাল একসময় উঠলেন, বললেন,—জাহাজে একবার ঘুরে আসি, কী বলেন? সন্ধেবেলায় নামবো। আজ রাত বারোটা পর্যন্ত ছুটি। সেজন্য তখন এসে আবার গল্পের খেই ধরবো, জ্বালাতন করবো!

ঘোষালকে এগিয়ে দিতে আমাদের 'গ্যাং-ওয়ে' বা নিচে-নামবার সিঁড়ির

কাছে এসেছি, কার্তিক কারও ডাক পেয়ে অন্য দিকে ছুটে গেছে, হঠাৎ ঘোষাল আমার কাঁধের কাছটা ধরে টান দিলেন, বললেন,—আসুন চট করে আপনাদের 'স্টারবোর্ড'-এ, একটা জিনিস দেখাই।

বলে, কেবিনগুলোর গলিতে ঢুকে আমাকে নিয়ে গেলেন উলটো দিকে, জলের ধারে। বললেন,—সামনে তাকিয়ে দেখুন। ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখছেন না?

—হ্যাঁ।

—ও দ্বীপে কোনো লোকজন নেই। অতো ছোট দ্বীপে লোকজন থাকবে কী করে?—ঘোষাল বললেন,—বেশি দূরে নয়, বড়ো জোর মাইলখানেক, কি একটু বেশি। দেখতে পাচ্ছেন না জঙ্গল-জঙ্গল চেহারাখানা!

—হ্যাঁ।

—এখানকার গাছপালা 'সবুজ', কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার মতো 'সতেজ সবুজ' নয়। কী-রকম যেন একটা 'রহস্যময়-রহস্যময়'-ভাব। তাই না?

—তা হবে।

উনি বললেন,—এখানকার লোকের কী বিশ্বাস, জানেন? ওখানে গেলে বিপদ আছে। কখন যে সেই বিপদ নেমে আসবে কেউ জানে না! হঠাৎ-হঠাৎ মানুষ ওখানে হারিয়ে যায়! একবার একজন একটি মেয়েছেলেকে নিয়ে ওখানে বেড়াতে যায়। তরুণী, সুন্দরী মেয়েছেলে! বোধহয় লোকটির বউ। কিন্তু সেই বউ আর ফিরে আসে নি, হঠাৎ হারিয়ে যায়, তাকে আর পাওয়া যায় না। তারপর কী হলো শুনবেন? কুড়ি বছর পরে তাকে আবার ওখানে ফিরে পাওয়া গিয়েছিল। কুড়ি বছরে তার বয়স কিন্তু একটুও বাড়ে নি, যেমন দেখতে ছিল, তেমনি আছে। মূল ভুখণ্ডে ফিরে এসে স্বামীকে দেখে আর চিনতে পারে না! স্বামীর পাকা চুল আর বিপর্যস্ত চেহারা দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিজের মা ছিল বেঁচে, তাকেও আর চিনতে পারে না!

—তারপর?

—তারপর আর কী! সেজন্য লোকে ও-দ্বীপে আর পা দেয় না!

বললাম,—মশাই, এ-বকম একটা ঘটনা জেমস ব্যারীর নাটকে পড়েছি।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। নাটকের নাম, 'মেরি রোজ।'* এটাকে দেশীয় ছাঁচে ফেলে আমাদের এক নাট্যকার, যোগেশ চৌধুরী, একটি নাটক তৈরি করেছিলেন, সে নাটকের অভিনয়ও হয়েছিল, নাম ছিল, 'মহামায়ার চর।'

—দাঁড়ান, ফিরে আসি। জোর গল্প জমবে রাত্তির বেলায়।

বলে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেলেন ঘোষাল।

তা সত্যিই, মারাত্মক গল্প জমেছিল সন্ধ্যেবেলায়। ঠিক সন্ধ্যেবেলা অবশ্যি নয়, রাত্তিরবেলা। সন্ধ্যে হতে না হতেই ঝেঁটিয়ে সবাই শহর বেড়াতে গেল, এমন কি কার্তিকও গেল। আমিও হয়ত যেতাম, কিন্তু ঘোষাল আসবেন

বলেই গেলাম না। সন্ধ্যেসন্ধি সব জাহাজেই রাত্তিরের খাওয়া খেয়ে নেওয়ার নিয়ম। সুতরাং সে কাজটা সেরেই সবাই বেরিয়ে গেলেন। আমাদের জাহাজ থেকেও বেরিয়ে গেল সবাই, এমন কি ক্যাপ্টেন পর্যন্ত। মেরামতির জন্য আমাদের বয়লারগুলি নির্বাপিত, সেজন্য ইঞ্জিনের খালাসীরাও বেরিয়ে গেল দলবেঁধে। মনে হয় কার্তিকও সঙ্গ ধরেছে তাদের। থাকার মধ্যে আমাদের সেকেণ্ড অফিসার, আর 'ইঞ্জিন ডিপার্ট'-এর সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। সিঁড়ির কাছে পাহারা আছে একজন, আর রয়ে গেলাম আমি। আমি গ্যাংওয়ের কাছে দাঁড়িয়ে তারই সঙ্গে গল্প করছিলাম, এমন সময় তাঁর জাহাজ থেকে নেমে আমাদের জাহাজের সিঁড়ির কাছে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ঘোষাল, হেঁকে বললেন,—কী করছেন মশাই, নেমে আসুন না? দারুণ চাঁদ উঠেছে, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না! নেমে আসুন।

অগত্যা নেমে জেটির ওপর এসে দাঁড়ালাম। দুপাশে বারিরাশি, মাঝখান দিয়ে বাঁধানো রাস্তাটা চলে গেছে শহরের দিকে, রাস্তার মাঝে মাঝে 'ল্যাম্পপোস্ট,'—রাস্তাটা তখন একেবারে ফাঁকা, আমরা দুজন সেই রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। হয়ত সময়টা পূর্ণিমার কাছাকাছি, চাঁদ দেখা যাচ্ছে আকাশে, উজ্জ্বল চাঁদ, আর সারা দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে সে জ্যোৎস্না, জলের ওপরে হাওয়া এলোমেলো খেলছে বলে ঢেউ উঠছে খুব ছোট ছোট। ঘোষাল বললে,—পাগল করা জ্যোৎস্না, তাই না?

বললাম,—আমি তাহিতিতে দারুণ জ্যোৎস্না দেখেছিলাম। একটি ডিমের আকারের উপ-হ্রদ, জল একেবারে স্থির, ঠিক আয়নার মতো, তাতে মুখ দেখছে আকাশের চাঁদ! আর কিনারের দিকে পড়েছে গাছের ছায়া।

আমরা কথা বলতে বলতে তখন মূল ভুখণ্ডের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। জলের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ কী দেখে একটু যেন চমকে উঠলেন ঘোষাল। বললেন,—আরে! জলে ওটা কী?

জলের দিকে তাকালাম। অনেক দূরে—প্রায় সেই দ্বীপটার কাছাকাছি একটা আবছা কালো মতন কী যেন নড়ছে! বললাম,—দেখুন তো, ওটা নৌকো নয় তো?

ঘোষাল তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন, তারপরে বললেন,—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। নৌকো। কিন্তু চলেছে কোথায় দেখছেন তো? ঐ দ্বীপটার দিকে! কী সর্বনাশ! আপনাদের, কিম্বা আমাদের জাহাজের কেউ নয় তো!

বললাম,—আমাদের জাহাজের লোক সব তো শহরে গেছে! যে দু-একজন আছে, তারা আছে ডিউটিতে, তারা জাহাজ ছেড়ে নড়বে না!

—তাহলে কি আমাদের জাহাজের কেউ? ঘোষাল বললেন,—না, তা কী করে হবে? আমার মতো জাহাজের সবাই শুনেছে ও গল্প—ঐ হারিয়ে যাওয়ার গল্প!

আমরা চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম নৌকোটার দিকে কিছুক্ষণ। বেশ দেখতে

পাচ্ছি, নৌকাটা গিয়ে ভিড়লো ঐ সর্বনাশা দ্বীপটারই কিনারে। এখান থেকে আরোহীকে দেখা যায় না। ঘোষাল বলে উঠলো, বেশ উত্তেজিত তাঁর কণ্ঠস্বর, —যে-ই হোক, সে-বোধহয় বিপদের কথাটা ঠিক জানে না! কী মশাই, একটি অ্যাডভেঞ্চার করবেন? যাবেন ঐ দ্বীপে, ওদের rescue করতে?

—কী করে?

উনি আঙুল দিয়ে দেখালেন আমাদের কোণের দিকটা। রাস্তাটা গিয়ে যেখানে মূল ভূখণ্ডে মিলেছে, সেখানকার জলে আরও দুটো ছোট পান্‌সী নৌকো খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে, কিন্তু আশেপাশে কোনো লোক নেই।

বললাম,—কিন্তু, ও কাদের নৌকো?

ঘোষাল বললেন,—ও-সব ভাড়া দেবার নৌকো। দিনের বেলায় তো দেখেন নি? হাঁক দিয়ে দিয়ে লোক ডাকে। জলে একটু বেড়ায় ওরা সওয়ারী নিয়ে।

—কিন্তু নৌকোওয়ালা কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

ঘোষালকে তখন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসেছে, বললেন,—কুছ পরোয়া নেই! আমরা নিজেরাই নৌকো বাইবো! পারবো না ভেবেছেন? নেভীর লোক আমি, এসব আমাদের রীতিমত শিখতে হয়েছে! আসুন? বলে, আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন একটি নৌকোর কাছে।

এইভাবে সিসেল্‌স্ পৌঁছবার প্রথম দিনেই শুরু হয়ে গেল আমাদের অ্যাডভেঞ্চার। ছোট্ট পান্‌সী একজনেই দুটো দাঁড় বায় দু-হাতে, বসে বসে। ছপ ছপ করতে করতে আমরা এগিয়ে চলছিলাম সত্যি সত্যি ঐ দ্বীপের দিকে! এই শান্ত বারিরাশি সমুদ্রের অংশ হলেও একে সমুদ্রের 'ব্যাক-ওয়াটার' বলেই গণ্য করা উচিত, কারণ, বন্দর-প্রবেশ মুখে একটা 'রীফ' বা 'ডুবো পাহাড়' আছে, যেখানে প্রতিহত হয়ে সমুদ্র-স্রোত যাচ্ছে অন্যদিকে ঘুরে, তুফান-টুফান না হলে এই অংশটা বিরাট উপ-হ্রদের মতোই স্থির থাকে, তখন পান্‌সী নিয়ে নৌকোবিহারের বাধা কোথায়? এইসব ভাবতে ভাবতে আমরা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছিলাম দ্বীপটার দিকে। ঘোষাল নিশ্চুপে দাঁড় বাইছিলেন, কোনো কথা বলছিলেন না। একসময় আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম, বললাম,—দ্বীপের ঐ 'মিথ্'টা সত্যিই ভাবিয়ে তোলে। আচ্ছা জেম্‌স ব্যারী-সাহেব কি কখনো এখানে এসেছিলেন? এখান থেকেই কি পেয়েছিলেন তাঁর ঐ নাটকের মূল বিষয়বস্তু?

ঘোষাল বললেন,—ওসব পুঁথিগত কচ্‌কচি এখন থামান। আমি ভাবছি অন্য কথা। কে গেল ওখানে? একা গেল, কি সঙ্গে আর কেউ আছে? যদি সত্যি সত্যি হারিয়ে যাবার ঘটনা ঘটে?

বললাম,—মন্দ হয় না! কুড়ি বছর পরে আবার তো ফিরে আসা যাবে!

—তার নিশ্চয়তা কী?

—আপনার গল্প তো তাই বলে!

—চুপ। আমরা এবার কাছাকাছি এসে পড়েছি। লোকটা যেন জানতে না পারে, আমরা পিছনে ধাওয়া করেছি।

সুতরাং আবার নীরবতা। ঘোষাল যেন দাঁড়ও ফেলতে লাগলেন সন্তর্পণে! এখান থেকে অতিকায় একটা হাতির মতো দেখাচ্ছে পাহাড়টাকে। গা বেয়ে ঢালু হয়ে নেমেছে জঙ্গল, তীরের দিকে ভুমি যেখানে সমতল, সেখানে জঙ্গল তেমন না থাকলেও পাহাড় ঘেঁষে বড়ো বড়ো কয়েকটি গাছ ডালপালা মেলে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে!

অবশেষে আমরা এসে পেঁছিলাম। ঘোষাল সুদক্ষ নাবিক, নৌকোটাকে ভেড়ালো একেবারে ওদের নৌকোর গা ঘেঁষে। বললে,—নৌকো রেখে জঙ্গলে ঢুকেছে। দেখেছেন?

—আমরা কী করবো?

ঘোষাল বললেন,—তাইতো ভাবছি। ভেবেছিলাম, নৌকোতেই থাকবো, যে এসেছে, সে আমাদের দেখতে পেলেই ডাকবে! কিন্তু সে তো ডাকলো না! আমরাও তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না? পাচ্ছেন কি আপনি?

—না।

অগত্যা আমাদেরও নামতে হয়।

—ধরুন, আমরা নিজেরাই যদি হারিয়ে যাই!

ঘোষালের মুখ গম্ভীর হলো, বললেন,—ঠাট্টার কথা নয়, দ্বীপের মাটিতে পা দিলে সে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। কী জানেন? এই অদ্ভুত নির্জনতা, গাছপালার ঐ নিঃঝুম ভার, তার সঙ্গে এই রকম জ্যোৎস্নার মায়া,—সব মিলিয়ে হারিয়ে-যাবার ঘটনাটা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না!

—তাহলে, নামবার দরকার কী? এখানেই বসে থাকুন না। এক সময় লোকটা তো ফিরবেই! তখন—

বাধা দিয়ে ঘোষাল বলে উঠলেন,—কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করার তো সীমা আছে! বারোটায় জাহাজে রিপোর্টিং! এক মিনিট এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই!

বলতে-না-বলতেই ঘোষাল পাশের নৌকোয় কী দেখে যেন উৎসুক হয়ে উঠলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন,—আরে!

—কী!

ঘোষাল আমার হাত ধরে টেনে কাছে আনলেন, তারপরে ওদের নৌকোর ভিতরটা দেখিয়ে বলে উঠলেন,—ঐ দেখুন না!

ওদের নৌকোটা ঠিক আমাদেরটার মতোই একটি ছোট পানসী। ভিতরে গলুইয়ের কাছে পড়ে আছে কয়েকটা জামা কাপড়। পাশাপাশি দুজায়গায় দুটি স্তুপ! একটিতে কালো কিম্বা ঘোর নীল রঙের ট্রাউজার আর খয়েরী ডোরা কাটা সাদা সার্ট, পাশে পুরানো মোটা চামড়ার মোকাসিন জুতো। অন্যটিতে একটি ছোট স্যাণ্ডেল, খয়েরী কিম্বা কালো রঙের ফ্রক, প্যাণ্টি, মেয়েদের ব্রা। দেখে আমাদের চক্ষু যাকে বলে চড়কগাছ! খানিকক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম, কথাই বলতে পারলাম না! শেষপর্যন্ত ঘোষালই নীরবতা

ভঙ্গ করলেন, চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন,—বুঝেছেন ব্যাপারটা কী? এসেছে দুজন। তার মধ্যে একজন মেয়েছেলে। কিন্তু ওরা কাপড়চোপড় ছাড়লো কেন? অন্য কোনো পোষাক নিয়ে এসে সেগুলো পরেছে কী? চলুন নামি।

—নামবেন!

—হ্যাঁ।

বলতে বলতে উনি ওদের নৌকোয় পা রেখে তার ওপর দিয়ে হেঁটে বালুবেলার বুকে লাফিয়ে নামলেন, আমিও ওঁকে অনুসরণ করলাম। শুরু হলো আমাদের অনুসন্ধান। বালুবেলার বেষ্টনী খুব চওড়া নয়, তারপরেই কতোগুলো আঁকাবাঁকা ছোট ছোট কাঁটা গাছ, এদিকে-ওদিকে দু-ফিট—তিনফিট উঁচু ঝোপ, তাও এক জায়গায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে নেই, 'একক' ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা তাদের প্রহরা পার হয়ে বড়ো-বড়ো গাছগুলির এলাকায় প্রবেশ করলাম। আস্তে আস্তে, পা টিপে পা টিপে দুজনে এগোচ্ছিলাম। জ্যোস্না এখন খুব উজ্জ্বল নয়, বরং পাণ্ডুর। যাকে বলে, চাপা জ্যোস্না। আকাশে মেঘ ভেসে আসায় এ-রকম হয়েছে আর কী! তার ফলে দ্বীপের রহস্যময়তা আরও গভীর হয়েছে! আমরা পাহাড়ে উঠবো কী উঠবো না, সে-সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। পাহাড়ে ওঠবার পথই বা কোথায়? এখানে মানুষও আসে না, গরু-ছাগলকে চরাতেও আনা হয় না। কোনো জন্তু জানোয়ারও নাকি নেই, যে তাদের চলায় চলায় পথের সৃষ্টি হবে! বোধহয় আধঘণ্টার মতো আমরা ঘুরছিলাম, হঠাৎ কারও চাপা কণ্ঠস্বর শুনে আমরা চমকে উঠলাম। ফিরে তাকিয়ে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখি মসৃণ একটি পাথরের খণ্ড, তাতে জ্যোস্নার ঝলক গাছের আড়াল দিয়ে এসে তীক্ষ্ন ফলার মতো পড়েছে! আর সেই আলোর বৃত্তে বসে আছে দুটি নরনারী, আমাদের দিকে পিছন ফিরে। সম্পূর্ণ নিরাবরণ। বোঝা গেল, পরিচ্ছদ নৌকোয় ত্যাগ করে অন্য পোষাক পরে নি। আদিম দুটি নর-নারীর মতো আদিম অরণ্যে এসে তারা বসে আছে! কী খেয়ালে, কে জানে!

আমরা আরও একটু এগিয়ে গেলাম। সামনে বিরাট একটা গাছের আড়াল। ফিট পাঁচেক উঠে গাছটা দুপাশে দুটি মোটা ডাল ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সেই ফাঁকটুকু দিয়ে উঁকি দিলাম। তাদের কথা কানে আসছে, কিন্তু ভাষা একটুও বুঝতে পারছি না। কী কথায় মেয়েটি যেন একটু হেসে উঠলো, হাসির স্বরটা মিষ্টি, যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠলো হঠাৎ! তার ঝাঁকড়া চুল পিঠের খানিকটা দূর পর্যন্ত নেমেছে! কে মেয়েটি? ছেলেটিই বা কে? ছেলেটি মোটামুটি স্বাস্থ্যবান, তার মাথায়ও ঝাঁকড়া চুল, কিন্তু নিগ্রোদের মতো কোঁকড়া নয়। পিছন থেকে মেয়েটিকে যতদূর দেখতে পাচ্ছি, তাতে তাকে সত্যিই সুগঠনা তন্বী তরুণী আখ্যা না দিয়ে উপায় নেই! ছেলেটির গায়ের রঙ যতদূর জ্যোস্নায় দেখা যাচ্ছে, একটু চাপা, কিন্তু ঘোর কালো নয়। আর মেয়েটিকে

কিন্তু তুলনায় ফরসা বলেই মনে হচ্ছে। সরু কোমর। আর, পেলব শরীরের ওপর আবছা চাঁদের আলো প'ড়ে যেন বড়ো কোমল, বড়ো লাবণ্যময় বলে মনে হচ্ছে! যেভাবে দুজনে পাশাপাশি বসে আছে, চাপা গলায় কথা বলছে, সেই অদ্ভুত তন্ময় ভাবকে শিল্পী হলে ধরে রাখতো, রেখায়, অথবা, ভাস্কর্যে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। ঘোষাল আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে পিছিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। বেশ খানিকটা পিছিয়ে আসবার পর চাপা গলায় বললেন,—কী করা যায় বলুন তো? আমাদের হঠাৎ দেখলে ওরা চমকে উঠবে, তারপরে ছুটে পালাবে নৌকোর দিকে, তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরবে! ওরা কে, বুঝতে পারছি না, তবে ছেলেটিকে আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। যখন মুখ ফিরিয়ে মেয়েটির কানে কানে কথা বলছিল, তখন মুখখানাও আমি দেখে নিয়েছি, ও আমাদের 'দিল্লী'র কেউ নয়।

বললাম, আর আমিও যতদূর বুঝেছি, ও আমাদের জাহাজেরও কেউ নয়! ঐরকম ঝাঁকড়া চুল আমাদের কারও নেই! সুতরাং ওরা যা খুশি করুক, আমরা ফিরে যাই!

ঘোষাল বললেন,—ফিরে তো যাবোই, কিন্তু ওরা কারা? স্থানীয় লোক কেউ ভয়ে এ-দ্বীপে আসে না! তাদের সংস্কার বড়ো সাংঘাতিক—একেবারে বদ্ধমূল! তাহলে এরা দুজন এলো কী করে, বিশেষ ক'রে এই রাত্রে? ওদের কি ভয়-ডর নেই? আমি সেজন্যই ভাবছি, দেখা দেবো। ওরা পালিয়ে যাক। নইলে, সত্যিই ঐ 'মেরী রোজ'-এর মতো কোনো দুর্ঘটনা যদি ঘটে?

এ-কথার কী উত্তর আমি দেবো? জেটিতে থাকলে হয়ত অন্য কথা বলতে পারতাম, কিন্তু এই দ্বীপের এই অরণ্যের রহস্যময়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের ঐ হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা একেবারে অবিশ্বাস করাও যাচ্ছে না!

—আসুন।

বলে, আমাকে নিয়ে উনি সেই গাছের কাছে এলেন। ওরা ঠিক সেই একই ভাবে বসে আছে পাশাপাশি। সেইরকম দুর্বোধ্য ভাষায় মেয়েটিকে কী যেন বলে যাচ্ছে ছেলেটি, মেয়েটি এক মনে শুনছে। কারও হুঁস নেই! থাকলে আমরা যতই পা টিপে চলি না কেন, এই নির্জন নিশীথে—অখণ্ড নিঃশব্দতার মধ্যে ওরা ঠিক শুনতে পেতো!

ঘোষাল একসময় আমাকে ইঙ্গিত করে গাছের আড়াল থেকে বাইরে চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়ালেন, তখনো ওরা ওঁকে দেখতে পায় নি! আমিও পায়ে-পায়ে ততক্ষণে ঘোষালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ওদের ঠিক পিছনেই আমরা। ঘোষাল হঠাৎ হেঁকে উঠলেন,—হে! ইউ দেয়ার!

প্রবল চমকে কেঁপে উঠে ওরা মুখ ফেরালো। তার পরের মুহূর্তেই সরে গেল একটি মহীরুহের আড়ালে।

বুঝলাম, এইবার ওরা পালাবে। কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে ওরা পালালো না। গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে ছেলেটি আমাদের দেখতে,

লাগলো, তারপরে, চমকের ধাক্কাটা সামলে ছেলেটি নিঃসংকোচে আমাদের সামনে এলো, দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন প্রশ্ন করলো, তার মধ্যে একটি শব্দই আমার বোধগম্য হয়েছিল, 'বোয়া', যার অর্থ=জঙ্গল। বোধ হয়, বলতে চায় এই জঙ্গলে আমরা কে? ঘোষাল আকারে ইঙ্গিতে জানালেন, আমরা নৌকো করে এসেছি। জাহাজী লোক—Shipman. শিপ শব্দটা বোধহয় জানা, তাই কথাটা সে আওড়ালো, তারপরে আরও একটা কী প্রশ্ন করলো, একটু ফরাসী-ফরাসী গন্ধ পেলাম, কিন্তু তবু ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এবার সে গাছের দিকে মুখ ফিরিয়ে মেয়েটির উদ্দেশ্যে কিছু বললো। আর, তার পরেই ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা। মেয়েটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো, তার দুটি হাত তার মধ্যদেশের কাছে জড়ো করা। তার অপরূপ তরুণ দেহবল্লরীর বর্ণনা কী ভাবে করবো জানি না, তার মুখশ্রীও সুন্দর, টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট। দেহবর্ণ খাস ইয়োরোপীয়দের মতো অতো ঝকঝকে না হলেও ফর্সাই বটে। মেয়েটি বোধহয়, একটু-আধটু ইংরেজী জানে, তাই ছেলেটির ইঙ্গিত পেয়ে আমাদের প্রশ্ন করলো, —এ এ্যাঞ্জ্যার! ইউ শিপম্যান?

—ইয়েস।

—দেন, হোয়াই কম্? হোয়াই দিস্‌ত্যার্ব?

ঘোষাল বোঝাতে চেষ্টা করলেন, ওদের 'ডিসটার্ব' করতে আমরা আসি নি, আমরা এসেছি ভয়ে। এ-দ্বীপের কথা যা শোনা যায়, তাই যদি ঘটে? যদি তোমরা হারিয়ে যাও? If you are lost!

মেয়েটি বোধহয় বুঝলো, এবার একটু আবেগ ফুটলো তার কণ্ঠে, বললো, —We want! We want to be lost! (উই ওয়ান্‌ত্ তু বি লস্‌ত্) অর্থাৎ, আমরা হারিয়েই যেতে চাই!

বলে, মেয়েটি ছেলেটির কাঁধে হাত তুলে দিলো, অল্প একটু হেসে আমাদের দিকে পিছন ফিরলো। তারপরে ওরা বসে পড়লো, চটালো পাথরটার ওপর। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ ওরা! যেন এই রহস্যময় দ্বীপ চাঁদের আবছা আলোয় আরও রহস্যময় হয়ে ওদের দুজনকে এক আদিম জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে, যেখানে নেই লজ্জা, নেই সংকোচ, নেই শঙ্কা!

ওরা কতক্ষণ দ্বীপে থাকবে কে জানে, আমরা ধীরে ধীরে চলে এলাম নৌকোয়। তারপর সেখান থেকে আবার ছপছপ ক'রে দাঁড় বেয়ে তীরভূমির দিকে। জেটি সেইরকমই নির্জন, জাহাজ সেইরকমই নিস্পন্দ, শুধু দিল্লীতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে, অর্থাৎ বয়লার চালু হয়েছে, ইঞ্জিন ধক্‌ধক্ করছে, কাল ভোরেই বন্দর ছেড়ে চলে যাবে। নৌকাটাকে যথাস্থানে বেঁধে রেখে আমরা জেটিতে এলাম। ঘোষাল কথা বললেন এতক্ষণ পরে। নৌকো বাইবার সময় তিনি একটি কথাও বলেন নি। বলতে পারি নি আমিও। কী-ই বা বলার ছিল?

ঘোষাল বললেন,—কথাটা শুনলেন ? "We want to be lost ! আমরা হারিয়ে যেতে চাই !" তাৎপর্য কী ? অসহ্য দুঃখ ? না, অসহ্য আনন্দ !

—যাই বলুন, She is Divine !

—ছেলেটিও কি Divine নয় ?

কাছেই—জেটিতে জাহাজ বাঁধবার জন্য দুটো Capstan পাশাপাশি ছিল। আমরা সেখানে বসলাম।

ঘোষাল বললেন,—দেখুন, ঐ দ্বীপ থেকে ফেরার পর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। আমরা পশুপক্ষী দেখে মুগ্ধ হই, বনের মধ্যে মুক্ত হরিণ-হরিণী দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু যথাযোগ্য পরিবেশে নিরাবরণ মানুষ দেখেও মুগ্ধ হতে হয় ! I mean বিশুদ্ধ আনন্দ আস্বাদন করবার মুগ্ধতা ! এই মুগ্ধতা আর কামুকতা এক জিনিস নয়, কী বলেন ?

—মাপ করবেন, আমার দুটো জিনিসই একসঙ্গে গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা থেকে আরেকটাকে এই মুহূর্তে আলাদা করতে পারছি না !

ঘোষাল আমার চোখের দিকে তাকালেন, একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললেন,—পারবেন, আজ না হয়, কাল পারবেন। আচ্ছা, গুডনাইট !

বলে, আমার হাত ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে হন হন করে দিল্লীর দিকে এগিয়ে গেলেন, সময় কিন্তু যথেষ্ট হাতে ছিল গল্প করবার। ঘড়িতে তখন রাত মাত্র স্যাড়ে দশটা !

জাহাজে ওঠবার আগে সেই দ্বীপটির দিকে তাকালাম। কোথাও এক বিন্দু নড়ছে না। ওরা হারিয়ে যেতে চায় বলেই ঐ দ্বীপে গেছে, কিন্তু সত্যিই যদি ওদের মধ্যে একজন হারিয়ে যায় ? যদি ঐ মেয়েটিই যায় হারিয়ে ? আমি জেটিতে একা পায়চারী করলাম প্রায় বারোটা পর্যন্ত। তখনো দ্বীপের ওরা ফিরলো না। দু-জাহাজেরই লোক একে একে ফিরে আসতে লাগলো, আমি তাদেরই স্রোতে গা ভাসিয়ে জাহাজে এসে উঠলাম, আশ্রয় করলাম আমার কেবিন। স্টারবোর্ড সাইডে গিয়ে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আরও অনেকক্ষণ ঐ দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকা যেতো, কিন্তু দেহমন তার অনুকূলে ছিল না, দু-চোখ ভরে নামছিল সুগভীর সুপ্তি।

পরদিন দিল্লী-জাহাজের 'সান-রাইজ-বয়'-এর বিউগিল শুনেই আমার ঘুম ভাঙলো। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজে ঐ সুর। ওদের 'ডেক্'-এ সবাই তৈরি হয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে একযোগে সূর্যপ্রণাম করছে ! গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের প্রবর্তিত নৌ-বিভাগীয় এই রীতি আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে ! সুর শেষ হলো, আর তারপরেই শুরু হলো ডেরিকের ঘর্ঘর শব্দ,— নোঙর উঠছে, জাহাজ ছাড়বে। আমাদের গলুইয়ের কাছে দাঁড়ালাম, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কোথায় পাবো ঘোষালকে ? পেলাম না দেখতে। চলে এলাম স্টারবোর্ড-সাইডে। দ্বীপের কাছে এখন সেই নৌকোটাকে দেখা যাচ্ছে না। আশা করা যায়, ওরা সত্যিই ফিরে এসেছে, হারিয়ে যায় নি।

যাই হোক, দিল্লী তার সমারোহ নিয়ে একসময় চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমাদের জাহাজে যথারীতি মেরামতি চলছে। বেলা প্রায় দশটা নাগাদ ক্যাপ্টেন দুধওয়ালা আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন,—এই যে! ঘুরে-ফিরে সব দেখছো তো? আমরা কেউ এখানে আগে আসি নি! যা দেখছি, সবই নতুন, নয় কী?

—হ্যাঁ স্যার।

দুধওয়ালা আয়েস করে তাঁর ঘরের আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন, হাতের কাছে খানকয়েক বাঁধানো নোট্-বই। এসব বই কোম্পানী থেকেই সচরাচর ক্যাপ্টেনকে দেওয়া হয়। ঘরে তখন কেউ ছিল না। বললেন,—তোমার তো এখন কোনো কাজই নেই। শুয়ে-বসে দিন কাটাতে পারবে। কিন্তু সে তো ভালো কথা নয়! আলস্যে কাল কাটাবে কেন? তুমি আমার সঙ্গে চলো। লাঞ্চের পরেই রওনা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে একজনের সঙ্গে। অনেক কিছু জানা যাবে তার কাছ থেকে। তুমি সব শুনবে, দরকার মতো নোট্ করবে, আর ফিরে এসে সে-সব ভালো করে লিখে আমাকে টাইপ করে দেবে। Will you, please?

—নিশ্চয়ই স্যার। এতে আমারও উপকার হবে।

—অনেক কিছু জানতে পারবে। তাই না?

—হ্যাঁ স্যার।

—তাহলে তৈরি থেকো। লাঞ্চের পরেই বেরুবো।

কথামতো লাঞ্চের পর আমরা বার হলাম। পোর্ট মোর্সবিতে আর এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বেরিয়ে সহকর্মীদের ঈর্ষার শিকার হয়েছিলাম, এবার তা নয়। এবার ডিউটি-চার্টে আমার নাম ছিল। তাছাড়া শুনলাম, এ-ধরনের কাজে জাহাজের রাইটাররাই ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করে থাকে। দুধওয়ালার পরণে সাধারণ পোষাক, ট্রাউজার আর সার্ট, হাতে ছড়ি। 'লং-পীয়ার' দিয়ে হেঁটে খাস ভিক্টোরিয়ার দিকে আমরা রওনা হলাম। ডানদিকেই পড়লো জলের ওপর একটা ঘেরা জায়গা, দেখতে অনেকটা বিশাল চৌবাচ্চার মতো। দুধওয়ালা ছড়ি দিয়ে সেইদিকে নির্দেশ করে আমাকে বললেন,—জানো, এখানে কী আছে?

—না!

—জেটিতে তো বেড়াচ্ছিলে, এটা দেখোনি?

—না।

—তাহলে তাকিয়ে থাকো। একটু পরেই দেখতে পাবে।

পেলাম। একটা বেশ বড়ো-সড়ো কচ্ছপ ভুস্ করে ভেসে উঠে দম ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার জলের মধ্যে ডুব মারলো। দুধওয়ালা বললেন,—এগুলোর নাম সবুজ কচ্ছপ। বৈজ্ঞানিক নাম Chelonie Mydas. লম্বা হয় ফিট চারেক। আগে এই মাহেতেই পাওয়া যেতো, এখন অন্য সব দ্বীপ থেকে ধরে

এনে এখানে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। এখান থেকে দুশো তিরিশ মাইল দূরে 'আলদাব্রা' বলে একটা দ্বীপ আছে। এখন তো মে মাস? এখনো গেলে ব্যাপারটা দেখা যায়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! দুশো থেকে তিনশো কচ্ছপ একসঙ্গে উঠে আসছে সমুদ্র থেকে, ডিম পাড়তে। ডিম পেড়ে তারা যখন ফিরতে যায়, তখনি লোকেরা দৌড়ে গিয়ে কোনোরকমে কচ্ছপগুলোকে উলটে দেয় আর বন্দী করে ফেলে। ঐ দেখ সেই বন্দী কচ্ছপ! আর একটা উঠেছে নিঃশ্বাস নেবার জন্য।

বললাম,—আপনি স্যার আলদাব্রায় গিয়েছিলেন নাকি?

হেসে বললেন,—না হে—না। শুনলাম এখানে এসে। নোট্ করে রেখো কিন্তু। এখানকার লোকেরা এদের মাংস খায়, আবার কিছু অংশ, তাদের বলে 'ক্যালিপি',—লণ্ডনে চালান যায়। তা দিয়েই ওখানকার বড়ো বড়ো হোটেলে তৈরি হয় 'টার্ট্‌ল স্যুপ',—দারুণ নাকি খেতে!

—স্যার, এদের 'সবুজ কচ্ছপ' বলে কেন? যতদূর বুঝলাম, দেখতে তো সবুজ নয়!

—না। এদের চর্বির রঙ নাকি সবুজ-সবুজ। কাটলে পরে সে-রঙ মালুম হয়। তাই ঐ নাম। বুঝলে? এবার এসো। বেশি দূরে যাবো না, কাছেই 'কার্নেগী হল'। সেখানেই লোকটি অপেক্ষা করবে।

'লং-পীয়ার'-এর শেষে বাঁ দিকে একটা হোটেল, ডানদিকে 'সিচেলাস ক্লাব', 'কার্নেগী হল আর লাইব্রেরী', তারপরে পুলিশ-স্টেশন আর পোস্টাপিস। কাছেই সামনাসামনি দেখা যায় একটি 'ঘড়ি-ঘর', যাকে বলা হয় 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল ক্লক-টাওয়ার।' তাতে একটা ফলক আছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম খোদাই করা, গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হিসাবে। বোঝা গেল, এই মহারাণীর নামেই হয়েছে এই শহর বা বন্দরের নাম। যেখানে আমরা পৌঁছলাম, সেটি হচ্ছে শহরের কেন্দ্রস্থল। এখানে একটি ফোয়ারার ওপর মহারাণীর ছোট্ট একটি প্রস্তর-মূর্তি রয়েছে, দুপাশে দুটি ছোট 'হাউইট্‌জার' জার্মান কামান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব আফ্রিকায় জার্মানদের কাছ থেকে দখল করে নেওয়া হয় বলে অপর একটি ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে। ফোয়ারা ঘিরে ছোট্ট বাগান, চারপাশে বসবার জায়গা। সকাল-বিকেল লোকে এখানে এসে বসে থাকে। দেশটাকে নাতিশীতোষ্ণ বলা চলে, শীত-গ্রীষ্মের যা তারতম্য হয় তা সামান্য। ক্যাপ্টেন সরাসরি কার্নেগী হলে না ঢুকে হয়ত আমাকে দেখাবার জন্যই শহরের এ অঞ্চলে একটু বেড়াতে লাগলেন।

পশ্চাৎপটে পাহাড় সবুজ বনানীতে ঢাকা, পাশ দিয়ে একটি সংকীর্ণ গিরি-পথ আছে ওপারে 'বেল-অম্ব্রি'তে যাবার। আমরা সেদিকে না গিয়ে আবার 'টাওয়ার ক্লক'-এর কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভিক্টোরিয়ার নামে রাস্তাও আছে, তাঁর স্বামীর নামেও রাস্তা আছে, 'অ্যালবার্ট স্ট্রীট।' এই অ্যালবার্ট স্ট্রীট দিয়ে এগোতেই পড়লো বিখ্যাত ময়দান বা পার্ক 'গর্ডন স্কোয়ার।' ফুটবল-খেলা,

বেড়ানো, ব্যাণ্ড-পার্টির বাজনা, কুচকাওয়াজ, জন-সম্ভাষণ,—সবই এই গর্ডন স্কোয়ারে। কলকাতার ময়দানের সঙ্গে তুলনা করা বৃথা, আয়তনে তার এক-চতুর্থাংশ হবে কিনা সন্দেহ! আমরা পার্কে ঢুকলাম না, ময়দান-প্রান্তের ডালপালা-ছড়ানো অতিকায় গাছ 'স্যাং ড্রাগন' দেখে ফিরে এলাম। গাছগুলোর তলায় সকাল-বিকেল ভিড় থাকে, এখন রয়েছে মাত্র জন চার পাঁচ লোক, বেঞ্চে বসে এখানকার খবরের কাগজ 'সিচেলাস ক্ল্যারিয়ন' পড়ছে। ছোট্ট একটা দোকান থেকে ক্যাপ্টেন-সাহেব এখানকার সিগারেট 'কোদোর' কিনলেন। তারপরে নিজে একটা ধরিয়ে আমাকে বললেন,—খাবে নাকি একটা?

লজ্জিত হয়ে বললাম,—না স্যার।

—খাও না?

—তা খাই মাঝে মাঝে।

—তাহলে খেয়ো না। এ বেশ কড়া। অ্যামেচার সিগারেট-খানেওয়ালা-দের জন্য নয়।

তারপরে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—কাল এখানে এসে কিছুক্ষণ বসেছিলাম হে। নানারকম পাখী আছে গাছে, এখন তাদের দেখতে পাবে না, ঝাঁক বেঁধে কোথাও উড়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা সব ফিরে এসে 'অর্কেস্ট্রা' শুরু করবে। জানো, এক ধরনের ছোট্ট পাখী আছে, তাদের নাম 'বেঙ্গলী।' শুনে অবাক হচ্ছো, না? এ নাম এখানে দিলো কে? আমি অবশ্য পাখীটাকে দেখি নি, তবে নাম শুনে গেছি। এর ল্যাটিন নামও টুকে নিয়েছি, দাঁড়াও বার করছি নোট্ বইটা।

বলে, পকেট থেকে খুঁজে একটা নোট্ বই বার করে বলে উঠলেন,—এই দেখো, 'Estrelda astrilda.' না-না এখন নয়, পরে নোট্ ক'রো। চলো, দুটো প্রায় বাজে। জীবনভাই-জেঠাভাই বোধহয় এসে গেছেন কার্ণেগী হলে। ঠিক দুটোয় তাঁর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। চলো।

সুতরাং ফিরে চললাম কার্ণেগী হলে। জীবনভাই-জেঠাভাই মানুষটি প্রবীণ, টকটকে ফরসা রঙ, মাথায় টুপি, সাদা ট্রাউজারের ওপরে আলপাকা রঙের গলাবন্ধ রেশমী কোট, হাতে সৌখীন ছড়ি। বোঝা গেল, গতকালই এঁর সঙ্গে ক্যাপ্টেনের আলাপ হয়েছিল। নিজেদের জাত ভাই, সুতরাং আলাপ ঘনিষ্ঠতর হতে কতক্ষণ? প্রথমে তো একান্তে বসে নিজেদের ভাষাতেই 'কিমছে-সারুছে' শুরু হয়ে গেল। তারপরে আমার সঙ্গে ক্যাপ্টেন পরিচয় করিয়ে দেবার পর সৌজন্যের খাতিরে ওরা আরম্ভ করলেন ইংরেজীতে কথা বলতে, মাঝে মাঝে হিন্দীও হচ্ছিল। জেঠাভাই থাকেন অনেক দূরে, বেলা বারোটা নাগাদ উনি অফিসে আসেন। এখানে ওঁদের ব্যবসা আছে। তারপরে আসেন লাইব্রেরীতে। তবে আজ একটু আগেই এখানে এসেছেন নিরিবিলিতে মিষ্টার দুধওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন বলে। খুব ছোটবেলায় নাকি বাপের হাত ধরে এখানে এসে-ছিলেন, আর দেশে যান নি। এমন কী, বিয়ে করতেও না। দেশ থেকে কনেকে

এখানে এনে তারপরে বিয়ে করেছিলেন। তিন ছেলে। তার মধ্যে বড়ো ছেলে দেশে ফিরে গেছে, মেজো আর ছোট এখানে আছে, তারা অবশ্য দেশে গিয়েই বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে। এখন নাতি-নাতনী নিয়ে জেঠাভাইয়ের বিরাট সংসার।

—এখানে ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা কতো ?

জেঠাভাই বললেন,—খুব কম। পারসেণ্টেজে আসে না। এই যে 'সিসেল্স', যাকে বলা হয় 'ভারত মহাসাগরের মণিমাণিক্য, Pearl of Indian Ocean,' এ আগে মরিশাসের অধীনেই ছিল, তাই মরিশাস থেকে কিছু ইণ্ডিয়ান এখানে চাকরি-বাকরি করতে এসেছে। আমাদের মতো আসল ভারত থেকে আসা লোকের সংখ্যা খুবই কম।

—ইয়োরোপীয়ানের সংখ্যা ?

—ছিল মন্দ নয়। ক্রমশই কমছে। এখন স্থানীয়দের সংখ্যা ঢের বেশি।

—স্থানীয় কারা ? নিগ্রো ?

—না, তা ঠিক নয়,—এরা হচ্ছে ক্রিয়োল, যদিও নিগ্রোর সংখ্যাও কম নয়। কিছু চীনাও আছে।

—এই ক্রিয়োল কারা ?

—শঙ্কর জাত বলা যায়। যেমন আমাদের দেশে আছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এদের মুখের ভাষাও ক্রিয়োল, ফরাসী-ইংরেজী আর স্থানীয় প্রতিশব্দ মিলে এক জগাখিচুড়ি। এখানে ওদের মধ্যে কথায় কথায় একটা শব্দ খুব শুনবেন,—ম' দিয়া ! হে ভগবান !

দুধওয়ালা বললেন,—ধন্যবাদ জেঠাভাই। আপনার কাছ থেকে সব জানবো বলেই আমরা এসেছি। জানেন তো, আমাদের নৌ-জগতে একটা অলিখিত নিয়ম আছে, ক্যাপ্টেনরা নতুন কোথাও গেলে বা নতুন কিছু দেখলে একটা রিপোর্ট তৈরি করে কর্তাদের কাছে পেশ করে ? আজকাল শুনেছি সেটা অনেকেই মানে না, কিন্তু আমার মতে, নিয়মটা ভালো।

—নিশ্চয়।

—তাহলে বলুন এর ইতিহাস। আমরা দরকার মতো নোট্ করে নেবো।

ততক্ষণে জেঠাভাইয়ের বেয়ারা কফি নিয়ে এসেছিল। সেই কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে শুরু হলো আমাদের কাজ। জেঠাভাই বলতে লাগলেন,—দেখুন, আমি যেটুকু জানি, সেটুকুই বলবো। সিসেল্স ছিল ফরাসীদের। তাদের হাত থেকে ইংরেজরা পায় ১৮১৪ সালে, 'Treaty of Paris'-এর চুক্তি অনুসারে। আঠাশটা দ্বীপ নিয়ে এই যে দ্বীপপুঞ্জ দেখছেন, এগুলি মূলত 'গ্র্যানিট' বা যাকে 'স্ফটিক প্রস্তর' বলে, তা দিয়ে তৈরি। ন্যাজারেথ আর সায়া-দ্য-মাল্হা ব্যাঙ্কের কথা শুনেছেন তো ? সেগুলোকে নিয়ে মাদাগাস্কার থেকে একেবারে এই সিচেলাস বা সিসেল্স্ পর্যন্ত বিশাল এক মহাদেশ ছিল। দশ মিলিয়ন বছর আগে 'টার্শারী পিরিয়ড'-এ মহাপ্রলয়ের মতো কোনো প্রাকৃতিক

বিপর্যয়ে এই মহাদেশ ভেঙে খান খান হয়ে যায়। কোথাও বা ডুবে যায়। সেই ডুবো পাহাড়ের হদিশ পাবেন ঐ ন্যাজারেথ আর-সায়া-দ্য-মাল্হা ব্যাঙ্কে, আর জেগে-থাকা ভূখণ্ড পাবেন এই আঠাশটি দ্বীপে। এই আঠাশটা দ্বীপের গ্র্যানিট-পাথরের পাহাড়ের সঙ্গে মাদাগাস্কার আর রি-ইউনিয়ন দ্বীপের পাহাড়ের সঙ্গে কোথাও কোথাও মিল আছে। ভালো কথা, 'রি-ইউনিয়ন'-দ্বীপ জানেন তো? মরিশাস বা সিসেল্স ফরাসীদের কাছ থেকে ইংরেজদের হাতে আসে, 'রি-ইউনিয়ন' বা 'বুরবোঁ-দ্বীপ' কিন্তু আসে নি। ওটা থেকে যায় ফরাসীদের হাতে। ওখানেও আমাদের ব্যবসা আছে। আকারে কিন্তু মরিশাসের থেকেও বড়ো দ্বীপ, মরিশাস থেকে একটু দূরে। তবে মরিশাসের তুলনায় জনবসতি খুব কম, তার কারণ দ্বীপ জুড়ে পাহাড়ই বেশি, সর্বোচ্চ চূড়াটি হবে দশ হাজার ফিটের থেকেও উঁচু। জনবসতি গড়ে উঠেছে সমুদ্রের ধারে ধারে—পূর্বে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে। জনপদগুলির নাম 'সেণ্ট' দিয়ে, যেমন 'সেণ্ট লুই', 'সেণ্ট পিয়েরে', সেণ্ট সুজানে, সেণ্ট পল। কিন্তু ছেড়ে দিন 'রি-ইউনিয়ন' বা 'বুরবোঁর' কথা। আমাদের 'সিচেলাস'-এর কথাই শুনুন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গার্ডিনার সাহেব দুবার এখানে এসে রিসার্চ করেন, ১৯০৫ সালে আর ১৯০৮ সালে। মূল গ্র্যানিট দ্বীপ ছাড়া যে-সব 'প্রবাল দিয়ে ঘেরা'-দ্বীপ রয়েছে, তা নিয়েও তাঁর গবেষণা আছে। তিনি বলেছিলেন, 'পুরাকালে এই দ্বীপপুঞ্জ বিশ হাজার বর্গমাইলের একটি বিরাট দেশের অংশ ছিল।' এইখানে আসে গর্ডন-সাহেবের কথা, যাঁর নামে হয়েছে এখানকার 'গর্ডন' স্কোয়ার। শুনেছেন এঁর নাম?

—না।

—তবে শুনুন,—জেঠাভাই বলতে লাগলেন,—জেনারেল চার্লস জর্জ গর্ডন, যিনি পরিচিত ছিলেন 'চাইনীজ গর্ডন' নামে, তাঁকে আরবরা মেরে ফেলে খারটুমে ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে। উনি সিসেল্স বা সিচেলাসে এসেছিলেন ১৮৮১ সালে। তখন তিনি কর্নেল, জেনারেল হন নি। মাদাগাস্কার নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে তখন বিরোধ বেঁধেছিল। সেই সূত্রেই অভিজ্ঞ সেনাপতি হিসাবে তাঁর এখানে আবির্ভাব। দেশরক্ষাঘটিত কাজ ছাড়া তিনি এ-দ্বীপের ইতিহাস নিয়ে প্রচণ্ড চর্চা করেছিলেন। তাঁর মতে, এই দ্বীপপুঞ্জ একসময় বিশাল এক মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। সেই মহাদেশের নাম ছিল 'আটল্যাণ্টিস।' এই হারানো অ্যাটল্যাণ্টিস যে ঠিক কোথায় ছিল, তা নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নেই! কিম্বদন্তী একে স্থান দিয়েছে আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে, 'হারকিউলিসের স্তম্ভ' বলে যে-জায়গাটা উল্লেখিত হয়, তার পশ্চিমে। মহামতি প্লেটো এই 'অ্যাটল্যাণ্টিস'-এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে গেছেন। এঁর বই পড়েই কলম্বাস অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরে একে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। সতেরো শতকে 'ওলাস রুডবেক' বলে এক সুইডিস ভদ্রলোক একে স্কাণ্ডিনেভিয়ার অংশ বলে দাবি করেছিলেন। আঠারো শতকে 'হেফার' বলে এক জার্মান একে স্থান

দিয়েছিলেন তখনকার জার্মানীর 'পোমেরানিয়া' ও 'মেকলেমবুর্গ'-প্রদেশে। এক জন ডাচ-লেখক বলেছিলেন, অ্যাটলাণ্টিস তাঁদের হল্যাণ্ডেরই অংশবিশেষ। কতো আর ফিরিস্তি দেবো? এসব পড়লে বেশ মজা পাওয়া যায়। কেউ বললেন প্যালেস্টাইনে, কেউ বললেন, পারস্যে, কেউ বললেন, খাস অ্যামেরিকায়। কেউ আবার প্লেটোর মতবাদ আঁকড়ে ধ'রে বসে রইলেন। কেউ বললেন ওটা ছিল আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমিতে। কিন্তু অধ্যাপক গার্ডিনার বা জেনারেল গর্ডন, এঁদের মতবাদেও অনেক যুক্তি আছে, যা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের দ্বীপপুঞ্জে 'প্রাসলিন' বা প্রালে' বলে যে দ্বীপটি আছে, তাতে আছে বিখ্যাত 'কো-কো-ডিমার'-ফল, যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। গর্ডন বললেন, এই সেই প্রাচীন দ্বীপ 'গার্ডেন অব ইডেন',—যেখানে বিচরণ করতেন 'আদম' আর 'ইভ' আর ঐ কো-কো-ডিমারের গাছই হচ্ছে সেই 'জ্ঞানবৃক্ষ', যার ফল খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ, অথচ সর্পরূপী শয়তানের প্ররোচনায় 'ইভ' সে নিষেধ মানেন নি।

দুধওয়ালা বলে উঠলেন,- দারুণ খবর দিয়েছেন তো? যাওয়া যায় না ওখানে?

জেঠাভাই বললেন, কেন যাবে না! আপনারা জাহাজী লোক, আপনাদের 'আইডেনটিটি কার্ড'ই যথেষ্ট, অন্য কোনো 'অনুমতি-পত্র'-এর দরকারই হবে না।

—কতদূর এখান থেকে?

জেঠাভাই বললেন,- এই ভিক্টোরিয়া থেকে মাত্র ছাব্বিশ মাইল দূরে, উত্তর-পূর্ব কোণে। রোজই একটি করে স্টীমার যাতায়াত করে। দেরি না করে কালই চলে যান, ব্যবস্থা করে দেবো। স্টীমার ছাড়বে সকাল সাড়ে সাতটায়, ফিরবে বেলা চারটে নাগাদ। ওখানে আমার বন্ধু আছে, তাকে চিঠি দিয়ে দেবো, লাঞ্চ খাবেন তাঁর ওখানে। কেমন?

—ঠিক আছে।

জেঠাভাই বললেন,—আপনারা জাহাজে থাকবেন, আমার লোক গিয়ে ডেকে আনবে আপনাদের। ওয়েল, আপনারা দুজনেই যাবেন তো?

—নিশ্চয়ই। পেমেণ্ট কিন্তু আমাদের।

জেঠাভাই হেসে বললেন,- আচ্ছা বেশ, তাই-ই হবে! দুখানা সিট আমি রিজার্ভ করে রাখবো, কোনো অসুবিধা নেই। শান্ত সমুদ্র, এলোমেলো আণ্ডার-কারেণ্ট না বইলে ঘণ্টা আড়াই-তিনেকের মধ্যে পেঁছে যাবেন আশা করি।

—প্লীজ, দ্বীপটা সম্বন্ধে আর একটু বলুন।

জেঠাভাই বললেন,—দ্বীপটা বেশ বড়ো আছে, সাত মাইল লম্বা, আড়াই মাইল চওড়া। বলা বাহুল্য, ওটাও আমাদের মতো পাহাড়ী দ্বীপ, সর্বোচ্চ চুড়া হচ্ছে বারোশ ফিটের থেকে একটু উঁচু। ওখানে 'কো-কো-ডিমার' যাকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে 'জোড়া নারকেল' বলা হয়,—তার বিরাট বিরাট

গাছগুলো দেখতে পাবেন, অনেকটা আমাদের দেশের 'পান্থপাদপ'-এর মতো, তবে আকারে অনেক বড়ো। এছাড়া, সমুদ্রতীর ধরে ধরে ছিল অনেক কালের পুরোনো 'টাকা মাকা' গাছ, কিন্তু গত বছর গিয়ে দেখি, তার একটাও নেই, কিছু কাটা পড়েছে, কিছু দাবাগ্নিতে পুড়ে গেছে।

—আফশোষের কথা।

জেঠাভাই বললেন,—কো-কো-ডিমারের কথাই শুনুন। ফলগুলো ধরে জোড়ায়-জোড়ায়। পাকতে লাগে সাত বছর, বুঝলেন? এই ফল নিয়ে যে কতো 'মিথ্' আছে, তা কী বলবো! এর বিচিত্র আকারের জন্যই ঐ রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কী রকম আকার শুনবেন?

—বলুন?

জেঠাভাই আমার দিকে তাকালেন, বললেন,—নওজোয়ান, দোষ নেবেন না, আমরা দুই প্রবীণ ব্যক্তি একটু রসিকতা করবো। মিঃ দুধওয়ালা, দিনের আলোয় কিম্বা চাঁদের জ্যোৎস্নায়, ফাঁকা জায়গায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পশ্চাৎপটে—কখনো কোনো সুন্দরীকে নিরাবরণ অবস্থায় দেখেছেন?

হেসে ফেললেন দুধওয়ালা, বললেন,—না।

জেঠাভাই বলতে শুরু করলেন, ঐ অবস্থায় নারীর গোপন স্ত্রী-অঙ্গের যে রূপ চোখে পড়ে, হুবহু সেই রূপ ঐ কো-কো-ডিমার ফলে। এই সাদৃশ্যের জন্যই ফলটাকে রহস্যময় মনে করা হতো। ফলগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোনো কোনো জায়গায় আর মালদ্বীপে কাটাকুটি করে ভিতরের অংশ বার করে নিয়ে কামোদ্দীপক ওষুধ হিসাবে বিক্রি করা হতো। কোথা থেকে এ ফল আসতো, সাধারণ লোকে তা জানতে পারতো না, তাই একে তারা বলতো, সমুদ্রের নারকেল। আকৃতির এই রহস্যময়তার জন্য অনেকের বিশ্বাস ছিল, ওগুলো সমুদ্রের নিচে জন্মায়। ভারতবর্ষের কোনো কোনো মন্দিরে ঐ ফল রেখে একসময় পুজো পর্যন্ত করা হতো, তখন এই দ্বীপপুঞ্জের কথা কেউ জানতো না। কাঁচা অবস্থায় এর ভিতরকার জিনিসটা তরল থাকে, কিন্তু পাকলে এমন শক্ত হয় যে হাতির দাঁতের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। যদিও সেই শক্ত জিনিস চূর্ণ করে কামোদ্দীপক আরক বা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখনো ভারতে এই বস্তু মাঝে মাঝে চালান যায় আর 'নাক্স মেডিকা' নামে বিক্রি হয় বলে শোনা যায়। প্রত্যেকটা গাছ কতো ফল দেয় জানেন? প্রায় তিরিশটা। প্রত্যেকটি ফলের ওজন তিরিশ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড। পাতাগুলোও বেশ বড়ো। গাছের মাথায় ছাতার মতো ঝুলে থাকে। এক একটা পাতা প্রায় কুড়ি ফিট লম্বা। তাহলে পূর্ণাঙ্গ গাছের চেহারা কতো বড়ো হতে পারে কল্পনা করে দেখুন। গাছগুলোর উচ্চতা একশো ফিট কিম্বা তার থেকেও কিছুটা বেশি। গাছের পাতার মধ্য দিয়ে যখন হাওয়া বইতে শুরু করে, তখন আচমকা শুনলে মনে হবে, খুব চাপা গলায় কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! জেনারেল গর্ডন এই গাছের ছবি

নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জের 'প্রতীক চিহ্ন' তৈরি করিয়েছিলেন। কো-কো-ডিমার গাছের তলায় এখানকার অতিকায় কচ্ছপ,—এই প্রতীক চিহ্ন বা 'মনোগ্রাফ'-এর প্রতিচ্ছবি এখনো দেখা যায় মরিশাসের 'পাম্পল মুশে'তে—বোটানিক গার্ডেনে। মিঃ দুধওয়ালা, আপনারা যদি কাল প্রালে' দ্বীপে যান, তাহলে দেখবেন, আটশো বছরের পুরোনো কো-কো-ডিমার গাছও আছে। তবে এটাও ঠিক, সব গাছে ফল হয় না। আমাদের দেশের তালগাছের মতো কো-কো-ডিমার গাছেরও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। ভালো কথা, আপনারা 'মুশকিল আসান' বলে কথিত এক শ্রেণীর ফকির দেখেছেন, দেশে? শুনেছি, তাদের হাতে ঘোর কালো - তেল চক-চক করা একরকম বৃহৎ খোল দেখা যেতো। অনুমান করা হয়, সেগুলিই হচ্ছে কো-কো-ডিমারের পাকা ফলের শুকনো খোল। এখান থেকে এখনো মাঝে মাঝে রপ্তানী হয়।

—শুধুই কি ভারতে রপ্তানী হয়?

জেঠাভাই বললেন,—তা কেন? হংকং-সিঙ্গাপুরে যায়, মালদ্বীপে যায়, হয়ত আরও কত জায়গায় যায়। প্রালে'তে গেলে নিজেরাই সব খবর জেনে নিতে পারবেন। এক সময় ঐ দ্বীপের লোকেরা কাঁচা অবস্থায় ডাবের মতো ফলগুলো পেড়ে, কেটে, ভিতরের তরল পদার্থ চুমুক দিয়ে খেয়ে নিতো। এখন আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গাছগুলোকে সাধারণত দেখা যায়-গিরিসংকট বা খাদের মধ্যে জন্মাতে। মারী লুইজি বলে এক মহিলার প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল এই প্রালে' দ্বীপে, যাতে কো-কো-ডিমার গাছ ছিল অনেক। এগুলো যেন যথেচ্ছ কাটা না পড়ে, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট এই সম্পত্তি ১৮৯০ সালে কিনে নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। দ্বীপের মাঝামাঝি কো-কো-ডিমার যুক্ত একটি গিরি সংকট আছে, যেটি রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানায়। কো-কো-ডিমারের পরিচর্যার কোনো ত্রুটি এখানে না পাওয়ায় সরকার এটিকে এখনো নিজের হাতে নেন নি। এই মালিকপক্ষ থেকে যিনি পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন, তিনি আমার বন্ধু, তাঁরই কাছে চিঠি দিয়ে আমি আপনাদের পাঠাবো। তাঁর নাম, হেনরী টমাস সোমেশ্বর।

দুধওয়ালা সবিস্ময়ে বলে উঠলেন,- সোমেশ্বর!

হ্যাঁ। খৃষ্টান। তবে প্রোটেস্ট্যাণ্ট। সিসেলসের যে-কোনো দ্বীপে যত খৃষ্টান আছে, তার মধ্যে এই 'প্রালে'' দ্বীপেই প্রোটেস্টাণ্ট বাস করে বেশি।

—কিন্তু উনি কি ভারতীয়? নাম শুনে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন জেঠাভাই,—না। উনি খাঁটি এদেশী। ভারতীয় নামটা কী করে হলো শুনবেন? ওখানে সেণ্ট ম্যাথিউ-চার্চ আছে। সেখানে ধর্মযাজক ছিলেন রেভারেণ্ড ভিনসেণ্ট যজ্ঞেশ্বর সোমেশ্বর। ইনি এসেছিলেন 'ইল-দ্য-ফ্রাঁস' বা মরিশাস থেকে। ও'র শরীরে ভারতীয় রক্ত থাকতে পারে। আমার বন্ধু সোমেশ্বর এঁরই পালিত পুত্র। সেজন্য নিজের নামের সঙ্গে ঐ 'সোমেশ্বর' নামটা বহন করছে।

ততক্ষণে বেলা অনেক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এবার ওঠবার পালা। ক্যাপ্টেন ওঁকে ধন্যবাদ জানালেন, বললেন,—কাল আমরা সকালেই রেডি থাকবো। যা শুনলাম, তাতে স্বচক্ষে কো-কো-ডিয়ার না দেখে আর থাকতে পারছি না !

জেঠাভাই হেসে বললেন,—আমার লোক ঠিক যাবে আপনাদের জাহাজে টিকিট আর চিঠি নিয়ে। আপনাদের 'প্রালে"-দ্বীপযাত্রা সফল হোক।

পরদিন খুব ভোরেই আমার ঘুম ভেঙেছিল। কী মনে করে একসময় একবার • স্টারবোর্ড সাইডে গিয়ে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য দ্বীপটিকে দেখতে লাগলাম। নৌকোর চিহ্ন নেই সেখানে। তাহলে ওরা নিশ্চয় ফিরে এসেছে। ওদের কথা এতো করে হঠাৎ মনে পড়ছে কেন ? জাহাজের পিছনে গিয়ে জেটির শেষপ্রান্তে তাকালাম। কয়েকটি নৌকো তেমনি বাঁধা আছে খুঁটির সঙ্গে, কিন্তু লোকজন নেই, এতো সকালে কেউ এসে পেঁাছোয় নি এখনো। এইসঙ্গে অন্য একটি বস্তুর দিকে চক্ষু নিবন্ধ হলো। নৌকোগুলির কাছাকাছি জেটির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট একটি স্টীমার। দোতলা। অনেকটা 'টাগ'-টাইপের। অর্থাৎ, গলুইয়ের দিকটা বেশ উঁচু, বাকি অংশটা একটু ঢালু হয়ে পিছনের দিকে নেমেছে। তাকিয়ে দেখি, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ফানেল দিয়ে। যেন রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। স্টীমারের নামটাও পড়া গেল,—'সেণ্ট আনে।' আমাদের বাসগুলোর নাম এককালে যেমন লেখা হতো, দুর্গা, কালী, মহামায়া, মহালক্ষ্মী,—অনেকটা সেইরকম আর কী ! বিপদ কাটানোর মন্ত্র হিসাবে ঠাকুর-দেবতার নাম ! বুঝলাম, এই স্টীমারে করেই আমাদের সমুদ্রে ছাব্বিশ মাইল (সামুদ্রিক মাইল অবশ্য) পাড়ি দিতে হবে।

যথাসময়ে জেঠাভাইয়ের লোক এলো ক্যাপ্টেনের কাছে। দুটি টিকিট আর সোমেশ্বরের উদ্দেশে চিঠি। ততক্ষণে প্রাতরাশ শেষ করে আমরাও তৈরি। ক্যাপ্টেনের পরণে পুরো ইউনিফর্ম ও ছড়ি, আমার পকেটে নোটবই আর ঝর্ণা কলম। স্টীমারের দোতলার সামনের দিকেই সর্বোচ্চ শ্রেণী। কেবিন আর ডেক। ডেকের ওপর আরাম-কেদারা বিছানো। স্টীমার ছাড়তেই বুঝলাম, সর্বোচ্চ শ্রেণীতে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। পিছনে, নিচে, কিছু সাধারণ যাত্রী রয়েছে। সবাই বসতে পেরেছে। এমন কী, বসবার মতো আরও জায়গা রয়েছে। সেই রহস্যময় দ্বীপটিকে ডাইনে রেখে আমরা বাইরের সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম। এবার দিনের আলোয় দ্বীপটিকে স্পষ্ট দেখবার সুযোগ হলো। কিনারায় কোনো নৌকো নেই। বড়ো বড়ো গাছগুলো ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লোকজন কোনোদিকে কেউ নেই। একটুক্ষণ চলবার পরই দুধওয়ালা বললেন,—তুমি বসে থাকো, আমি কেবিনে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেই, কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি।

—ঠিক আছে স্যার আপনি যান।

দুধওয়ালা কেবিনে ঢুকে গেলেন। অন্য কেবিনটি খালি। কিন্তু আমার

কেবিন-শয্যার দিকে মন গেল না, বসে বসে সমুদ্র দেখতে লাগলাম। সামনেই একটা দ্বীপ। 'সীগাল' গুলো উড়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু কতক্ষণ বসে থাকা যায় স্থবিরের মতো? নিচে একটা ক্যানটিন আছে দেখে এসেছিলাম, সেখানে গিয়ে চা খেলে কেমন হয়? মাথায় বুদ্ধি খেলে নি। সর্বোচ্চ শ্রেণীর যাত্রী আমরা, বয়কে ডেকে হুকুম দিলেই চা এসে হাজির হতো। ক্যাপ্টেন হলে তাই করতেন। আমার অভ্যাস না থাকয়ে ও-কথাটা মনে হয় নি। তাই আস্তে আস্তে হেঁটে নিচে নামবার সিঁড়ির কাছে এলাম। সিঁড়ি একটাই। এটা দিয়ে দোতলায় উঠেই ডাইনে অথবা বাঁয়ে ঘুরে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাওয়া যায়। সিঁড়ির কাছে আসতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে চোখ গেল! ন্যাড়া বেঞ্চি। কোনো গদি-টদি নেই, তবে হেলান দেবার জায়গা আছে। নিচে, অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে তাও নেই, সেখানে সাধারণ বেঞ্চি সার দিয়ে পাতা!

দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই বসে আছে। কালো আদমীও আছে, আবার আমাদের মতো বাদামীও আছে। কেউ বা ঘোর বাদামী, কেউ হালকা বাদামী, একটি মহিলা আবার তার থেকেও অনেক হালকা বাদামী, রীতিমত ফরসাই বলতে পারা যায়। আমি সিঁড়ির কাছে পেঁছিতে সবাই চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো, বোধ হয় সর্বোচ্চ শ্রেণীর যাত্রী বলেই ঔৎসুক্য বশত। সেই মেয়েটিও তাকিয়েছিল। আমার চোখ তার দিকে পড়তেই সে একটু মুখ টিপে হাসলো মনে হলো। পরক্ষণেই অবশ্য সে হাসি লুকোতে মুখখানা অন্যদিকে ফেরালো। তখনো আমার মনে কিছু হয় নি। আমি যখন ক্যানটিনে এসে চা-কেকের অর্ডার দিয়েছি, তখন দেখি, মেয়েটিও সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালো কাউন্টারের কাছে। ফরমাস করলো, এক কাপ চায়ের। ভাষায় বুঝলাম না, ভঙ্গিতে বুঝলাম। তার পরক্ষণেই আমার দিকে একবার চোরা চাউনি প্রেরণ করলো। চোখে চোখ পড়তেই আবার তার ঠোঁটের কিনারে ফুটে উঠলো টুকরো হাসি। এবার ধক্ করে উঠলো বুকের ভিতরটা! এই না সেই মেয়েটি, যাকে ঐ রহস্যময় দ্বীপে দেখেছিলাম জ্যোৎস্না রাতে সম্পূর্ণ নিরাবরণ? মাথায় সেই ঝাঁকড়া চুল। কিন্তু সেটা দেখে চেনবার কথা নয়, মুখের হাসিই চিনিয়ে দিলো মনে হচ্ছে। যখন ছেলেটির ডাকে মেয়েটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজীতে কথা বলছিল, তখনই লক্ষ্য করেছিলাম এই ধরণের টুকরো হাসি, আমাদের কথার উত্তরে। তবু, আমার পক্ষে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঠিক সেই মেয়েটি না-ও হতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার দিকে অমন লুকিয়ে তাকাচ্ছে কেন, বারে বারে? যদি সেই মেয়েটিই হয়, তাহলে কি আমাকে সত্যিই চিনতে পেরেছে? ততক্ষণে আমার চা ও কেক এসে গিয়েছিল। টেবিলে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হচ্ছে। দেখলাম, মেয়েটিও তাই করছে। আমি চা ও কেকের প্লেট নিয়ে তার দিকে একটু ঘেঁষে দাঁড়ালাম, চাপা গলায়

বললাম,—Excuse me, খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথাও আমাদের দেখা হয়েছিল কী!

মেয়েটি মুখ তুলে তাকালো। তার ঘন কালো চুলের মতো চোখের তারা দুটিও কালো, পাতলা পাঁপড়ির মতো ঠোঁট। তেমনি মুচকি হাসলো। আমারই মতো চাপা গলায় বললো,—বঁজুর। ইয়া।

—বঁজুর (নমস্কার)—কিন্তু কোথায়?

মেয়েটি মাথা নিচু করে চায়ে চুমুক দিয়ে বললে,—ম' দিয়া! নো আন্দার স্ত্যান্দ্ ?•

—নো।

আবার টুকরো হাসি। বললে,—ব'-আমি (সৎ বন্ধু)—ইন-দ্য-ইল্!

তার মানে সেই দ্বীপে। বললাম,—তুমি আমাকে একবার দেখেই চিনতে পারলে?

দেখছিলাম আমার ইংরেজী কথা ও বুঝতে পারছিল। তার মানে ইংরেজী ও ভালোই বোঝে, সে রকম বলতে পারে না। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে,—ইয়া। আই স্মাইল, ইউ দোন্ত্ আন্দার স্ত্যান্দ্?

—আই অ্যাম সরি।

স্টীমারের গতি তখন কমে এসেছে। সবিস্ময়ে দেখলাম, আমরা একটা দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়েছি! স্টীমার তীরে ভিড়বার উপক্রম করছে। যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য। আমাদেরও কি নামতে হবে নাকি? এসে গেল প্রালে'? মেয়েটিও হয়ত নামবে। আর দেখা হবে কিনা কে জানে? তাই যে কথাটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেটাই বলে ফেললাম,—সেই ছেলেটি কোথায়?

মেয়েটি বললো,—হি ইজ লস্ত্।

—লষ্ট! মানে, হারিয়ে গেছে!—সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—ঐ দ্বীপে?

মেয়েটি বললে,—নো। দ্যাত্ নাইত্? উই কম্ ব্যাক।

—তবে?

মেয়েটি তার ভাঙা ইংরেজীতে আমাকে বুঝিয়ে দিলো,—তাকেই খুঁজতে এসেছি।

—এখানে তাকে পাবে?

—নো। দিস ইজ সেন্ত্ আনে—ইল। আই গো প্রালে'। সার্চ হিম। আই নো হি গন্ তু প্রালে' লাস্ত্ মর্নিং!

স্টীমার তখন জেটিতে লাগছে। মনে হচ্ছে, কিছু লোক নামবে। জেটিতেও কিছু লোক অপেক্ষা করছে—পুরুষ ও মেয়ে। কালো ও বাদামী। ওরা হয়ত স্টীমারে উঠবে। তাহলে এই সেই 'সেণ্ট আনে'-দ্বীপ, যার ইতিহাসের সঙ্গে সেই বিচিত্র মানুষ 'দ্যু বারে'র নাম বিজড়িত!

লোক ওঠা-নামা শুরু হলো অচিরেই। চেহারা আর পোষাক দেখেই

অনুমান করা যায়, এরা কেউ সর্বোচ্চ শ্রেণীর যাত্রী নয়। ক্যাপ্টেনের ঘুম ভাঙলে আমাকে ডাকতেন। ঘুম নিশ্চয় ভাঙেনি। ভাঙলে তাঁর হুকুমে বয় নিশ্চয়ই ছুটে আসতো! মেয়েটি তেমনি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলো,—ইউ তু প্রালে’?

—হ্যাঁ। আমরাও প্রালে’ যাচ্ছি। কো-কো-ডিমার দেখবো।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসলো, বললে,—কো-কো-দিম্যার!

—হ্যাঁ। আমার সঙ্গে আরও একজন আছেন।

—আই নো। হু ইজ হি? ক’ ফ্রের!

ফরাসী উচ্চারণ মেয়েটির ভালো নয়। তবু কথাটা আমি বুঝলাম, বললাম,—ঠিক ‘সহকর্মী’ নয়, উনি আমার ক্যাপ্টেন।

—ক্যাপিতানি?

—হ্যাঁ।

ততক্ষণে চায়ের পালা শেষ হয়েছে। ওর চায়ের দামটা ওকে আমি দিতে দিলাম না, আমি সেটা দিলাম জোর করে। বললাম,—বাধা দিয়ো না। আমি তোমার ‘ব’-আমি’ (সৎ-বন্ধু)।

মেয়েটি হাসলো, এবার ইংরেজীতে বললো,—থ্যাঙ্কস!

লোকদের বড্ড চোখ পড়ছিল আমাদের দুজনের ওপর। তাই সরে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হলো অবশ্য একসঙ্গেই। মেয়েটি তার দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনের দিকে যেতে যেতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললো,— ব’ ভয়িজ (যাত্রা শুভ হোক)।

আমি ওকে বললাম,—সেম টু ইউ। ব’ ভয়িজ!

নিজের শ্রেণীর দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি, দুধওয়ালা-সাহেব ঘুম ভেঙে আগেই উঠেছেন, বসেছেন ইজিচেয়ারে। আমাকে দেখেই বললেন,—উয়ো কৌন থী?

প্রশ্ন শুনে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। বুঝলাম, সাহেব কোন ফাঁকে নজর ক’রে সবই দেখেছেন। হিন্দীর উত্তরে হিন্দী বলাই উচিত। যতটুকু হিন্দী বিদ্যা আছে, তাই দিয়ে বললাম,—পাতা নেহি। আভি—আভি মুলাকাৎ হুয়া।

এবার মুখ ফিরিয়ে পুরোপুরি তাকালেন আমার দিকে। চোখদুটি কৌতুকে নাচছিল! বললেন,—দেখো ভাই, গার্ডেন অব ইডেন-মে জা রহী হো, ‘আদম’ মৎ বুন্ জানা!

আমার কানের কাছটা গরম হয়ে উঠলো। আমি লজ্জা ঢাকবার জন্য মুখখানা অন্যদিকে ফেরালাম। কোনো উত্তর দিতে পারছিলাম না। উনি আমার অবস্থা দেখে হেসে উঠলেন। আমি জানি মুড ভালো থাকলে ভীষণ রগুড়ে মানুষ উনি। জাহাজে রাজ্যিশুদ্ধ লোকের সঙ্গে লাগেন, ইংরেজীতে যাকে বলে ‘পা ধরে টানা’,—তাই করে থাকেন। বললেন,—আরে! সরমকা কেয়া বাৎ হ্যায়! যাও-যাও-‘ইভ’কা পাস যাকে বাৎচিৎ করো!

আমি আর থাকতে না পেরে বলে উঠলাম,—স্যার। মেয়েটির নামও আমি জানি না।

—তো যাও। তুরন্ত্ যাকে জান লেও। Why wasting time ?

আমি লজ্জা পেয়ে ছুটে ষ্টারবোর্ড-কেবিনের আড়ালে রেলিং-এর কাছে এসে দাঁড়ালাম। পিছন থেকে ভেসে এলো দুধওয়ালা-সাহেবের হো-হো হাসি।

সামনে উদার সমুদ্রে কিন্তু অদ্ভুত দৃশ্য! একেবারে ঘোর নীল জল, তার ওপর ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে ভেঙে সারা সমুদ্র জুড়ে ছড়িয়ে প'ড়েছে প্রত্যেকটি ঢেউয়ের মাথায় সাদা সাদা ফেনার বিন্দু যেন মণি-মাণিক্যের মতো জ্বলছে! আকাশটাও নীল, এধারে-ওধারে বিচ্ছিন্ন হালকা মেঘের টুকরো! সাদা আর নীল দিয়ে কোন অজানা শিল্পী এক আশ্চর্য ছবি এঁকে বসে আছে এরই মধ্যে। অভিভূত হয়ে যেতে হয়। দূরে—একটা কোণের দিকে—কালো মতন একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে। সেটা ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগলো। এখন দেখতে বিন্দুটা কালো নয়, ক্রমে ক্রমে সেটা সবুজ হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে একটা হালকা খয়েরী রঙের পোচ্ দেওয়া!

বুঝলাম, আমরা দ্বীপের দিকে এগোচ্ছি, ওটাই প্রালে দ্বীপ, ইংরেজী উচ্চারণ 'প্রাসলিন'। তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ডানদিকে দৃষ্টি গেল। দেখি; ডানদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনের কাছে আমার মতো ষ্টারবোর্ড সাইডের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি। আর তার মুখ আমার দিকেই ফেরানো। চোখাচোখি হতেই সে একটু হাসলো, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করলো,—এসো? এসো না? যাবার জন্য পা চঞ্চল, কিন্তু দুধওয়ালা সাহেব যদি আবার পিছনে লাগেন? তাঁর অবশ্য কোনো সাড়া-শব্দ পাচ্ছিলাম না। যাবো-কি-যাবো-না করছি, এমন সময় দেখি, মেয়েটাই ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে প্রায় ফিসফিসয়েই বললে,—'সের আমি'। উজ্জ্বল দুটি চোখের তারা। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। সে যে-কথাটা বললে, (যদিও উচ্চারণ যথাযথ নয়) আমি তার মানে জানতাম। 'প্রিয় পুরুষ বন্ধু'কেই মেয়েরা এই আখ্যা দিয়ে থাকে। এর উত্তরে ঐ কথাটাই আমার একটু বদ্‌লে বলার নিয়ম। কিন্তু মেয়েটি কী মনে করবে ভেবে সে-কথা আর মুখ ফুটে বলা হলো না। অথচ মুখে না বললেও চোখে কি সে-ভাষা ফোটে নি? নইলে সে হাত বাড়িয়ে রেলিং-এ রাখা আমার হাতে অমন করে তার হাত মিলিয়ে একটু চাপ দেবে কেন? অবশ্য দিয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছিল হাতটা। সমুদ্রের হাওয়ায় তার চুল উড়ছিল, তাকিয়েছিল সে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করেই সে যেন হঠাৎ বলে উঠলো,—গ্রাঁ মোরসি! (বহু ধন্যবাদ) ইউ গিভিন মি এ ফ্রেন্দ্!

অর্থাৎ সমুদ্রকে সে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাকে একটি বন্ধু দেবার জন্য। কেন জানি না আমি সেই মুহূর্তে কোনো কথা বলতে পারছিলাম না, অথচ বুকের ভিতরে যে ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠছিল, তাতে আর সন্দেহ কী? মনে হচ্ছিল, আমি বুঝি ষ্টীমারে নেই, ফরাসী দেশের বিখ্যাত মিউজিয়ামে পাশে সুন্দরী

সঙ্গিনী নিয়ে কোনো বিরাট শিল্পীর আঁকা অসামান্য এক শিল্পকর্মের সামনে বিমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি !

মেয়েটিও নিরুত্তর—নির্বাক। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর, যখন দ্বীপের কাছাকাছি আমরা এসেছি—লোকজনদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগছে,—তখন হাত বাড়িয়ে আমার হাতের ওপর তার নরম হাতের চাপ দিয়ে সে যেমন এসেছিল, তেমনি ধীরে ধীরে ফিরে গেল তার আসনের দিকে।

এরপরে দেখতে দেখতে এলো অবতরণের পালা। জেটিতে নেমে মেয়েটিকে চকিতের জন্য একবার দেখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে হন হন করে এক দিকে চলে গেল। হাতে একটা বড়ো ব্যাগ। স্টীমার যে জেটিতে ধরেছিল, সে জায়গাটার নাম 'গ্রাঁদ আঁসো !' এখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল দূরে নয়। একটি পাহাড়ী পথে ঘুরতে ঘুরতে উঠতে হলো। এটা অবশ্য পাকদণ্ডি-পথ 'স্বর্গোদ্যান'-এ যাবার এটাই প্রাচীন রাস্তা। এখন একটা চওড়া রাস্তা হয়েছে, গাড়ি করেও যাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক সেই সময় জেটির কাছে কোনো গাড়ি ছিল না। ছিল রিক্সার মতো একটা জিনিস, দুজনে মিলে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু দুধওয়ালা এতে রাজী হলেন না, পথের উদ্দেশ জেনে নিয়ে হেঁটেই রওনা হলেন ! স্টীমার থেকে নেমে আসা কয়েকজন কালো মানুষও ঐ পথে উঠছিল। আমাদের, বিশেষ করে ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম-পরা পোষাক দেখে তারা সসম্ভ্রমে পথের পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিচ্ছিল। খানিকক্ষণ হাঁটবার পরই আমরা সুন্দর একটি বাংলো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, বাংলোর 'নাম-ফলক'-এই সোমেশ্বর সাহেবের নাম খোদাই করা আছে। বাংলোর এক পাশেই তাঁর অফিস-ঘর। আমাদের ঢুকতে দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিলেন। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, গোঁফ আছে, চিবুকের কাছে একটু দাড়ি, একটু লালচে, মাথার চুলও তাই। অনেকটা আমাদের ছোটবেলার ছবিতে দেখা বৃটিশ-রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের মতো মুখের আদল, যদিও গায়ের রঙ ধবধবে নয়, বরং একটু কালো। চিঠি পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বারবার আমাদের 'ওয়েলকাম-ওয়েলকাম' করতে করতে ভিতরে একেবারে তাঁর সাজানো-গোছানো বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। এরপরে যা ঘটলো, তাকে আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা বলা উচিত। লাঞ্চে অন্যান্য আকর্ষণীয় খাদ্যবস্তুর সঙ্গে নারকেলের তৈরি জিনিস ছিল, আর ছিল গলদা-চিংড়ির একটি অনবদ্য 'ডেলিকেসি !' শেষপাতে মুখরোচক পুডিং তো ছিলই ! আমরা খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিলাম, কিন্তু রাজকীয় স্বভাবের মানুষটি তবু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন ! বারবার বলতে লাগলেন,—ঈস ! আগে যদি জানতে পারতাম ! মেনল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের 'কেব্‌ল-সংযোগ' রয়েছে, কিন্তু কদিন হলো তা 'আউট অব অর্ডার !' নইলে জেঠাভাই ঠিক আমাদের 'কেব্‌ল' পাঠাতেন আগে-ভাগে। আপনাদের এতো কষ্ট করতে হতো না, গাড়ি থাকতো একেবারে জেটিতে হাজির !

—'কোঈ বাত্‌ নেহি',—হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন সাহেবের।

সোমেশ্বর অবাক হয়ে তাকালেন, বললেন,—Indian—is it? How sweet!

যাইহোক, খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের নিয়ে বেরোলেন তিনি। বেশি হাঁটতে হলো না। যাকে বলে 'গিরি-খাদ',—সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে 'কো-কো-ডিম্যর'-গাছ! আমরা তখনো খাদে নামি নি, পাহাড়ের উচ্চতাতেই দাঁড়িয়ে আছি, কোনো কোনো গাছ আমাদেরও মাথা ছাড়িয়ে গেছে। মাথাগুলো অতিকায় জাপানী পাখার মতো দেখতে। জাপানী মেয়েরা যে-রকম হাত-পাখা দিয়ে বসে-বসে হাওয়া খায়, (ভাঁজ করা যায়, আবার খোলা যায়) খোলা অবস্থায় তা যেরকম দেখায়, ঠিক তেমনি, তবে আকারে বিরাট, রঙও সবুজ। তার ওপর একটু চিকন ভাব আছে। আমরা তারপরে নিচে নামতে লাগলাম। 'গিরিসংকট' বা 'খাদ' বলতে আমরা যা বুঝি, এ তা-ও নয়। নিচে নামতে হলো বটে, কিন্তু খাদের মতো সংকীর্ণ নয় জায়গাটা, বরং বলা যায়, ছোটখাটো উপত্যকা। কয়েকজন কালো মানুষ গাছের পরিচর্যা করছিল।

বিরাট বিরাট গাছও যেমন আছে, তেমনি ওদের পাশাপাশি শিশু চারাগাছও রয়েছে। হাতি-মায়ের সঙ্গে বাচ্চা-হাতির তুলনা টেনে আনা চলে, কিন্তু হাতি বলতে যে বন্যতার আভাষ আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, কো-কো-ডিমার (বা দিমার) গাছের পাতায়-পাতায় তা নেই, আছে কোমলতা। ফল ধরে আছে উঁচুতে, সবুজ ফল, জোড়ায়-জোড়ায়, গোলাকার বলেই মনে হলো। সোমেশ্বর ও জেঠাভাইয়ের কথার প্রতিধ্বনি করলেন,—হ্যাঁ, এটাই সেই স্বর্গোদ্যান, 'গার্ডেন অব ইডেন',—আর ঐ কো-কো-দিম্যারই হচ্ছে সেই নিষিদ্ধ ফল, যা ইভকে শয়তান প্ররোচিত করেছিল খেতে।

তারপরে আমাদের নিয়ে গেলেন একটি ছোট কুটিরে। এখানে টেবিলে সাজিয়ে পাকা ফল রাখা ছিল কয়েকটি। আমরা তাকিয়ে দেখলাম। জেঠাভাই একটু রঙ চড়িয়ে বলেছিলেন বলেই আমার কথাটা মনে হলো। বলে না দিলে ধরতেই পারতাম না যে, 'কো-কো-ডিমার' ফলের আকৃতি হচ্ছে 'গোপন স্ত্রী-অঙ্গের মতো'। এ-রকম সাদৃশ্য কতো কিসের সঙ্গে কতো কী বস্তুর থাকে, তা নিয়ে মাথা ঘামায় কে? আসলে এই ফলের শাস চুর্ণ 'কামোদ্দীপক আরক' হিসাবে ব্যবহৃত হবার জন্যই ঐ 'দৈবাৎ-মিল'টির কথা সাড়ম্বরে প্রচার করা হয়ে থাকে।

দুধওয়ালা ধীরে ধীরে অন্য প্রসঙ্গে এলেন, বললেন,—সত্যিই কি এই ফল অন্য কোথাও পাওয়া যায় না?

সোমেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ খুব কাছেই দুটা দ্বীপ আছে, তাতে সামান্য কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু ও-দুটো অতীতকালে এই 'প্রালে'-রই অংশ ছিল। না স্যার, পৃথিবীর অন্য কোথাও এ-ফল পাবেন না।

দুধওয়ালা পাহাড়ে উঠতে উঠতে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন, একসময় সুন্দর বড়ো একটা বাড়ি দেখে বললেন, ওটা কী?

সোমেশ্বর বললে,—ওটা এখানকার হোটেল। বাইরের লোক সাধারণত

ও-হোটেলেই এসে ওঠেন, বিশেষ করে যাঁরা কো-কো-দিম্যার দেখতে আসেন। এ-গ্রামটার নাম আগেই শুনেছেন হয়ত, 'গ্রাদ আঁসো'। এখান থেকে ভিক্টোরিয়ার দূরত্ব বিশ মাইল। কিন্তু ষ্টীমার আপনাদের ছেড়ে দিয়ে দ্বীপের অন্য প্রান্তে চলে গেল। সেটির দূরত্ব সাতাশ মাইল।

—পর্যটকরা এখানেই এসে ওঠেন তো?

—না-না—আরও নানান জায়গায় যান, তবে 'কো-কো-দিম্যার' দেখতে এখানেই অনেকে আসেন, যদিও দূরেও ঐ গাছের বাগান আছে। তবে এখানকার আর একটা আকর্ষণ আছে। সে আকর্ষণ মাছ ধরার। অনেকের কাছে মাছ ধরা একটা sport.

—তা ঠিক।

সোমেশ্বর বললেন,—আজকের দিনটা অন্তত যদি থেকে যেতেন, তাহলে গাড়ি নিয়ে আপনাদের নিয়ে ঘুরতাম। এখান থেকে চার মাইল দূরে রয়েছে 'বে-সেণ্ট-আনে' গ্রাম,—রাস্তাটা গেছে বিখ্যাত 'কো-কো-দিম্যার' উপত্যকা দিয়ে।

—এখন গিয়ে চারটের মধ্যে ফিরে আসা যাবে না?

—না। থাকুন না আজ রাত্তিরটা?

দুধওয়ালা একটুক্ষণ থেমে কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন,—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু রুটিনমাফিক না ফিরলে অনেক কিছু প্রোগ্রাম আপসেট্ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের খেদ নেই, 'কো-কো-ডিম্যার' তো দুচোখ ভ'রে দেখে গেলাম।

সুতরাং চা-পানের পর আবার জেটিতে নেমে যাওয়া। গাড়ি একখানাই মাত্র আছে এই গ্রামে, আর সেখানি আছে সোমেশ্বর সাহেবেরই হেফাজতে। কিন্তু আমার ক্যাপ্টেন-সাহেব গাড়ি নিতে চাইলেন না, পাকদণ্ডি পথে ঘুরে ঘুরে নেমে যাওয়াই তিনি পছন্দ করলেন। ষ্টীমারে আমাদের তুলে দিতে এলেন স্বয়ং সোমেশ্বর।

গিয়ে দেখি, ষ্টীমার অনেক আগেই এসে জেটিতে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ধূমোদ্গীরণ করছে! এবার ষ্টীমারের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে আরও দুজন যাত্রী ছিলেন, দুজনেই ইয়োরোপীয়ান, তার মধ্যে একজন ধর্মযাজক, বৃদ্ধ। দেখতে দেখতে তাঁদের সঙ্গে জমে গেলেন ক্যাপ্টেন দুধওয়ালা। আমি উঠে ষ্টারবোর্ড সাইডের রেলিং ধরে দাঁড়ালাম, পিছনে কেবিনের আড়াল। সমুদ্রের রঙ্ এখন আর নিছক নীল নয়, বেগুনী। মাথায় মাণিক নিয়ে ছোট ছোট ঢেউ আর ভাঙছে না! বরং ঢেউ একটু বড়ো বড়ো, হাওয়াতেও জোর আছে, ষ্টীমারের দুলুনিও তাই মন্দ নয়। কিছুক্ষণ পরে ডানদিকে তাকাতে গিয়ে অপার বিস্ময়ের সম্মুখীন হলাম। মুখে টুকরো হাসি, সেই মেয়েটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অংশের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এবারেও সে ধীরে ধীরে হেঁটে আমার কাছে চলে এলো। আবার 'বঁ-জুর'-এর পালা। বললাম,—খোঁজ পেলে তোমার বন্ধুর?

উত্তর দিলো,—সে প্রালেঁতে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু এখন প্রালেঁতে নেই, অনেক দূরে চলে গেছে।

—কী করে?

মেয়েটি বললে,—এক মোটর লঞ্চে ক'রে অন্য এক দ্বীপে।

—তাহলে?

উত্তর দিলো,—শহরে তো ফিরি, তারপরে দেখা যাক কী করা যায়।

বললাম,—তোমার সঙ্গে যে আবার এমনি করে দেখা হবে, তা ভাবতেও পারি নি।

—আমিও না। আমি ভেবেছিলাম, তোমরা কো-কো-দিমারের বাগানে রাত কাটাবে!

—ওঁরা বলেছিলেন, কিন্তু আমার 'ক্যাপিতান' কিছুতেই রাজী হলেন না।

মেয়েটি বললে,—'সৎ বন্ধু', একটা বড়ো জিনিস 'মিস্' করলে।

—কী রকম?

উত্তর হলো,—রাত্রে যদি বেড়াও ঐ কো-কো-দিম্যারের জঙ্গলে, তাহলে সত্যিই 'গার্ডেন-অফ-ইডেন'কে ফিল করবে। মনে হবে, 'আদম' আর 'ইভ' কোথাও বসে ফিস ফিস করে কথা বলছে!

আমার মনে হলো বলি, এ-আমি ফিল করেছি, এ-আমি দেখেছি, তবে এই 'প্রালেঁ'র স্বর্গোদ্যানে নয়, মূল ভূখণ্ডের সংলগ্ন একটি দ্বীপে! কিন্তু এ-কথা আর মুখ ফুটে বলা হলো না।

ফেরার পথেও ষ্টীমার 'সেণ্ট আনে'-দ্বীপে ধরলো, অনেক লোক নেমে গেল। সর্বোচ্চ শ্রেণীতে কিন্তু কোনো চাঞ্চল্য জাগলো না, সেখানে নিদারুণ গল্প জমে গেছে। হয়ত 'তথ্য'-এর প্রাধান্য ছিল না। থাকলে নির্ঘাৎ আমার ডাক পড়তো। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামলো। সার্চ লাইট জ্বালিয়ে ষ্টীমার চলতে লাগলো। আমরা তখনো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত ছুঁয়ে।

একসময় ফিসফিস করে বললাম,—আবার কি দেখা হতে পারে না?

ওর মাথার চুল হাওয়ায় উড়ে আমার গালে-কপালে লাগছে। বললে—কাল তাহলে এক কাজ করো। বেলা ঠিক চারটের সময় গর্ডন স্কোয়ারে এসো। সমুদ্রের দিকের অংশে কোনো একটা বেঞ্চিতে আমাকে দেখতে পাবে। যদি নেহাৎ-ই না পাও, তো, একটু অপেক্ষা করবে। আমি ঠিক এসে পড়বো কেমন? এখন তাহলে? বিদায়। আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত বিদায়। অ-রেভোয়া!'

—অ-রেভোয়া!

যে যার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। জেটিতে নেমে উঠলাম এসে আমাদের জাহাজে।

বড়ো ক্লান্ত লাগছিল। পরদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল। জাহাজের প্যান্ট্রি-বয় এসে খবর দিলো, বাড়িওয়ালা ডাকছে।

গেলাম। দুধওয়ালা বললেন,—যা-যা নোট নিয়েছো, আজ লিখে ফেলো। তারপরে টাইপ করে আমাকে দিয়ো। আজ আর বেরুচ্ছি না। রাতে আমার ডিনারের নেমন্তন্ন আছে আমাদের এজেণ্ট-সাহেবের বাড়িতে।

—ঠিক আছে স্যার।

তখন থেকেই খাটতে শুরু করলাম। তাও লিখে, সেটা ওঁকে দেখিয়ে, তারপরে টাইপ করে ওঁকে দিতে দিতে বেজে গেল দুটো। একটু শুয়ে গড়িয়ে নিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ বেরুলাম। গর্ডন স্কোয়ারে গিয়ে ওকে খুঁজে পেতে বার [illegible] কোন্ না চারটে বেজে যাবে! মেয়েটি কিন্তু কথা রেখেছিল। একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে বেঞ্চির ওপর বসে আছে একা। দেখে, উঠে দাঁড়ালো, হাসলো, আবার সেই 'সৎ-বন্ধু' সম্বোধন। বললে—বোসো।

বসলাম পাশাপাশি। ও একটু হেসে উঠলো, বললে,—অতো আড়ষ্ট হয়ে রইলে কেন? এখানে কেউ এসব কিছু মনে করে না! একটু পরেই দেখতে পাবে, জোড়ায়-জোড়ায় কতো আসবে!

—ধন্যবাদ।

আমার হাতখানা হাতের ওপর টেনে নিয়ে বললে,—মঁশিয়ে শিপম্যান, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। কাল ছুটি নিতে পারবে?

—কেন?

মুচ্‌কি হাসলো, বললে,—কাল সারাটা দিন, সারাটা রাত। পারবে ছুটি নিতে?

—চেষ্টা করবো। কিন্তু কেন?

—বাইরে যাবো। তোমাকে নিয়ে।

বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। অস্ফুট গলায় বললাম,—ঐ দ্বীপে? নৌকো করে?

কথাটার তাৎপর্য বুঝে হেসে ফেললো, মুখখানা লাল হয়ে উঠলো, না। তার থেকে অনেক দূরে। লঞ্চে ক'রে। সে হচ্ছে পাখীদের দেশ। হাজার-হাজার লাখ-লাখ পাখী। এমন দৃশ্য তুমি কখনো দেখো নি! এই হচ্ছে 'সিজ্‌ন।' অগাস্ট পর্যন্ত থাক্‌বে। সাধারণ লোককে দেখতে দেওয়া হয় না। আমি ম্যানেজ করে একটা লঞ্চে যাচ্ছি, সঙ্গে আমার 'সৎবন্ধু'কে নিতে পারবো, কথা হয়ে গেছে! কিছু 'সেণ্ট' হয়তো খরচা হবে। তা হয়, হোক।

বললাম,—তার জন্য ভেবো না। আমি দেবো।

হেসে, আমার হাতে চাপ দিয়ে বললে,—বেশ। তাই দিয়ো। কিন্তু শোনো, তোমার 'ক্যাপিতানি'কে জানিয়ো না, হয়ত যেতে চাইবেন। তাহলে সমস্ত 'ফান্'ই নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি শুধু ছুটি নেবে - একটা দিন আর একটা রাতের জন্য। পারবে না?

বললাম,—সাহেব বড়ো মুডি। দেখি, কী করে ম্যানেজ করা যায়।

মেয়েটি বললে,—কাল সকালে আমি ভিক্টোরিয়া ক্লক টাওয়ারের নিচে

থাকবো। দেখো, ঠিক সাতটার সময় আসবে। লঞ্চ কিন্তু ঐ 'লং পীয়ার' থেকে ছাড়ছে না। গাড়ি ঠিক করে রাখবো। শেয়ারে যাবো, বেশি খরচ হবে না। যেখানে যাবো, সেখান থেকে লঞ্চটা ছাড়বে। প্রাইভেট লঞ্চ। কেমন, ঠিক আছে ?

—ঠিক আছে।

বলে তো চলে এলাম। কিন্তু মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ক্যাপ্টেন সাহেব ছুটি দেবেন তো ? ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, ডিনার থেকে ফিরলেন রাত নটার মধ্যেই। দেখলাম, মেজাজ খুব খুশ, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এর-ওর-তার সঙ্গে খুব হিন্দী বলছেন! আমাকে দেখেই বললেন,—কেয়া হ্যায় রাইটার-সাব। বাতাইয়ে!

ছুটির কথা বললাম। শুনে, প্রথমেই চোখ বড়ো-বড়ো করলেন, বললেন, —হোল ডে অ্যান্ড নাইট্ ? কেয়া ভাইয়া, কুছ গড়বড় তো নেহি ?

—না স্যার। একটু ঘুরতে যাবো। যাকে বলে ছোটখাটো 'Island-hopping' আর কী!

—Island-hopping!—সাহেব বললেন,—অফিসিয়ালি ছুটি দেওয়া যায় না। আন-অফিসিয়ালি দিচ্ছি। মগর, এক প্রমিস। যা দেখবে, সব ভালো করে লিখবে আর টাইপ করে আমাকে দেবে।

—নিশ্চয়ই স্যার। With pleasure.

—ও-কে! মগর এক বাৎ! কোঈ 'ইভ'কো সাথ্ মৎ ফাঁস যানা!

কানের কাছটা গরম হয়ে উঠছিল, মাথা নিচু করে কোনোক্রমে বললাম,—না স্যার। আফটার অল, আই অ্যাম ম্যারেড,—বিবাহিত।

—হ্যাঁ, সেটা মনে রাখবে। গুডনাইট্!

—গুডনাইট!

কেবিনে ফিরে এসে দেখি, কার্তিক বসে আছে। বললে,—আজ পুরো এই মাহে দ্বীপটা ঘুরে দেখেছি।

—কে কে ঘুরলেন ?

—সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসার আর ছিলাম আমি। কম বড়ো নয় দ্বীপটা, সতেরো মাইল লম্বা, আর চার থেকে সাত মাইল চওড়া। তার মানে আমাদের কলকাতার থেকে বড়ো। আপনি তো বাড়িওয়ালার সঙ্গে খুব ঘুরে এলেন।

বললাম,—পরশু সব বলবো। আজ বড়ো ক্লান্ত।

উঠে দাঁড়ালো, বললে,—কালও বেরুবেন তো ?

—হ্যাঁ, খুব ভোরে। কিন্তু বন্ধু, ছটায় ব্রেকফাস্ট পাবো কী ?

—খুব পাবেন। আমি কুক্‌কে বলে রাখবো'খন।

—একটু বেশি করে দিতে বলবেন তাহলে। লাঞ্চ তো খাচ্ছি না, ডিনারও খাবো না। দুটো প্যাকেটে করে যেন দিয়ে যায়। কেমন ?

—একটি বাড়িওয়ালার জন্যে ?

— না—না। বাড়িওয়ালা কাল যাচ্ছেন না। একাই যাচ্ছি, এখানকার এক বন্ধুর সঙ্গে। তবে কাজটা বাড়িওয়ালারই। বুঝলেন ?

—বুঝলাম !

খানিক ক্ষণ গল্প করে চলে গেল কার্তিক। আমি জানি ও ঠিক কুককে বলে রাখবে। পরদিন ভোরে প্যাকেট দুটি নিলাম, আর নিলাম একটি হাত ব্যাগ, টুকিটাকি জিনিস আর একটি বাড়তি প্যান্টসার্ট, তোয়ালের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে। ভিক্টোরিয়া টাওয়ার-ক্লকে সে ঠিক দাঁড়িয়েছিল একটা ফিকে নীল ফ্রক পরে। ওরও হাতে একটা ছোট ব্যাগ। শেয়ারের ট্যাক্সিতে যারা উঠলো, তারা সবাই কালো লোক। মেয়েটির মাধ্যমে জানলাম, তারা সবাই আমাদের সহযাত্রী। তারা তিনজন মাত্র। আমাদের গাড়ি একসময়ে একটা সংকীর্ণ পথ ধরে পাহাড়ের ওপারে, অর্থাৎ পশ্চিমে পেঁছে, ডানদিকে উত্তরের পথ ধরলো, পেঁছলো গিয়ে একেবারে 'মাহে'র উত্তরতম প্রান্তে, যার নাম 'নর্থ পয়েন্ট', সেখানে। এখানে আমাদের জন্য লঞ্চ দাঁড়িয়েছিল। ওপরে সারেঙের ঘর ছাড়া একটি মাত্র কেবিন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আমরা দুজনে সেই কেবিনে অধিষ্ঠিত হয়েছি। তাকিয়ে দেখি, অন্তত গোটা চারেক সাবেকী পালতোলা জাহাজ নোঙর করে রয়েছে। যেতে হবে আমাদের আটান্ন মাইল দূরে, 'বার্ড আইল্যান্ড'-এ।

স্টীমার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলো। দুজনে গুছিয়ে ব্রেক ফাস্ট খেয়ে নিলাম। চা আনালাম লঞ্চেরই 'কিচেন' ঘর থেকে। বলা বাহুল্য 'লাঞ্চ, ডিনার, সাপার' সবই আসবে কিচেন থেকে। যে খরচা লাগবে, তা মাত্র কিছু 'সেন্ট' দিয়ে কুলোবে না। আমি যে অর্থ নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলি গুণে নিয়ে মেয়েটি বললো,— খুব ফুলিয়ে যাবে এতে। কিচ্ছু ভেবো না।

ওর হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম,— আচ্ছা তুমি কে, বলো তো ? তোমার নামই তো জানি না !

মুখ টিপে হাসলো, বললে, — শিপম্যান, নামে কি দরকার ? আমি এক সাধারণ ক্রিয়োল মেয়ে। সামান্য একটু পড়াশুনা করেছিলাম। তবে এইসব মাঝিমাল্লারা আমাকে খুব চেনে। কে আমার বাবা জানি না, মা কখনো বলেনি। মা অনেকদিন আগেই চলে গেছে 'লা-দিগু' দ্বীপে অন্য একজনকে বিয়ে করে। ব্যস, এই তো আমার পরিচয় !

—কিন্তু কী বলে ডাকবো তোমাকে ? একটা নাম চাই তো ?

— বানিয়ে নিতে পারলে না ? আমার নাম 'ইভা'। অল্ রাইট্ ?

— অল রাইট্।

বলতে বলতে হঠাৎ শুয়ে পড়লো আমার কোলে মাথা রেখে। বললে, — শিপম্যান, দ্বীপটা আমি একবার দেখেছিলাম। এক চিলতে ছোট্ট দ্বীপ। একটা ছোট পাহাড়ের চূড়া বাদ দিয়ে সবটাই সমতল বলতে পারো, 'সি-লেভেল' থেকে মাত্র আট ফিট উঁচু। এক কালে 'ডুগং' বা 'সি-কাউ' বা নাবিকরা দূরে

থেকে যাকে দেখে 'মারমেইড' বলে মনে করতো, তার সংখ্যা ছিল কম নয়। এখন আর দেখা যায় না। এখন শুধু আসে পাখীর ঝাঁক। দ্বীপটার আয়তন কতটুকু শুনবে? ১৬০ একর। লোকজনের বসতি নেই। শুধু এই সিজনে গিয়ে দু-চারটি লোক কাজ করতে নামে। অস্থায়ী ঘর করে নারকেলের পাতা দিয়ে। এইবার বুঝতে পারছো কেন ওখানে যাচ্ছি? আমার সেই বন্ধুটি গেছে ওখানে 'প্রালে'' দ্বীপ থেকে, কাজ করতে। আমি তার খোঁজেই যাচ্ছি। ওগো আমার 'সৎ-বন্ধু' তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?

—অবশ্যই করবো।

আমার চোখের দিকে তাকালো ইভা, একটু মুচকি হাসলো, বললে,—কী? জেলাস হচ্ছো না তো?

—না।

—সত্যি বলছো?

—সত্যি বলছি।

ইভা তেমনি করে শুয়েই রইলো আমার কোলে মাথা রেখে। বললে,—পাখীর ঝাঁক দেখে তুমি অবাক না হয়ে পারবে না। লক্ষ লক্ষ পাখী একসঙ্গে উড়ে এখানে আসে বহুদূর থেকে আকাশ পথ পেরিয়ে। যখন আসে, তখন আকাশের চেহারা কেমন হতে পারে কল্পনা করে নাও! এখন অবশ্যি এ ছবি দেখতে পাবে না,—কারণ পাখীরা ইতিমধ্যে এসে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা, কী পাখী এরা?

ইভা বললে,—এক ধরনের যাযাবর পাখী–মাইলকে মাইল উড়ে আসে এই দ্বীপে—ডিম পাড়তে। 'সী-গাল' দেখেছো তো? তাদের থেকে দেখতে একটু ছোট। 'Tern' বলে একরকম সমুদ্র-পাখী আছে, এরা সেই জাতের! তবে এদের একটা নামও আছে,–গোয়েলেৎ। শরীর আন্দাজে ডানা দুটি লম্বা। ডানা বা পিঠের দিকটা কালো অথবা ঘোর বাদামী, আর ডানা বা শরীরের নিচের দিকটা ধবধবে সাদা। যাচ্ছো তো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। গলার স্বর গম্ভীর। যখন ডাকে তখন মনে হয়, ইংরেজীতে বলছে,—'wide awake!' *জেগে ওঠো—জেগে ওঠো!*

আমার পরম সৌভাগ্য এই অক্ষৌহিনী সেনাবাহিনীকে আমি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলাম। বালুবেলায় সারি সারি সব বসে আছে। দূর থেকে মনে হয়, কালো ইউনিফর্ম-পরা ছোট চেহারার সৈনিকের দল পরপর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের লাইনে একটুও বাঁকাচোরা ভাব নেই! যখন উড়ে চলে যায় সমুদ্রের দিকে, তখন বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে তাদের নিচেকার সাদা অংশটা! লক্ষ লক্ষ পাখির এই রকম সারি দেখতে পাওয়া এক বিরল দৃশ্য অবলোকন করার অভিজ্ঞতা। মায়েরা ডিম পাড়ে। ডিম পেড়ে সমুদ্রে উড়ে যায়, তখন বাপ-পাখীরা এসে তা দিতে বসে। সমুদ্রে এই সময় ছোট মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়ায় প্রচুর। এদের বয়স্ক সেনাপতিরা সে খবর রাখে। পাহাড়ের

ওপর যে তিন চারটে পাখী বসে আছে, তারাই সেনাপতি। যেদিকে যখন বাতাস বয়, সেদিকে তখন মুখ ফিরিয়ে থাকে। এরাই মাছের ঝাঁকের সন্ধান পায়, হঠাৎ উড়ে আসে এক পাক, 'জাগো-জাগো' বলে ডেকে ওঠে। সমস্ত পুরুষ পাখী উড়ে গিয়ে ছোঁ মারতে থাকে মাছের ঝাঁকে। তাদের কাজ শেষ হলে তারা ফিরে আসে ডিমের কাছে, মেয়ে-পাখী তখন উড়ে যায় শিকার করতে।

কিন্তু মানুষের লোভ এদেরও ছেড়ে দেয় না। মানুষ অবশ্য এই পাখীদের মারে না, খালি তাদের ডিমগুলো চুরি করে। রাতের বেলায় এই চুরিটা হয়। যেই ওঠে, অমনি পিছন থেকে মানুষ সেই ডিমটা ক্ষিপ্র হাতে সরিয়ে নেয়। পুরুষ-পাখী ডিম না দেখতে পেয়ে ডাকতে থাকে, মেয়ে-পাখী ফিরে এসে আবার ডিম দেয়। এমনি করে দুটি তিনটি কখনো বা চারটি পর্যন্ত ডিম দেয় তারা। মজা হচ্ছে, মানুষকে ওরা ভয় পায় না, ডিম দেবার জন্য বসে থেকে মুখ ফিরিয়ে পিছনের মানুষটিকে দেখে, কিন্তু সে যে কে এবং কী, তা বুঝতে পারে না। দ্বীপের অন্য দিকে নারকেল পাতা দিয়ে তৈরি অনেকগুলি ঘর নারিকেল গাছগুলোর নিচে। তাতেই ডিমের বোঝা জমতে থাকে, কোনোটাতে কাজের মানুষরা শোয়। আমাদের লঞ্চ দ্বীপের পিছন দিকে, একটু কোণাকুণি, প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়ে থেমে রইলো। কারণ, আর কিছুই নয়, সারেঙ জানালেন, লঞ্চের শব্দে পাখীরা ভয় পেতে পারে। আমাদের লঞ্চের মতো আরও গোটা ছয়েক সাবেকী পালতোলা সমুদ্রগামী নৌকো নোঙর করে রয়েছে তারা অবশ্য দ্বীপের অনেকটা কাছাকাছি রয়েছে। কাজ-করা লোকদের খাবার, পানীয় জল সব তারাই জোগান দেয়, আর বোঝাই করে ডিম, রাতের বেলা। রাতের বেলা তারা চুপিচুপি কিনারে গিয়ে লাগে। আর আমাদের লঞ্চ এসেছে তাদের রেশন নিয়ে। তার সঙ্গে টুকিটাকি দরকারী জিনিস, মায় ওষুধপত্র পর্যন্ত। লঞ্চের ছাদে, আমাদের কেবিনের পাশে যে ছোট নৌকোটা ছিল, সেটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হলো। তাতে উঠলো সেই তিনজন কালো মানুষ, আর রেশনের জিনিসপত্র। তখন পড়ন্ত বিকেল, সূর্য তখনো ডোবে নি। ইভা নিচে নেমে গেল। গিয়ে উঠলো ঐ নৌকোয়। আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাত নাড়লো, ইঙ্গিতে জানালো, আমি এখুনি আসছি। তুমি কিছু ভেবো না। চুপচাপ থেকো।

দেখলাম, নৌকোটা গেল কোনো একটা পালতোলা বড়ো নৌকোর কাছে। সেখানে রেশনপত্র ওঠালো ঐ তিনজন কালো মানুষ। তারপরে দেখলাম: দুজনকে রেখে এক জন কালো মানুষ দাঁড় বেয়ে নৌকোটাকে নিয়ে চলেছে দ্বীপের দিকে। নৌকোতে বসে আছে ইভা। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি সারেঙের দূরবীনের সাহায্যে,—নৌকোটা গিয়ে সেই নারিকেল পাতার ঘর-গুলোর পিছনে একটা ছোট বাঁশের জেটিতে গিয়ে লাগলো। লাফ দিয়ে নামলো একটি মানুষ। সে হচ্ছে ইভা। সে নারকেলের ঘরগুলোর আড়ালে

চলে গেল, আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। আমি সারেঙের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। ঐ ভাঙা ইংরেজীতে কোনোক্রমে সে কথা বলতে লাগলো। এটিও কালো মানুষ। দেখতে গাঁট্টাগোট্টা, কিন্তু মুখের রেখায় ভারী একটা শান্তভাব বিরাজ করছে। ওর কাছ থেকে পাখীদের সম্বন্ধে আরও খবর পেলাম। ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা করবে পাখীরা। মায়েরা-বাপেরা দুজনে মিলে বাচ্চাকে খাওয়াবে তারপরে বড়ো হলে পরে সমুদ্রের দিকে শূন্যে নিয়ে যাবে ওড়া শেখাতে। বাচ্চা যখন বড়ো হবে, তখন ঐ পাহাড়ে-বসা সেনাপতিরা অনুকূল দিনক্ষণ বুঝে একদিন ইঙ্গিত করবে, সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে উড়বে লক্ষ লক্ষ পাখী। তারা উড়তে উড়তে চলে যাবে অনেক দূরে সার বেঁধে। কোথায় জানো ? ভারতবর্ষে।

—ভারতবর্ষে ! বলছো কী ! ভারতবর্ষের কোথায় ?

—হিমালয়-পারে।

—হিমালয়-পারে – কোথায় ?

—মানস-সরোবরে।

কথাটা শুনে সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। এ-ঘটনা ঘটবে অগাস্টে, বাচ্চাগুলো বড়ো হয়ে ডানায় যখন জোর পাবে তখন। সুতরাং আমার দেখা হবে না। মাঝপথে ওরা কোথাও থামবে না, হাজার হাজার মাইল উড়তে উড়তে চলে যাবে আমাদের জন্মভূমিতে—মানস-সরোবরে !

একটু পরেই সূর্য ডুবলো। গোধূলির আলো ম্লান হয়ে আসতে লাগলো। তবু চরাচর ঠিক অন্ধকারে ঢাকে নি। তখনো অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেখতে পেলাম, নারকেল পাতার ঘরগুলির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ইভা, এসে সেই ছোট্ট নৌকোয় উঠলো। নৌকো গেল আগেকার সেই পাল-তোলা বড়ো নৌকোর কাছে। অন্য মানুষ দুজন নৌকোয় উঠলো। এইবার তারা আসতে লাগলো আমাদের লঞ্চের কাছে। লঞ্চ তখন আস্তে আস্তে নোঙর তুলতে লাগলো। মুখ ঘুরিয়ে এবার সে যাত্রা শুরু করবে। ফিরে যাবে 'মাহে'তে। ইভা যখন কেবিনে এসে আবার ঢুকলো, তখন চরাচর দ্রুত অন্ধকারের যবনিকায় ঢেকে যাচ্ছে !

ওর মুখখানা থমথমে। ধপ করে বিছানায় এসে বসলো। তারপর নিজে থেকেই বললো,—নাঃ, ! এলো না। ওর বদলে অন্য কাজের লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ও চলে আসবে, আর সে লোক ওর কাজে ঢুকবে। এ রকম এখানে হয়। কিন্তু কার জন্য এতো করলাম ? কাজ ছেড়ে সে আসবে না। অনেক করে বললাম, কান্নাকাটি করলাম, বুঝলে ? তবু আমার কথা সে শুনলো না !

বলতে বলতে তার গলা ধরে এলো।

—কেন বলো তো ? কারণটা কী ?

ও চোখ তুলে তাকালো, তারপরে বললে,—লোকটার বিপদ যাচ্ছে জানি। বউ পালিয়েছে ডাইভোর্স করে। যাদের কাজ করছিল, তারা ওকে নানান ভাবে

বেঁধে ফেলেছে ! 'প্রালে'’তে মালিক কাজ করতে পাঠিয়েছিল অন্য একজনের কাছে, কিন্তু সেখানে ওর ভালো লাগলো না, জনকয়েকের সঙ্গে খাতায় নাম লিখিয়ে উধাও হয়ে এলো এখানে। মালিক কিন্তু একজন। ও যেখানে যা রোজগার করবে, তার খানিকটা অংশ দিয়ে যেতে হবে মালিককে।

—কেন, ও কি দাস ? স্লেভ ?

—না। সে-সিস্টেম অনেক কাল উঠে গেছে। কিন্তু চুক্তি-বাঁধা মজদুরও 'দাস'দের থেকে কম নয়। তার ওপর মালিক যদি মহাজন হয় তো কথাই নেই ! সুযোগ বুঝে চড়া সুদে ধার দিয়ে ধার দিয়ে এমন বেঁধে নেয় যে, আর থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল ! সাধে কি আমরা সেই রহস্যময় দ্বীপে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম ?

—কিন্তু তুমি যখন এই পাখীদের দ্বীপ থেকে ওর বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলে, তখন তাতে ও সাড়া দিলো না কেন ?

ইভার চোখদুটি ছলছল করে এলো, বললো,—কে জানে ! মরুক। আমি আর ফিরেও তাকাবো না ! এসো, খেতে যাই। খিদে পায়নি ?

—চলো।

গেলাম নিচে। অনেকক্ষণ বসে গল্প করতে করতে খেলাম আমরা। ইভা বোধহয় ও ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে ! নইলে, এতো সহজে গল্প-গাছা করতে পারতো কী ? এখন যেন অন্য মানুষ !

আমরা ওপরে এলাম, আমাদের কেবিনে। সারারাত চলবে লঞ্চ, রাত থাকতেই গিয়ে পেঁছনোর কথা নর্থ পয়েণ্টে। ভোর হওয়া পর্যন্ত আমরা লঞ্চে থাকবো। তারপরে তীরে গিয়ে গাড়িতে উঠে সোজা চলে যাবো ভিক্টোরিয়ায়।

কেবিনটা ছোট। একটি খাট মাত্র। অন্যদিকে সরু মতন সোফা একটা আছে, তার ওপর কষ্টেসৃষ্টে শুয়ে থাকতে পারবো। কিন্তু ইভা তাতে রাজী নয়। সে আমাকে টেনে আনলো বিছানাতে। বললো,—গল্প করে কাটাবো সারারাত। ভাবছো কেন ?

—আচ্ছা, লঞ্চ শুদ্ধ লোক কী ভাবছে বলো তো ?

—কিছুই ভাবছে না। ওরা এতে অভ্যস্ত। নাও শোও। এবার আমার কোলে মাথা রেখে তুমি শোও। আমি তোমাকে অনেক গল্প বলবো। মঁশিয়ে শিপম্যান, সিসেল্স্ তোমার কেমন লাগলো ?

—খুব ভালো।

ইভা বললে,—মাস খানেক থাকো, তোমার আর যেতে ইচ্ছে করবে না ! এমনি চার্ম আছে জায়গাটার। কেউ কারুর প্রাইভেট লাইফ নিয়ে বড়ো একটা মাথা ঘামায় না—যে যার রুজি-রোজগার নিয়ে ব্যস্ত। আহা ! খেটে-খাওয়া মানুষগুলো যদি আর একটু বেশি রোজগার করতে পারতো ! ওরা বড়ো Ill-paid।

ওর কোলেই শ‍ুয়েছিলাম, এবার ওর হাতটা টেনে নিলাম ব‍ুকের ওপর। বললাম,—সত্যি করে বলো ত? তুমি কী করো? তোমার চলে কী করে?

ম‍ুখখানা একটু গম্ভীর হলো, বললে,—কাজের আমার ঠিক-ঠিকানা নেই। যা পাই সেই কাজই করি। সেলাই জানি, নার্সিং জানি, কাজের আমার অভাব কী? না বন্ধ‍ু, এ ধরনের আলোচনা এখন না করাই ভালো। নাও ওঠো, আমি এবার শ‍ুই।

উঠলাম। বললাম,—আমি সোফায় যাচ্ছি। তুমি আরাম করে শোও।

—As you please।

একটা বালিশ টেনে এনে আমি সোফায় শ‍ুয়ে পড়লাম। নিচে কেউ ব‍ুঝি কোনো 'তারের যন্ত্র' বাজাচ্ছে। গ‍ুমরে-গ‍ুমরে ওঠা ভারী কোমল স্বর! অথচ, বাজছে খ‍ুব আস্তে, কাণে কাণে কথা বলার মতো স্বরে।

কেবিনের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই অন্ধকারে হঠাৎ এক-সময় ভেসে এলো ইভার কণ্ঠস্বর: শ‍ুনছো?

—কী?

—ঐ স্বর?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, তুমি কি বিবাহিত?

—হ্যাঁ।

উত্তেজনায় বোধহয় উঠে বসলো,—তাই নাকি!

—নতুন বিয়ে করেছি।

—রিয়্যালি?

—হ্যাঁ।

—দাঁড়াও, আসছি। ঘ‍ুম আসছে না।

—আলোটা জ্বালবো?

—না।

একটু পরেই ব‍ুঝলাম, সে এসে বসেছে মেঝের ওপর। আমার সোফাটা ঘেঁষে। আমার একটা হাঁটু ছ‍ুঁয়ে বলে উঠলো,—ম'শিয়ে শিপম্যান?

—ইয়েস?

—প্রালে' দ্বীপের গার্ডেন অফ ইডেনে ঘ‍ুরেছিলে?

—হ্যাঁ।

—গাছের পাতার বাতাস লাগে নি?

—লেগেছিল।

—গা শিরশির করে নি?

—হয়ত করেছিল।

বেশ ব‍ুঝলাম, এগিয়ে এসে আমার ম‍ুখের কাছে বসেছে। বললে,—যদি

তোমাকে ওদের সেই aphrodisiac (কামোদ্দীপক)-চূর্ণ খেতে দিতো ? তাহলে কী হতো এখন ?

—জানি না।

—এমন কাটা-কাটা উত্তর দিচ্ছো কেন ? কী ভাবছো বলো তো ?

– সত্যি বলবো ?

—বলো।

—আমার মন জুড়ে রয়েছে পাখীরা।

- কো-কো-ডিমার নয় ?

—না।

—কেন বলো তো ?

-জানি না। চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছি, সেই পাখীর ঝাঁক ! হাজারে হাজারে লাখে লাখে তারা বসে আছে সমান্তরাল রেখায় !

কথাগুলো শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে আমার বুকের ওপর মুখ রাখলো। কেটে গেল অনেকটা সময়। তারপরে একসময় ফিস ফিস করে বললো,—একটা কথা বলবো ?

—কী ?

—বলবো ?

—বলোই না।

—তোমার প্যাণ্টটা খুলে ফেলো না ?

চমকে উঠলাম এ অভাবনীয় প্রস্তাবে ! কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বলে উঠলাম,—কিন্তু এটা তোমার সেই রহস্যময় দ্বীপ নয়, যেখানে লোকে হারিয়ে যায় ! না ইভা, আমি হারিয়ে যেতে চাই না, ঐ পাখীরা আমার কাছে প্রতীক। ওরা যেখানে যাবে, সেটাও আমার কাছে চরম পবিত্রতার প্রতীক !

—ওরা কোথায় যাবে !

—মানস সরোবর !

বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছি। সেই তারের যন্ত্রটা এখনো কোমল সুর বাজিয়ে চলেছে। আমি দরজা খুলে ছিটকে বাইরে এলাম। কী করে যে সে প্রলোভন জয় করতে পেরেছিলাম, তা বলতে পারবো না ! সেখান থেকে নিচে খেটে-খাওয়া কালো মানুষদেরই একজন বসে এক মনে তার বাজনাটা বাজিয়ে চলেছে, আমি গিয়ে তার কাছে বসলাম। উঠলাম যখন, তখন ভোর হচ্ছে, লঞ্চ গিয়ে ভিড়েছে নর্থ পয়েণ্টে। নিশ্চুপে গিয়ে অপেক্ষমান গাড়িতে বসলাম। সেই তিনজন কালো মানুষও এলো। এলো ইভা। নির্বাক পুতুলের মতো কয়েকজনকে নিয়ে গাড়ি এগিয়ে চললো ভিক্টোরিয়ার দিকে। যাত্রা শেষে নামবার সময় ইভার দিকে তাকিয়ে মৃদুভাবে তার হাত ঝাঁকিয়ে বলে উঠলাম—অ-রিভোয়া !

—অ-রিভোয়া !

বলতে গিয়ে ওর গলার স্বর কেঁপে গেল! শোনালো যেন কান্নাভেজা গলা!

আর বলার কিছু নেই। দিন কয়েক দুধওয়ালা সাহেব ইতিহাস নিয়ে পড়েছিলেন। মাহেতে যে-সব রাজনৈতিক বন্দীদের এনে রাখা হয়েছিল, যেমন আফ্রিকার আশান্তি-সম্প্রদায়ের রাজা এডওয়ার্ড প্রেমপে, জাঞ্জিবারের সুলতানের সিংহাসন জোর করে দখল-করা জবরদস্ত ব্যক্তি সৈদ খালিদ বিন বার্গেশ, সাদ জগলুল পাশা প্রভৃতি। এদের সম্বন্ধে নোট্ নিতে নিতেই জাহাজের মেরামতির কাজ শেষ হলো, আমরা ভেসে পড়লাম জলে। জাহাজ দেশের মাটি ছুঁলো গিয়ে কোচিন হারবারে। এখানেই আমার যাত্রার ইতি। কোচিন ঘুরে দেখার অবকাশ পাইনি, ছুটে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয়েছিল বলা যায়। সেখান থেকে মাদ্রাজ। মাদ্রাজ থেকে ওয়ালটেয়ার ছুঁয়ে খড়গপুর। খড়গপুর থেকে ঘাটশিলা। ঘোষালের পাঠানো আমার চিঠিখানা যথাসময়ে শ্রীমতী পেয়েছিল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আর দেরি নয়, পরদিনই আবার খড়গপুর এসে মাদ্রাজ মেল ধরে ওয়ালটেয়ার তথা বিশাখাপত্তন। শ্রীমতীর অগাধ আস্থা আমার ওপরে। তাকে যা লিখেছিলাম আর যা বলেছিলাম, তা সে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করে নি। তার মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, এইবার বুঝতে পারছি, সে রাত্রে লঞ্চের ভিতরে কোথায় পেয়েছিলাম মনের সেই জোর! কবিগুরুর সেই গানের বাণী মনে পড়লো, 'কখনো বিপথে যদি/ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি/ অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা!'

বিশাখাপত্তনে এসে দেখলাম, নতুন কোনো জাহাজ ইতিমধ্যে আসে নি, আমার হিসেব ঠিকই ছিল। অর্থাৎ 'কাজ' নিয়ে কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু 'ছুটি'র থেকেও কয়েকটা দিন বেশি 'ছুটি' উপভোগ করায় নানান জল্পনা-কল্পনা চলছিল। রটে গিয়েছিল, আমি নাকি শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীকে রেখে বম্বে গিয়েছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে। এই ধরনের নানান কথা নিয়ে উড়ো চিঠি পড়েছিল আমাদের হেড-অফিসে, কলকাতায়। এইখান থেকে সন্দেহের শুরু, দ্বন্দ্বেরও শুরু। সেই দ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে ঝড়ের আকার নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। যার ফলে আমার সপরিবারে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। এবং তারপরেই অনিবার্য নিয়তির মতো 'কলকাতার কর্মচঞ্চল প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত অতিকায় অট্টালিকা'র মধ্যে অনুপ্রবেশ, যার মাথায় রয়েছে 'বিচার-ন্যায়-নীতি-শান্তি' প্রভৃতি গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি, আর পাদদেশে, পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'পশুক্লেশ-নিবারণী-সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ কোলস্ওয়ার্দি গ্র্যান্টের অবহেলিত, জীর্ণপ্রায়, ম্লান স্মারক-চিহ্ন। মনে পড়ছে এ-সব কথা?

হঠাৎ যেন লক্ষ লক্ষ সাগর পক্ষীর পক্ষ বিধুনন শুনতে পেলাম। তারা আকাশ-পথে রওনা হয়েছে। তারা থামবে না। তারা অবগাহন করতে চলেছে হিমালয়-শীর্ষ পেরিয়ে মানস সরোবরে। 'ওঠো—জাগো' বলে তারা যেন সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণীদের ডেকে বেড়াচ্ছে!

পূব থেকে আরক্তিম একটি আলোক-রেখা এসে আমার চোখে হানা দিলো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। কিন্তু কোথায় 'সে'? আমাকে ছেড়ে হঠাৎ চলে গেল নাকি? তাকিয়ে দেখি, ঘরের বাইরের দরজাটা বন্ধ, খিল-আঁটা। 'সে' চলে গেল কী ক'রে? এসেছিলই বা কীভাবে বন্ধ দরজা পেরিয়ে এমন করে আমার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দিতে?

নিজের অজান্তেই একটা অস্বাভাবিক চিৎকার করে উঠলাম। ঘরের লোক ছুটে এলো।

—কী হয়েছে!

—কেউ এসেছিল রাত্রে? এই ঘরে?

—কই, না!

তবু আমি জানি, কেউ একজন এসেছিল। নইলে এমন করে এতো কথা আমাকে শুনিয়ে গেল কে? কেমন করে?

তাকে কেউ চেনে না, আমি চিনি। আমার বুকের সোনার খাঁচায় তাকে বন্দী করে রেখেছি! খাঁচার দরজা কচিৎ-কখনো খোলা পেয়ে সে হঠাৎ বাইরে বার হয়ে পড়ে, আর তখনই ঘটে বিভ্রাট!

নইলে, তাকে নিয়ে আমার কোনো জ্বালা নেই!